শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের

কথা প্রসঙ্গ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রুতি লেখন
শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র

বঙ্গানুবাদ
শ্রী শ্রীবাস চন্দ্র দত্ত

প্রকাশক :
প্রেম প্রবাহ প্রকাশন
প্রেম মন্দির আশ্রম
রিষড়া, হুগলী - ৭১২ ২৪৮
দূরভাষ- (০৩৩) ২৬৭২ ২১২১

প্রথম সংস্করণ :
পৌষ শুক্লা চতুর্দ্দশী, ৮ই মাঘ ১৪২২

মুদ্রণ :
ক্রিয়েশন (ইন্ডিয়া)
২৬/এ, এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কোন্নগর, হুগলী

© গ্রন্থসত্ত্ব ঃ
প্রেম মন্দির আশ্রম

বিনিময় : ৭০ টাকা

দু-লার কথা

সাধক কবি তুলসীদাস বলেছেন — 'সৎসঙ্গ হরিকথা তুলসী দুর্লভ দোয়। দারা সুত লছমী পাপীকা ভি হোয়'।। অর্থাৎ হরিকথা ও সৎসঙ্গ খুব দুর্লভ, কিন্তু পত্নী, পুত্র এবং ধনসম্পদ পাপী ও দুষ্ট ব্যক্তির কাছেও থাকে। সৎসঙ্গের অর্থ হল, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ। যাঁকে আমরা ভালবাসি তাঁর কথা শুনতেও আমাদের ভাল লাগে। যাঁরা ভগবানকে ভালবাসে, ভগবানের পুঁজোপাঠ, ধ্যান-ধারণা করে, সাধন-ভজন করে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সৎসঙ্গ শুনতে ভালবাসে। শুধু তাই নয়, সাধন-ভজনের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধেও তাঁদের অনেক রকম প্রশ্নও থাকে। আর ঐসব প্রশ্নের সমাধান তিনিই করতে পারেন যিনি 'পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা' অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর-দ্রষ্টা পুরুষ এবং ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছেন জীবনে। শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ এমনই একজন ঈশ্বর দ্রষ্টা, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তাঁর পরিচিতি ছিল সচল বৈদ্যনাথরূপে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপদেশ হয় সহজ-সরল এবং শাস্ত্রসম্মত। তাঁর কাছে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রশ্ন নিয়ে যেমন তৎকালীন প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক ডঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আসতেন তেমনি আবার সাধারণ আর্ত বা জিজ্ঞাসু শিষ্য-ভক্তরাও আসতেন জীবনের অথবা অধ্যাত্ম বিষয়ের প্রশ্নের ডালি নিয়ে। তাই নানা বিষয়ের প্রশ্নের বা সমস্যার সহজ সরল উত্তরের মাধুর্যে ভরা এই 'কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানি।

কথা প্রসঙ্গের অনুবাদক প্রাক্তন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দত্ত হিন্দিভাষায় লিখিত গ্রন্থটিকে প্রাঞ্জল এবং যথাযথ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষাভাষী বহু ভক্তের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য। এই গ্রন্থটি 'কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড। পূর্বে প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। আনন্দের বিষয় 'কথা প্রসঙ্গ' গ্রন্থটির চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

প্রেম মন্দির আশ্রম
১৫ই পৌষ ১৪২২

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

অনুবাদকের নিবেদন

দেওঘরের সচল বৈদ্যনাথ মহর্ষি শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ তাঁর জীবন সায়াহ্নে অগণিত ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে অমৃতময় মধুর উপদেশাবলী নিরবচ্ছিন্নভাবে অকাতরে বিতরণ করে গেছেন। আর তাঁরই কৃপাধন্য মন্ত্রশিষ্যা অল্পশিক্ষিতা ভক্তিমতী শ্রীমতী সরলাবালা মিত্র সেই উপদেশগুলি হিন্দিভাষায় এবং বাংলা হরফে শ্রুতিলিখন করেন। পরবর্তীকালে উপদেশগুলি শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের 'কথাপ্রসঙ্গ' নামে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থখানি অমূল্য সম্পদ হলেও বাংলা ভাষাভাষিগণের কাছে অনেকাংশ অবোধ্যই থেকে যায়। একথা চিন্তা করে ইতিমধ্যে 'কথাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ দুটি অধ্যাত্মরসপিপাসু ভক্তজনের কাছে বিপুলভাবে সমাদর লাভ করায় উক্ত গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে প্রেরণা লাভ করি। আজ এই পুণ্যদিনে উল্লিখিত বঙ্গানুবাদ গ্রন্থখানির তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। গ্রন্থখানির প্রকাশনায় সর্বতোভাবে সক্রিয় সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন মদীয় জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা রিষড়াস্থিত প্রেমমন্দির আশ্রমের অধ্যক্ষ সর্বজনশ্রদ্ধেয় সর্বজনপ্রিয় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাঁকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কৃতজ্ঞতা জানাই আশ্রমের ছোট মহারাজ শ্রীমৎ ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীকে ও শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারীকে যাঁরা সব সময় আমাকে গ্রন্থখানির প্রকাশনায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা জুগিয়ে এসেছেন। গ্রন্থখানির প্রুফ দেখে সহায়তা করেছেন আশ্রমের সর্বক্ষণের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীঅমলেশ মালিক। তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও সাধুবাদ জানাই।

'শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কথাপ্রসঙ্গ' অনুবাদ গ্রন্থ রচনায় নিম্নলিখিত যে সব লেখকের রচিত গ্রন্থের সহায়তা লাভ করেছি তাঁদের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

১। শ্রীমদ্ বালানন্দ উপদেশামৃত - শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়,
২। শ্রীগুরু শ্রীমদ্ বালানন্দ সংবাদ - শ্রীগোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়,
৩। প্রশ্নোত্তরে শ্রীবালানন্দ - শ্রীগোরা মুখোপাধ্যায়
৪। শ্রীবালানন্দ গল্পমালিকা - শ্রীগোরা মুখোপাধ্যায়

সর্বশেষ নিবেদন এই যে অনুবাদ গ্রন্থখানির প্রকাশনায় যথাসম্ভব নির্ভুল করবার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি থেকে যায়, তার জন্য সহৃদয় ভক্ত পাঠক পাঠিকাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

জয়গুরু।

তারিখ ঃ ১০ই পৌষ ১৪২২ শ্রী শ্রীবাসচন্দ্র দত্ত

বিষয় বিন্যাস

• প্রথম পর্ব	ঃ ব্যবহার ও পরমার্থ এক সাথে কর, পরমাত্মাকে দেখতে না পাওয়ার কারণ, চিত্তশুদ্ধির সুগম উপায়, ঈশ্বরকে লাভ করার উপায়, ঈশ্বরের কাছে যাবার তিনটি পথ — জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম।	১
• দ্বিতীয় পর্ব	ঃ দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ, মন্ত্র নেওয়া কখন সার্থক ও কল্যাণময় হয়, আত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার গল্প।	২১
• তৃতীয় পর্ব	ঃ শোক, দুঃখ দূর করার উপায়, গুরুদত্ত উপদেশের বিভিন্ন কারণ, রোচক ও যথার্থ বাক্য, ঈশ্বর যোগ ও ক্ষেম বহন করেন। সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বর।	৩৫
• চতুর্থ পর্ব	ঃ সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি থাকে, চাষার দুঃখ নিবারণের গল্প, ভক্তিলাভের ক্রম ও নববিধা ভক্তি।	৬৪
• পঞ্চম পর্ব	ঃ সংসারে থেকেও ধর্মলাভ হয়, কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগীর কাছে পরাস্ত হয়, ঈশ্বরকে পাবার জন্য দরকার ব্যাকুলতা।	৭৫
• ষষ্ঠ পর্ব	ঃ সৃষ্টি পালন সংহারের রহস্য, জ্ঞানী ও ভক্তের ফারাক কিছু নাই, ধর্মের ভান বা নকলও ভাল, সাধু দর্শনের সুফল, ভগবান কী পক্ষপাত দোষে দোষী?	৯৮
• সপ্তম পর্ব	ঃ সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ, ম্যানেজার বন্ যাইয়ে, কৃপণ কে আর দাতাই বা কে?	১২০
• অষ্টম পর্ব	ঃ গুরু হওয়া সহজ, শিষ্য হওয়া কঠিন, সাধুর পক্ষে তীর্থাদি পরিব্রাজন শ্রেয়, মহারাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতা।	১২৯
• নবম পর্ব	ঃ পরোপকারের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়, ভগবান অন্তরযামী ও কর্মফল দাতা।	১৪৭
• দশম পর্ব	ঃ ভগবান ভক্তাধীন ও ভক্তির কাঙাল, কৃষ্ণ-সুদামার উপাখ্যান, ভক্তি দুরকমের - গলা ভক্তি ও প্রেমাভক্তি।	১৬২

প্রথম পর্ব

১৩৪১ বঙ্গাব্দ ঃ স্থান ঃ ধ্যানকুঠী, মাঘ মাস, সময় ঃ সকাল

শ্রী অমরেন্দ্র কুমার বসু (দাশুবাবু)

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[ব্যবহার ও পরমার্থ এক সাথে সম্পাদন কর ঃ একই সময়ে যুগপৎ জ্ঞান লাভ ও তার কয়েকটি উদাহরণ ঃ যুক্তিতে মুক্তি মেলে ঃ সিপাই-এর যুক্তির গল্প ঃ যুক্তিতে মুক্তি ও বৃদ্ধের তিন বরদানের গল্প ঃ পরমাত্মাকে দেখতে না পাওয়ার কারণ মায়া ঃ মায়ার স্বরূপ ও অবস্থান ঃ এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ঃ মায়া ও চৈতন্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ গল্প – সর্প ও গরুড় ঃ মায়া প্রপঞ্চ থেকে নিষ্কৃতির উপায় হল ঈশ্বরে শরণাগত হওয়া, তাঁর আশ্রিত হওয়া ও তাঁর দাসানুদাস হওয়া – এ সম্পর্কে গল্প ও তুলসী দাসের দোঁহা ঃ ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় ঃ চিত্তশুদ্ধির সুগম উপায় – এ সম্পর্কে মধুমক্ষিকার দৃষ্টান্ত ঃ চিত্তশুদ্ধির আর এক উপায় হল জপ ঃ ঈশ্বরের দরবারে পড়ে থাক, তাহলে দুঃখ কষ্ট তোমাকে অভিভূত করতে পারবে না ঃ রোগ শোক দুঃখ কষ্ট সরিয়ে দেবার উপায় হল বিচার, বিচারই সার, এ সম্পর্কে গল্প ঃ প্রারব্ধ ও পুরুষাকার, প্রারব্ধকে খণ্ডানো যায় না– এ সম্পর্কে অষ্টাবক্র ঋষির ব্রহ্মলাভের গল্প ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব দু'ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এক – বিধিভাবে, দুই – নিষেধভাবে ঃ শুভকর্মেই যখন শুভফল মেলে, তখন ভগবানকে ডাকবার দরকার কী ? ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় – তাঁর কাছে খাঁটি থাকা, দুনিয়ার সব লোকের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখা আর ঈশ্বরের আরাধনা করে যাওয়া ঃ ঈশ্বরের কাছে যাবার তিনটি পথ – জ্ঞান, ভক্তি আর কর্ম ঃ উপসংহার]

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, একই সময়ের মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে কি যাওয়া যায়? অর্থাৎ আপনি যে উপদেশ দেন, ব্যবহার ও পরমার্থ এক সাথে কর। তা কেমন করে সম্ভবপর হবে, কেননা ব্যবহার হল প্রবৃত্তি মার্গের কথা আর পরমার্থ হল নিবৃত্তি মার্গের কথা। আমার মনে হয়, যেমন আলো অন্ধকার একই সময়ে দেখা অসম্ভব, কেননা আলো এলেই অন্ধকারকে চলে যেতে হবে। অন্ধকারকে রাখতে হলে আলোকে সরিয়ে দিতে হবে। তাই একই সময়ের মধ্যে যেমন আলো অন্ধকার দেখা সম্ভব হয় না, একই সময়ের মধ্যে যেরূপ পূর্ব পশ্চিমে যাওয়া যায় না, তেমনি এক সময়ের মধ্যে ব্যবহার ও পরমার্থ এই উভয় কার্য সাধন করা যায় না।

মহারাজ, আগে আমি বহুক্ষণ ধরে আসনে বসে জপ করতাম, কিন্তু এখন আমি একেবারে ব্যবহার কার্যে ডুবে আছি। এ জন্যে আমার মনে বড় ক্ষোভ হয়। মনে

মনে বিচার করে এই ক্ষোভকে সারিয়ে দেবার চেষ্টা করি এই ভেবে যে দয়াময় গুরুদেব বলেছেন, ব্যবহার ও পরমার্থ একই। আমি এ বিষয় নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছি কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারিনি। তাই আজ আপনার চরণে প্রশ্ন রাখছি যে, কি উপায়ে ব্যবহার ও পরমার্থ এক সঙ্গে করা যাবে। এর যুক্তি কি তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর যুক্তি তো ভাই খুব ভালই আছে। যিনি পুরোপুরি সাধক হবেন, তিনিই এই সব যুক্তিকে গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন।

যুগপৎ জ্ঞানম্

যুগপৎ জ্ঞানম্ অর্থাৎ একই সময়ের মধ্যে বহু জ্ঞান হয়ে যায়। কেমন করে? যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলাল চক্র। আলাল চক্র কী? একটি কাঠির মুখে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। তারপর ওই জ্বলন্ত কাঠিটা বেগে ঘোরানো হল। তখন মনে হবে যেন এক গোলাকৃতি আগুনের চক্র ঘুরছে, কিন্তু ও তো প্রকৃত চক্র নয়। জোরে ঘোরার জন্য চক্র বলে মনে হচ্ছে। জ্বলন্ত কাঠিটি প্রবল বেগে ঘূর্ণনের দরুণ ওই কাঠির মুখ ক্ষণিকের মধ্যে পূর্ব পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারদিক ঘুরছে, কোন বিলম্ব হচ্ছে না বা সময় নিচ্ছে না। যিনি পুরোপুরি সাধক হবেন তিনি ঠিক এই আলালচক্রের মতোই হয়ে যাবেন। ওই সাধকের ব্যবহার ও পরমার্থ এক সময়ের মধ্যে হয়ে যায়। তারজন্য সময়ের অপেক্ষা করতে হবে না।

এ সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। একটি বাচ্চা ছেলে লাট্টু ঘোরাচ্ছে। যখন লাট্টুটি বেগে ঘুরছে তখন ওই লাট্টুটি ক্ষণিকের মধ্যে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রদক্ষিণ করছে। অথচ বেগে ঘোরার দরুণ মনে হচ্ছে লাট্টুটি যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই যুগপৎ জ্ঞান সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। একটি লোক মিছরির একটি টুকরো মুখে রেখে দিল এবং গৃহের কাজ করতে লাগল। ওই ব্যক্তির একই সময়ের মধ্যে দুটি জ্ঞান হল – মিছরির স্বাদ নিল আর সেই সঙ্গে গৃহকর্মের কাজও শেষ করল।

এ ব্যাপারে আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে। যেমন একজন বাজিকর দু'দিকে বাঁশের সঙ্গে বাঁধা দড়ির উপর খেলা দেখাচ্ছে। ওই বাজিকর একই সময়ের মধ্যে কতরকম কাজে মনকে নিযুক্ত করে রেখেছে। মাথায় তার জলের কলসী, হাতে লাঠি, পায়ে তার ঘুঙুর, মাদলের তালে তালে দড়ির উপর নাচতে নাচতে দড়ির উপর দিয়ে ব্যালেন্স করে এগিয়ে চলেছে। তাহলে দেখ, এই বাজিকরের মনটা কোথায় রয়েছে?

যুগপৎ সব কাজে মনের গতিকে সে ভাগ করে দিয়েছে। যদি কোন দিকে মন-সংযম কম হয়ে যায়, তাহলে সে পড়ে যাবে। দেখো ভাই, যিনি পুরো সাধক হবেন তাঁর কাছে ব্যবহার কার্য ও পরমার্থ কার্য এক সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

শতপত্র ভেদন

একশো পাতা একসঙ্গে করে তার উপর দিয়ে সূচ ঢুকিয়ে দিলে একবারে একশো পাতা ছিদ্র হয়ে যাবে, কিন্তু একটা একটা করে ওই একশো পাতা সূচ দিয়ে বিদ্ধ করলে প্রচুর সময় লেগে যাবে। কিন্তু তুমি যদি একবার সূচ ঢুকিয়ে পাতাগুলি ছিদ্র বা ভেদন কর তাহলে ক্ষণিকের মধ্যেই বহু কাজ সাধিত হয়ে গেল। দেখো ভাই, সাধারণ মানুষ তো এর ভাব গ্রহণ করতে সমর্থ হবে না। যিনি পুরো সাধক হবেন তাঁর পক্ষেই যুগপৎ জ্ঞান সহজসাধ্য হয়। দেখো ভাই, যুক্তিতে মুক্তি মেলে। যুক্তি করা চাই, তবেই মুক্তি মিলবে।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, যুক্তি কী করব আমাকে বুঝিয়ে দিন। আমার প্রথমেই প্রশ্ন ছিল যে একই সময়ের মধ্যে ব্যবহার এবং পরমার্থ সম্পাদন করা সম্ভব, না সম্ভব নয়। যুগপৎ জ্ঞান সম্পর্কে আপনি যে দৃষ্টান্তগুলি দিলেন, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত হল যে মনকে দুভাগে ভাগ করে দিলে একই সময়ে দুকাজ সাধিত হয়। মনকে দশ ভাগে ভাগ করে দিলে একই সময়ে দশটি কাজ সম্পাদন হয়ে যাবে। তবে এ সম্পর্কে একটা কথা আছে, তা হল – অভ্যাসী সাধক হওয়া চাই। এখন যুক্তিতে কীভাবে মুক্তি মিলবে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু – দেখো ভাই, তোমাকে যুক্তির একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্প শোনাচ্ছি, তুমি এর ভাবটি গ্রহণ কর।

সেপাই-এর যুক্তির গল্প ঃ

এক সেপাই মাত্র দশ টাকা মাইনে পেত। তার এক বন্ধু একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, তুমি তো মাত্র দশ টাকা মাইনে পাও। এখানে তোমার খাওয়া-পরার খরচ আছে, দেশে তোমার ছেলে-পুলে পরিবার-পরিজন রয়েছে, তাদের জন্যও মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়, এই কটা টাকায় তোমার চলে কী করে?' সেপাই বলল, 'আমি খুব হিসেব করে চলি, তাই এতেই আমার কুলিয়ে যায়।' বন্ধু বলল, 'ভাই, তুমি কীভাবে হিসেব করে খরচ কর, তা আমায় শোনাও।' সেপাই বলল, 'ভাই, আমি এক পয়সার কাঠে বারো বছর ধরে রান্না করছি।' বন্ধু অবাক হয়ে

বলল, 'ভাই, তোমার একথা আমার কাছে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।' সেপাই বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে শোনো। বুঝে শুনে চলতে পারলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আমি প্রতিদিন এক পয়সার কাঠ কিনে তাই দিয়ে রান্না করি। রান্না শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আগুন নিবিয়ে দিই। ওই পোড়া কাঠ থেকে যে কাঠকয়লা পাই তা স্যাকরার দোকানে বিক্রি করি। স্যাকরা এক পয়সা দিয়ে তা কিনে নেন। পুনরায় ওই এক পয়সার কাঠ কিনে রান্না করি, আবার কাঠকয়লা বিক্রি করে স্যাকরার কাছ থেকে এক পয়সা পাই। এইভাবে বারো বছর ধরে রান্না করছি, এখনও কাঠ কিনবার জন্য আমার কাছে এক পয়সা মজুত রয়েছে।' সেপাই-এর যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধি দেখে তার বন্ধু অবাক হয়ে গেল।

দেখো ভাই দাশু, মুক্তি কি তা জান? পরমাত্মা প্রাপ্তিই হল মুক্তি। পরমাত্মা তো আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে যান না। পরমাত্মা সমস্ত বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যুক্তিপূর্বক তাঁকে তোমায় বের করতে হবে, উপরের উদাহরণ অনুযায়ী সেপাই যেমন কাঠের আগুন নিবিয়ে দিয়ে তা থেকে কাঠকয়লা বের করে আনল, যেমন সে আগুন নিবিয়ে দিল, তা না হলে সব কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তুমিও তোমার ইন্দ্রিয়সমূহকে শরীর ধারণ অনুসারে কাজে লাগাও, তারপর তাদের বিশ্রাম দাও। ইন্দ্রিয়ের আগুন যদি না নিবিয়ে দাও, তাহলে ওই আগুনে তোমার যত সদ্‌বৃত্তি আছে তা সব ভস্ম হয়ে যাবে। পরমাত্মা প্রাপ্তি আর হবে না। এই কারণে আমার উপদেশ হল – মুক্তির জন্য যুক্তি করতে হবে। যুক্তিতেই মুক্তি মিলবে। যুক্তিপূর্বক কাজ করলে অসম্ভব কাজও সম্ভব হবে। যুক্তির আর এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প মনে পড়েছে, গল্পটি তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

এক ব্যক্তির তিনটি দোষ ছিল। প্রথমতঃ সে ছিল অন্ধ, দ্বিতীয়তঃ সে অল্পায়ু তৃতীয়তঃ সে ছিল অত্যন্ত গরীব। এই তিন দোষ কাটিয়ে উঠবার জন্য সে ভগবানের একনিষ্ঠ উপাসনায় নিজেকে সঁপে দিল। তার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান একদিন তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি একটি বর দিচ্ছি, সেই বরে তোমার যা ইচ্ছে আমার কাছ থেকে চেয়ে নাও।' বৃদ্ধ লোকটি মহা মুশকিলে পড়ে গেল। ভগবান মাত্র একটি বরদান করতে চান, কিন্তু তার যে তিনটি দোষ – দারিদ্র্য, অন্ধত্ব আর অল্পায়ু। এই তিনটি দোষের কোন্‌টি কাটাবার জন্য ভগবানের কাছে সে বর চাইবে? লোকটি ছিল খুব চালাক। অনেক যুক্তিপূর্বক ভেবে নিয়ে সে ভগবানকে বলল, 'হে ভগবান, আপনি আমাকে এই বর দান করুন যেন আমি দেখতে পাই যে, আমার

নাতি সোনার থালায় ভাত খাচ্ছে।' ভগবান বললেন, 'তথাস্তু।' এইভাবে একটি মাত্র বরে লোকটি ভগবানের কাছ থেকে একসঙ্গে তিনটি বর পেয়ে গেল। দীর্ঘায়ু না হলে নাতিকে দেখা সম্ভব নয়, দারিদ্র্য না ঘুচলে সোনার থালা জুটবে না আর অন্ধত্ব না কাটলে নাতি যে ভাত খাচ্ছে তা দেখা যাবে না। এক বরদানেই তিন দোষ কেটে গেল যুক্তিপূর্ণ বুদ্ধির দৌলতে।

দেখো ভাই দাশু, যে কাজ হবার নয়, যুক্তি করলে ওই কাজও সম্পন্ন হয়ে যায়। মুক্তি লাভ খুবই অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যুক্তি করলে মুক্তি অবশ্যই লাভ করা যায়।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, আপনার দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে বুঝলাম যে যুক্তিপূর্বক কাজ করলে বহু ফল মিলে যায়। কিন্তু মুক্তির জন্য কী যুক্তি করতে হবে তা তো বুঝতে পারছি না। পরমাত্মা প্রাপ্তি হলে তবেই জীব মুক্ত হবে। পরমাত্মা সব বস্তুতে পূর্ণ হয়ে আছেন, আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

মহারাজ, গীতাতে শ্রীভগবান বলেছেন –

যোগমায়া অন্তরালে, আমি সদা করি বাস।

(নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ – গী ৭/২৫ শ্লোক)

এই যে যোগমায়া একে কোন্ যুক্তি দিয়ে সরিয়ে দেবো। একে সরিয়ে দিতে পারলেই পরমাত্মার দর্শন পাবো।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ যদি বলপূর্বক মায়াকে হটাতে যাও তবে তা পারবে না। মায়াকে দূর করতে বা সরাতে গেলে শাস্ত্রকার অনেক উপায় বলে দিয়েছেন। সাধক তার সুবিধা মতো পথ অবলম্বন করে মায়াকে দূর করতে অগ্রসর হবেন। জীব থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত মায়ার অধীন,

মায়া উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য জীব।

মায়ার মধ্যে ঈশ্বর নেই, ঈশ্বরেই মায়া অবস্থান করে। কীভাবে অবস্থান করে? যেমন কোন সর্বাঙ্গসুন্দর লোকের দেহে কোন খুঁত নেই, শুধু এক জায়গায় একটা কালো তিল রয়েছে। তিল থাকার দরুণ তার কোনো বাধা জন্মাচ্ছে না। কোন কষ্ট হচ্ছে না, তেমনি ব্রহ্মে বা ঈশ্বরের মধ্যে মায়ার অবস্থানের জন্য কোন কষ্ট নেই। তাই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, একাংশেন স্থিত জগৎ

ব্রহ্মের এক অংশে জগৎ অবস্থিত আছে। ব্রহ্মকে ছেড়ে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। মায়ার দুটি শক্তি – বিদ্যা শক্তি ও অবিদ্যা শক্তি। বিদ্যাশক্তি শুদ্ধ, সত্ত্ব ও স্বচ্ছ। অবিদ্যাশক্তি মলিন রজোস্তমো যুক্ত। বিদ্যাশক্তি সগুণ ব্রহ্মে অবস্থিত; অবিদ্যাশক্তি

জীবে অবস্থিত। এর একটা দৃষ্টান্ত আছে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো কাঁচের ঘরে কেউ যদি আবদ্ধ থাকে তাহলে ভিতরের ও বাইরের সব কিছু সে দেখতে পায়। তেমনি মলিন কঠিন ইঁটের পাঁচিল দেওয়া ঘরে কেউ বাস করলে সে বাইরের কিছুই দেখতে পারে না। মায়ার অধীন সগুণ ব্রহ্ম যেন এমনি কাঁচের ঘরের ভিতর রয়েছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুই দেখছেন, কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। আর জীব বসে আছে ইঁটের প্রাচীর ঘেরা ঘরে। জীব কেমন? জীব যেন কুয়োর, কুয়োর বাইরে কী আছে কিছুই জানে না। রয়েছে সে জলের মধ্যেই, কিন্তু সমুদ্র কেমন সে খবর রাখে না। যেমন সোনার আর লোহার শৃঙ্খল। কারুর গলায় যদি লোহার শৃঙ্খল থাকে তাহলে বোঝা যায় যে সে একজন কয়েদী, আর কেউ যদি গলায় সোনার শৃঙ্খল পরে, তাহলে তাকে কয়েদী বলা হবে না, বুঝতে হবে সে গলায় সোনার অলংকার পরেছে। এই রকমভাবে মায়ার বিদ্যাশক্তি হল সগুণ ব্রহ্মের কণ্ঠভূষণ, এতে ঈশ্বরের শোভাবর্ধন হয়, অথচ তার দ্বারা তাঁকে কোন কষ্ট ভোগ করতে হয় না। কিন্তু মায়ার অবিদ্যাশক্তি লোহার শৃঙ্খলে আবদ্ধ কয়েদীর মতো জীবকে অশেষ দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকে। এক নির্গুণ ব্রহ্ম মায়ার অধীন নয়। তিনি মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর।

'এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি'

এক ব্রহ্মতেই সব কিছু অবস্থিত। মায়া কোথায় অবস্থান করে? মায়ার আধার ব্রহ্মেই, নতুবা মায়া আসে কোথা থেকে। এই মায়াকে অতিক্রম করা বড়ো কঠিন।

মায়া চৈতন্যের আশ্রিত। এই কারণে মায়ার এত প্রতাপ। যে সাধক একান্তভাবে চৈতন্যের আশ্রয় নেয়, তার কাছে মায়া কোন দৌরাত্ম্য করতে পারে না। মায়া আর চৈতন্যের দৃষ্টান্তযুক্ত একটি গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

সর্প ও গরুড়ের গল্প ঃ

ভগবান বিষ্ণু একদিন গরুড়ের পিঠে চড়ে মহাদেবকে দর্শন করতে কৈলাস পর্বতে এসেছেন। মহাদেবের অঙ্গ ঘিরে যে সব সাপ ছিল তারা গরুড়কে দেখে রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তাদের স্পর্ধা দেখে গরুড় হেসে বলল,

'স্থানং প্রধানং, ন চ বলং প্রধানম্'

অর্থাৎ, হে সর্পগণ, তোমাদের ক্ষমতা কত দূর তা আমার জানা আছে। এখন তোমরা মহাদেবের আশ্রয়ে রয়েছ, স্থান মাহাত্ম্যের জন্য আমি এখন তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারব না। কিন্তু একবার ঐ আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসো দেখি, আমার ক্ষমতা যে কতখানি তা তখন বুঝিয়ে দেব।

এই দৃষ্টান্ত থেকে সিদ্ধান্ত হল – কোন দুর্বল লোক যখন কোন প্রবল লোকের আশ্রয় নেয়, তখন স্থান মাহাত্ম্যে তার শক্তি প্রবল হয়ে যায়। তখন সে কাউকে ভয় পায় না। তেমনি দুর্বল মানুষ যদি পরমেশ্বরের আশ্রয় নেয়, তাহলে তার কোন আতঙ্ক থাকে না, মায়া তার উপর কোন দৌরাত্ম্য করতে পারে না। এই জন্য পরমাত্মার আশ্রয় নাও, তাহলে নিরাতঙ্ক থাকবে। মায়া তোমার কিছু করতে পারবে না। এর নাম শরণাগতি। মায়াকে জোর করে কিছু করা যাবে না। মায়া যাঁর আশ্রয়ে আছে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে যাও। এই দৃষ্টান্ত সম্পর্কে তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে –

'যো যাকে শরণ লিয়ে
সে রাখে তাকো লাজ
উলট্ জলে মছ্লি চলে
বহো যায় গজরাজ।'

এই দোঁহাটিতে গূঢ় উপদেশ নিহিত আছে। দেখো, যে যার শরণাপন্ন হয়েছে, সে তার উপর সব কিছু সমর্পণ করে থাকে। কেমন করে? যেমন জল আর মাছ – মাছ জলের শরণাগত, জলের আশ্রিত, এই কারণে খরস্রোতা জলেও মাছ উল্টো দিকে অর্থাৎ স্রোতের বিপরীতে অনায়াসে যেতে সমর্থ। কিন্তু ওই স্রোতে হাতি যখন নামে তখন এত বলবান হাতিও জলের স্রোতে দাঁড়াতে পারে না, স্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু ক্ষীণবল মাছ স্রোতে ভেসে যায় না, মাছ স্রোতের বিপরীত দিকেও যেতে পারে। এর কারণ কী? কারণ হল মাছ জলের আশ্রিত, শরণাগত। তাই জল তার শরণাগত মাছকে তার সমুদয় অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এমনিভাবে দুর্বল মানুষ যদি পরমাত্মার শরণাগত হয়ে যায়, তাহলে পরমাত্মা নিজের সব কিছু অধিকার শরণাগতকে দিয়ে দেন। তাৎপর্য হল – যে সাধক একমাত্র ঈশ্বর আশ্রিত হয়ে যায়, ওই সাধকের উপর মায়া জাল বিস্তার করতে পারে না। বলপূর্বক মায়াকে হটানো যায় না। তাই ঈশ্বর আশ্রিত হয়ে যাও, মায়া তখন আপনা থেকেই হটে যাবে।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, এখন আমি বুঝতে পারলাম, যে সাধক পরমাত্মার শরণাগত হয়ে যায়, মায়া তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমরা পরমাত্মাকে কী করে পাব? পরমাত্মাকে পাওয়া না গেলে কী করে শরণাগত হওয়া যাবে, আকাশে কীভাবে শরণাগতি আসবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই দাশু, আমি তো আগেই বলে দিয়েছি যে পরমাত্মা দূরে

কোথাও চলে যায়নি, সব বস্তুতেই পরমাত্মা পূর্ণ হয়ে আছেন, তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না। তাঁর বিভূতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছো। দেখো, এর একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি –

রাজাকে স্পর্শ করার গল্প ঃ

এক ছিল রাজা। তিনি তাঁর রাজধানীতে একটা প্রকাণ্ড বড় বাজার বসিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, যার যে জিনিস পছন্দ, সে যেন হাত দিয়ে সেই জিনিসটাকে শুধু স্পর্শ করে, তাহলেই সে সেই জিনিসটা নিয়ে যেতে পারবে, তার জন্য তাকে কোন দাম দিতে হবে না। রাজার ঘোষণা শুনে দলে দলে লোক এসে তাদের পছন্দমতো এক একটি জিনিস বিনামূল্যে নিয়ে যেতে লাগল। একটি লোক ছিল বড়ই চতুর। সে ভাবল, একটি জিনিস স্পর্শ করলে ওই একটি জিনিস নিয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি কোন জিনিস স্পর্শ না করে যদি শুধু রাজাকেই স্পর্শ করি তাহলে তো তাঁকে আমি পেয়ে যাব। লোকটি তখন সারা বাজার ঘুরল, কিন্তু একটা জিনিসও সে স্পর্শ করল না। রাজা বসে ছিলেন বাজার থেকে অনেকটা দূরে। ঘুরতে ঘুরতে লোকটি রাজার কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বলল, 'রাজামশাই আপনার বাজারের কোনো জিনিস আমার পছন্দ হল না, তাই আমি আপনাকেই চাই। আপনাকে আমি স্পর্শ করেছি। এখন আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। আপনি আমার হয়ে যান।' রাজা তখন কী করেন। তিনি তারই হয়ে গেলেন।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মারূপী রাজা, সংসাররূপী বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। অর্থ, বিত্ত, পুত্র, কলত্র ইত্যাদি সব কিছু এই বাজারে সাজিয়ে রেখেছেন। যার যা বাসনা তাদের জন্য পরমাত্মারূপী রাজা ওই সব জিনিস দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু যে চতুর ব্যক্তি হবে, সে বাজারের কোন জিনিসই স্পর্শ করবে না, সে রাজাকে স্পর্শ করে তাঁকে আপন করে নেয়। যে ব্যক্তি রাজাকে আপন করে নেয়, সে রাজাকে পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাজারের সব কিছু জিনিসই আপনা থেকে পেয়ে যায়।

অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে যখন তুমি মিলে যেতে পারবে মায়া আর তোমার কিছু করতে পারবে না। এখন প্রশ্ন হল, পরমাত্মাকে কীভাবে পাবে। এর উত্তর হল –পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য কোথাও খুঁজতে হবে না, তুমি পরমাত্মার বিভূতি নিও না, ছুঁয়ো না, তোমার যা বাসনা কামনা তা সব পরমাত্মার জন্য নিয়োগ কর, তবেই তাঁকে পেয়ে যাবে।

অধিকাংশ মানুষ পরমাত্মার বিভূতিতেই বাসনা কামনা করে থাকে এবং ওই সব

জিনিস পেয়ে যায়। এই সব জিনিস পেয়ে তারা মুগ্ধ হয়ে যায়, পরমাত্মার সাথে মিলবার বাসনা কামনা তাদের মনে জাগ্রত হয় না। পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য ঋষিরা অনেক অনেক পন্থা শাস্ত্রে লিখে রেখে গেছেন, কোন পথ সুগম আবার কোন পথ দুর্গম। পরমাত্মার শরণাগত হয়ে যাওয়া সবচেয়ে সুগম পথ। এই রাস্তা দিয়ে চলার অধিকার স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি সব মানুষেরই আছে এবং ঐ পথ সকলের পক্ষেই প্রশস্ত হয়ে যায়। এরকম ভাবনার একটি দোঁহা তুলসীদাসের আছে –

'তুলসী, বেরোয়া বাগমে সিচ্‌তেহি কোমলায়।
রাম ভরষে যো রহে পর্বতমে আরিয়ায়।।'

অর্থ ঃ তুলসী, বাগানে তুমি যতই জলসিঞ্চন কর তোমার গাছ শুকিয়ে যায়, কিন্তু পর্বতের উপর যে সব গাছ আছে তাতে কেউই জলসিঞ্চন করে না, তারা একেবারে ঈশ্বর আশ্রিত হয়ে পড়ে আছে, দেখো সেই পর্বতের উপর গাছগুলি ফুলে ফলে শোভা পেয়ে অতি অপূর্ব ভাব ধারণ করে রয়েছে।

দেখো ভাই দাশু, এ ব্যাপারে আমার উপদেশ এই যে, তুমি একেবারে ঈশ্বর আশ্রিত হয়ে যাও, তাঁর শরণাপন্ন হয়ে যাও, তাঁর দাসানুদাস হয়ে যাও।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, আমি তো ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে গেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না ভাই, তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে যাও নি। ইন্দ্রিয় হল তোমার দাস।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, আমার স্বভাব এমন হয়ে গিয়েছে যে, আমি জেনে গেছি, আমি ইন্দ্রিয়েরই দাস।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ স্বভাব হয় নি, তোমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে –

যাকে পড়ে স্বভাব যায়েঙ্গে ঘিসে।
নিম্‌না মিঠা হোয় সিচো গুড়র ঘিসে।।

অর্থ ঃ যার যে স্বভাব তার আর পরিবর্ত্তন হয় না, যেমন নিমের তিক্ততা, গুড় অথবা ঘি দিয়ে ফুটালেও তার তিক্ত স্বভাব যায় না।

দেখো ভাই দাশু, স্বভাবের তো পরিবর্তন হয়না, জলের স্বভাব শীতলতা, জলকে তুমি যতই গরম করো, কিছুক্ষণ পরে তা ঠান্ডা হয়ে যাবে। আগুনের যে উষ্ণতা তা সে কখনো ছাড়ে না। কয়লাকে যত জলেই ধুয়ে ফেল না কেন তার কালো রং ঘুচবে না। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে করতে তোমার ধারণা জন্মে গিয়েছে যে তোমার স্বভাবই হল ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করা। স্বভাব নয় ভাই, ওটা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে,

স্বভাবের তো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন হয় অভ্যাসের। অভ্যাসের যদি পরিবর্তন না-ই হোত, তাহলে এত সাধন ভজন, এত শাস্ত্র আলোচনা, এত জ্ঞান-বিচার, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই বলছি ইন্দ্রিয়-দাসত্বটা তোমার স্বভাব নয়, ওটা তোমার অভ্যাস। সাধন করো, ভজন করো, তাহলে এই অভ্যাস চলে যাবে, ছুটে যাবে। তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস নও, ইন্দ্রিয় তোমার দাস, তুমি ঈশ্বরের দাসানুদাস। ইন্দ্রিয়দের তুমি ঈশ্বরের আরাধনায় সেবকের মতো নিযুক্ত করে দাও। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন – এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে তুমি ইষ্টসেবায় লাগিয়ে দাও। তাতেই তুমি শান্ত, শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাতেই তোমার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে যাবে। শান্ত ব্যক্তি কী প্রকারের হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে একটি দোঁহা আছে –

'সন্ত ওহি জানিয়ে দুঃখে দুঃখা ওয়ে নায়।
পান ফুল ছেড়ে নেহি রহে বাগিচে ময়।।'

অর্থ ঃ শান্ত ব্যক্তি কী করে জানা যায়, যিনি নিজে কাকেও দুঃখ দেন না, নিজেও কারোর কাছ থেকে দুঃখ নেন না, এই সংসাররূপী বাগানে সর্বত্র তিনি বিচরণ করে থাকেন, কিন্তু একটি পাতা ফুলও ছেঁড়েন না।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, শান্ত শুদ্ধ হবার উপদেশ পেয়ে গেছি। কিন্তু শান্ত শুদ্ধ হবার সহজ পথ আমি জানি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ চিত্তশুদ্ধ হওয়ার এক সহজ উপায় তোমায় বলছি – তুমি মধু মক্ষিকা হয়ে যাও।

মধু মক্ষিকার দৃষ্টান্ত ঃ

আমি যখন হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলাম, তখন একদিন এক আশ্চর্য ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। আমার শিষ্য পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তখন আমার সঙ্গে ছিল আর ছিল দুজন মুটে, তারা আমাদের মালপত্র বহন করে আমাদের সঙ্গে চলছিল। আমরা ধীরে ধীরে চড়াই-এর উপর উঠছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম পূর্ণানন্দ আমাদের সঙ্গে নেই। আমি তখন সেখানে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে পূর্ণানন্দ এসে পৌঁছল, দেখি তার চোখ দুটো নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো লাল আর সে যেন স্থির ভাবে মাটিতে পা রাখতে পারছে না, কেবলই টলে টলে পড়ে যাচ্ছে। আমি তাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে মুটেদের জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁরে, এর এরকম অবস্থা হল কেন বলতে পারিস?" মুটেরা পাহাড়ী লোক, পাহাড়ের সব খবর রাখে তারা। তারা বলল, "মহারাজ, এই সাধুজীর গায়ে পাহাড়ের বিষ

লেগেছে। ওই যে ঘুরে লাল লাল ফুল দেখছেন, ঐগুলি হল কালকূটের ফুল, ওই ফুলের গন্ধ শুঁকলেই মানুষ মারা যায়। এই ব্রহ্মচারীকে তাড়াতাড়ি কিছু টক খাওয়ানো দরকার।" আমার ঝোলাতে তেঁতুল ছিল, জলে গুলে তা খাইয়ে দিতেই পূর্ণানন্দ সুস্থ হল।

এবার সেই কালকূটের ফুলের দিকে আমি চেয়ে দেখলাম। দেখি, ওই বিষের যে ফুল তার উপর মৌমাছিরা গুনগুন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে আমি তো অবাক। আমি ভাবতে লাগলাম ভগবানের এ কী বিচিত্র লীলা! এই ক্ষুদ্র মৌমাছির দল বিষ থেকেও অমৃত আহরণ করছে! দোষ ত্যাগ করে গুণটুকুই কেবল গ্রহণ করছে। তখন আমার মনে হতে লাগল সামান্য এই মৌমাছি, এদের কত গুণ। প্রথমত সব কিছু থেকে বেছে বেছে তারা শুধু মধুই সংগ্রহ করে। নিমের মতো তেতো ফুলই বলো, আর এই কালকূট বিষের ফুলই বলো, তা থেকেও তারা কেবল মধুটুকুই টেনে নেয়। দ্বিতীয়ত দেখো তাদের অধ্যাবসায়। তিল তিল করে মৌচাকের মধ্যে তারা মধু সংগ্রহ করে রাখছে। সারা পৃথিবীতে যত মধু খরচ হয় সবই এই ক্ষুদ্র কীটগুলি যোগান দিয়ে থাকে। আর এরা কত নিঃস্বার্থ। কত দিন ধরে, কত পরিশ্রম করে এরা মধু জমায়, নিজেরা খাবে বলে নয়, আপন ভোগের জন্য নয়। পরের জন্য নিঃশেষে তা উজাড় করে দেয়। তাদের নিজেদের মধ্যে কোন হিংসা, দ্বেষ নেই। একবার মৌচাকের দিকে তাকিয়ে দেখো, লক্ষ লক্ষ মৌমাছি চাকের মধ্যে কেমন মিলেমিশে রয়েছে, কারুর সঙ্গে কারুর বিবাদ নেই, একমনে যে যার কাজ করে চলেছে।

দেখো ভাই দাশু, আমার আদেশ হল, তোমরা মধুকর হয়ে যাও। মৌমাছির মতো সব কিছু থেকে দোষের অংশ ত্যাগ করে তোমরা যখন শুধু গুণটুকু গ্রহণ করতে শিখবে তখন তোমাদের চিত্ত মধুচক্রে পরিণত হবে, তাতে তোমাদের পরম কল্যাণ হবে। তাই চিত্তশুদ্ধির সুগম পথ হল পরের দোষ অনুসন্ধান না করা, শুধু পরের গুণগুলি গ্রহণ করা। ভালো আর মন্দতে মেশানো এই সংসার। এমন কোন বস্তুই সংসারে নেই যার সবটা দোষে ভরা অথবা আগাগোড়া গুণে গড়া। দোষগুণ সবেতেই আছে। এখন এই মধুকরের দৃষ্টান্ত দেখো। এই ক্ষুদ্র কীট বিষ থেকেও কেমন অমৃত গ্রহণ করছে, কারণ এটাই তার স্বভাব। আবার বিষাক্ত মক্ষিকার স্বভাব ঠিক উল্টো। নোংরা ঘা, বিষাক্ত জায়গা সে পছন্দ করে, আর তার খোঁজেই সে ঘুরে বেড়ায়। অমৃত ত্যাগ করে সে কেবল বিষই গ্রহণ করে। দেখো ভাই দাশু, চিত্তশুদ্ধির

সুগম পথ আমি তোমাকে বলে দিয়েছি — তুমি মধুমক্ষিকা হয়ে নাও। তাহলে তোমার চিত্তশুদ্ধি আপনা থেকেই হয়ে যাবে, অন্য কোন কিছু করতে হবে না।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, আমাদের এমনই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে, প্রথমেই পরের দোষ অনুসন্ধান করে থাকি। এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা, ওই অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। দেখো, তোমাদের পুরাণের থেকেই আমি বলে দিচ্ছি — বশিষ্ঠের ক্ষমাগুণ তুমি নাও, দধীচির কাছে নাও আত্মত্যাগ, ভীষ্মের কাছে গ্রহণ করো প্রতিজ্ঞা-পালন, ভরত রাজার কাছ থেকে নাও দয়াগুণ, কর্ণের কাছ থেকে নাও তার দানগুণ, শুকদেবের কাছ থেকে জ্ঞানগুণ আর নারদ ঋষির কাছ থেকে গ্রহণ কর ঈশ্বরপ্রেমরূপ গুণ। দেখো ভাই দাশু, এই ভাবে মধুকরের মতো যেখানে যেখানে যা যা গুণ দেখতে পাও, তা যদি বেছে বেছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নিতে পারো তাহলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। আমি কেবল পুরাণ থেকে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দিলাম। দেখো ভাই, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে হয়তো দশটা দোষ আছে, কিন্তু অন্তত একটা গুণও তো নিশ্চয় আছে। তুমি সেই একটি গুণকেই গ্রহণ কর। পরমাত্মাদেব এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি করেন নি যার মধ্যে কোন গুণই নেই। পরের দোষ অনুসন্ধান করলে হৃদয় মলিন হয়ে যায়। তাই তোমাদের প্রতি আমার আদেশ, পরদোষানুসন্ধান সযত্নে পরিহার করো। পার্বতী শঙ্কর ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে দেব, চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায় কী?" শঙ্কর ভগবান তখন পার্বতীকে বললেন ঃ —

জপাৎ শুদ্ধিঃ, জপাৎ শুদ্ধিঃ, জপাৎ শুদ্ধির্বরাননে। অর্থাৎ হে পার্বতী, জপযজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। দেখো ভাই, অনেকে আমার কাছে এসে বলে, বহুদিন ধরে আমি জপ করছি, তবু আমার চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে না কেন? আমি তাদের বলি তোমরা জপ তো করছ, কিন্তু সেই সঙ্গে পরের দোষও যে খুঁজে বেড়াচ্ছ, তাতেই শুদ্ধ অন্তঃকরণ আবার মলিন হয়ে যাচ্ছে। কীরকম জানো? বাড়িটাকে বেশ করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করলে, কিন্তু দরজা জানলাগুলোকে বন্ধ করলে না। ঝড়বাতাসে যত রাজ্যের ময়লা আবর্জনা ঢুকে বাড়িটাকে আবার নোংরা করে ফেলল। এ হল যেন হাতির স্নান করা। হাতি স্নান করার পর আবার গায়ে ময়লা মেখে নেয়। তাই বলছি বাড়ি একবার ধোয়া হয়ে গেলে দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে হয় যাতে আর ময়লা ঢুকতে না পারে। তোমরা তো অনেক জপ করলে, অন্তঃকরণও শুদ্ধ হল, কিন্তু পরের দোষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ময়লায় চিত্তকে আবার মলিন করে ফেললে।

সকল ধর্মাবলম্বী লোক বলে থাকে — চিত্তমল ক্ষালন কর। মুসলমান ফকিরেরা বলে, "দিল সাফ্ করো।" আমরা বলে থাকি, "অন্তঃকরণ শুদ্ধ করো।"

ধর্মপথাবলম্বীগণ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরের দোষ অনুসন্ধানরূপ ময়লাকে সরাতে পারে না। তাই তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, পরের দোষ অনুসন্ধানরূপ মালিন্য যাতে না তোমাদের স্পর্শ করে তার জন্য তোমরা বিশেষভাবে চেষ্টা করবে। এ বিষয়ে তোমাদের খুব সাবধান হতে হবে, নইলে হাজার জপযজ্ঞেও কোন ফল হবে না। দেখো ভাই দাশু, তোমাকে একটা দোঁহা শোনাচ্ছি, এর ভাবার্থ বড়ো আশ্বাসযুক্ত।

"পড়া রহো দরবারমে
ধাক্কা ধনীকে খায়
কোই দিন লহর সমুদ্র কি
পলমে দারিদ্র যায়।"

অর্থ ঃ ঈশ্বরের দরবারে পড়ে থাক, যতই ধাক্কা খাও অর্থাৎ যতই দুঃখ পাও, নিরাশ হবে না, ঈশ্বরের চরণশরণ করতে ছাড়বে না। দুঃখ তোমার যত বেশি হোক, একবার যদি ঈশ্বরের করুণা দৃষ্টি তোমার উপর পড়ে, এক মুহূর্তে তোমার সকল দুঃখ সকল অশুভ খণ্ডন হয়ে যাবে, যেমন অন্ধকার যতই বেশি হোক, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার মাত্র মুহূর্তের মধ্যে সারা ঘরখানি আলো হয়ে যায়, সমুদ্রের ধারে সারাজীবন বসে আছ কিছু ধনরত্ন পাও নি, কিন্তু কে জানে হয়তো একটি লহর এসে এক মুহূর্তেই তোমায় অনন্ত রত্ন দিয়ে যেতে পারে, তোমার দারিদ্র দুঃখ একপলে চলে যেতে পারে। এজন্য ঈশ্বরের দরবার ছাড়বে না অর্থাৎ ধর্মের দুয়ার কখনও ছাড়বে না, আশা করে পড়ে থাকবে, একদিন সুফল পাবে, নিরাশ হবে না।

দেখো ভাই দাশু, ধর্মসম্বন্ধীয় একটি বাক্য যদি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারো তাহলে তোমার ধর্মের দুয়ার আপনা থেকেই খুলে যাবে।

বিচার সার

বিচার সার — এটি ধার্মিক ব্যক্তির কাছে একটি মহাবাক্য। এই বিচার সার বাক্যের উপর একটি মজার দৃষ্টান্ত আছে, কাহিনিটি তোমাকে শোনাচ্ছি—

মহাবাক্য বিচার সারের গল্প

এক সাধুর মনে হল, 'বিচার সার' এই মহাবাক্যটি কীভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝান যায়। এই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাল। তিনি

একখানি কাগজে বড়ো বড়ো অক্ষরে দুটি কথা লিখলেন, 'বিচার সার'। তারপর কাগজখানা ভাঁজ করে, কাপড় দিয়ে বেশ করে মুড়ে তা সেলাই করে দিলেন। এবার সেই কাপড়ের উপর এক হাজার টাকা দাম লিখে তিনি বাজারে নিয়ে গেলেন বিক্রি করবেন বলে, কিন্তু কেউই তাঁর সেই মোড়কটি কিনল না। একে তো হাজার টাকা দাম, তার উপর মোড়কের ভিতর কী আছে তা-ও কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তাই অত দাম দিয়ে নেবেই বা কে? এমন সময় এক ধনী ব্যবসায়ী নিছক কৌতুহলবশেই সাধুর কাছ থেকে মোড়কটা কিনে নিল, সাধুও টাকা নিয়ে তাঁর নিজের কাজে চলে গেলেন। ব্যবসায়ী ভেবে ছিল হয়তো কোন দামী জিনিস তার কপালে জুটে যাবে, কিন্তু মোড়ক খুলে তো তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। সে দেখল, ভিতরে রয়েছে শুধুই একখানা কাগজ আর তাতে লেখা রয়েছে দুটি কথা, 'বিচার সার'। নিজের এই বোকামির জন্য নিজের উপরেই তার রাগ হতে লাগল, কিন্তু এত দাম দিয়ে কিনেছে আর সাধুর কাছ থেকে পেয়েছে বলে কাগজখানা ফেলে দিতেও তার মন চাইল না। সে নিজের শোবার ঘরের দেয়ালে কাগজখানা খুব যত্ন করে টাঙিয়ে রাখল।

কিছুদিন পরে ব্যবসায়ী আরও ফলাও করে ব্যবসা করবে বলে স্ত্রী আর শিশুপুত্রকে ঘরে রেখে বিদেশে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে দিনরাত টাকা রোজগারের চিন্তাতেই মশগুল হয়ে রইল, ঘর-সংসারের কথা তার মনেই রইল না। এভাবে বহু বছর কেটে যাবার পর সে যখন দেখল যে তার অঢেল টাকা জমেছে, আর রোজগার না করলেও হেসে খেলে তার দিন কেটে যাবে, তখন তার বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ল। সে ঠিক করল বাড়িতে আগে থেকে কোনো খবর দেবে না। কিছু না জানিয়ে হঠাৎ সেখানে হাজির হয়ে স্ত্রী আর ছেলেকে সে অবাক করে দেবে।

ব্যবসায়ী যখন তার বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। সে চুপিচুপি তার শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় সে দেখতে পেল যে তারই বিছানায় তার স্ত্রী এক জোয়ান লোকের সঙ্গে শুয়ে আছে। দেখেই তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কী, আমার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী! এই ভেবে সে একটা খড়্গ নিয়ে দুজনকেই কাটতে যাবে, এমন সময় দেয়ালে ঝোলানো সাধুর সেই 'বিচার সার' কথাটির দিকে তার নজর পড়ল। সে তখন হাতের খড়্গ নামিয়ে চিন্তা করতে লাগল– আমি যে এদের খুন করতে যাচ্ছি সেটা কি ঠিক হচ্ছে? প্রাণ-সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যখন আমার নেই, তখন প্রাণ নষ্ট করবার অধিকার কি আমার আছে? বরং এদের কী বলবার আছে তা না হয় একবার শোনা যাক্।

ব্যবসায়ী এই সব ভাবছে এমন সময় দুজনের ঘুম ভেঙে গেল। স্বামীকে দেখে স্ত্রী প্রণাম করে ছেলেকে বলল, এঁকে প্রণাম করো, ইনি তোমার বাবা। এতক্ষণে ব্যবসায়ী বুঝতে পারল তার ছেলেই মায়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ছিল, বাইরের কোনো লোক নয়। সে তখন ভাবতে লাগল, সাধুর এই মহাবাক্যে 'বিচার সার' যে কী অমূল্য সম্পদ তা এতদিনে আমি উপলব্ধি করলাম। এক হাজার টাকা দিয়ে যখন আমি সাধুর কাছ থেকে এই লেখা কিনে ছিলাম তখন সাধু আমাকে ঠকিয়েছে ভেবে কত বিরক্তই না হয়েছি। কিন্তু এখন বুঝেছি, এ মহাবাক্যের তুলনা নেই।' আজ যদি আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকে খুন করতাম তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচা করলেও কি তাদের প্রাণ ফিরে পেতাম? 'বিচার সার' মহাবাক্যই আজ আমাকে সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছে। বিনা বিচারে ঝোঁকের মাথায় কাজ করা যে কী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, আজ আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

দেখো ভাই দাশু, এই গল্পের তাৎপর্য থেকে সিদ্ধান্ত হল – ব্যবহার কার্য, পরমার্থ কার্য যা কিছু কর না কেন বিচারপূর্বক করবে, বিচারবান ব্যক্তির শান্তি করতলগত হয়ে থাকে। মানুষ মাত্রই কী চায়? শান্তি চায়, সুখ চায়, কিন্তু তা পাওয়া যায় না কেন? কীভাবে সুখ শান্তি মিলবে তার উপায় তাদের জানা নেই।

"বিনা বিচারে কুতঃ শান্তি
বিনা শান্তি কুতঃ সুখম্"

বিচার বিনা শান্তি পাওয়া যায় না, শান্তি বিনা সুখ নেই। মানুষের জন্য পরমাত্মাদেব বিশ্রান্তির দুটি জিনিস বানিয়ে দিয়েছেন (এক) জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য 'বিচার' আর (দুই) অজ্ঞানী ব্যক্তির জন্য 'প্রারব্ধ'।

রোগ-শোক দুঃখ-তাপ দেখা দিলে জ্ঞানী বিচারের দ্বারা তা সরিয়ে দেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তি রোগ-শোক বা দুঃখে পড়লে প্রথমে খুব হা-হুতাশ করতে থাকে, আছাড় পাছাড় করে, বাপরে মারে বলে চিৎকার করে, তারপর শেষ কালে শান্ত হয়ে প্রারব্ধকে মেনে নেয়। তখন বলে, "কী আর করব, অদৃষ্টে আমার এই ছিল।" এই ভাবে অদৃষ্টকে মেনে নিলে মানুষের বিশ্রান্তি মেলে বটে, তবে প্রথম থেকেই প্রারব্ধের দোহাই দিয়ে মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না। পায়ে কাঁটা ফুটেছে – প্রারব্ধে ছিল বলে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, ঝট্ করে ওই কাঁটা বের করে নেবার উপায় নির্ধারণ করে। রোগ হলে মানুষ তাড়াতাড়ি করে ডাক্তার দেখায় ওষুধ খাওয়ায়। কিন্তু রোগ ভালো হবে কি হবে না – এ ব্যাপারে

মানুষের কোন হাত নেই। এই জন্যে কাজ করে যেতে হবে। কাজের ফলাফলকে প্রারব্ধের উপর ছেড়ে দিতে হয়। এটিই সিদ্ধান্ত বাক্য।

দাশুবাবু ঃ প্রারব্ধ জিনিসটা কী? কোথা থেকে এর উৎপত্তি?

শ্রী শ্রী গুরু ঃ বাছা, পূর্বজন্মের কৃতকর্মের যে ফল তাকেই বলে প্রারব্ধ। প্রারব্ধের সংস্কার বশে মানুষ সব জিনিস পেয়ে থাকে।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, আমার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ প্রারব্ধ ছাড়া যখন জীবনে কিছু মিলবে না, তখন আমি ঈশ্বরকে ডাকতে যাবো কেন? ডেকে তো লাভ নেই। আমাদের বাংলার এক ভক্ত কবি গান লিখেছেন, তার দু'লাইন আমি শোনাচ্ছি।

তবে তারা তোমার ভরসা বলো কে করে
(ওমা) যদি আপনারই কর্মফল ফলিবে আমারে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই দাশু, আমারও এই কবিতার ভাবের উপর একটি গল্প মনে পড়ছে, আমি তোমাকে শোনাচ্ছি –

"অষ্টাবক্র ঋষির ব্রহ্মলাভের গল্প" ঃ

অষ্টাবক্র ঋষি জন্মাবধি বিকলাঙ্গ, তাঁর দেহের আট জায়গা বাঁকা। তাই তাঁর মনে বড়ো দুঃখ। তিনি ভাবলেন, আমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই একবার জিজ্ঞাসা করব কেন তিনি আমাকে এমন বিকলাঙ্গ করে সৃষ্টি করেছেন? এই ভেবে অষ্টাবক্র এক সদ্‌গুরুর কাছে গিয়ে বললেন "হে গুরুদেব, এই সৃষ্টি কোন্ দেবতা রচনা করেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" গুরু তখন তাঁকে ব্রহ্মার মন্ত্র দিলেন। অষ্টাবক্র তন্ময় হয়ে সেই মন্ত্র জপ করে দিনরাত কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তাঁর এই তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাঁর সামনে এসে আবির্ভূত হলেন। অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? আপনার কী কাজ?" ব্রহ্মা বললেন, "আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। এই বিশ্ব সংসারে যা কিছু দেখছ, সব আমি সৃষ্টি করেছি।" ব্রহ্মার কথা শুনে অষ্টাবক্র তাঁকে বললেন, "তুমি কেমন সৃষ্টিকর্তা? আমার মতো আট জায়গায় বাঁকা এরকম জীব সৃষ্টি আপনার?" ব্রহ্মা বললেন, "হে অষ্টাবক্র! আমি কী করব বলো, তোমার প্রারব্ধই যে এরকম। পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলের দরুন তুমি এরকম বিকলাঙ্গ হয়েছ।" তখন অষ্টাবক্র বললেন, "হে ব্রহ্মা, যখন আমার প্রারব্ধের জন্যই দেহের এমন বিকৃত গঠন ঘটেছে, তখন তুমি আর নিজেকে সৃষ্টিকর্তা বলে বৃথা অহংকার করছ কেন? তোমাকে দিয়ে আমার আর কোনো কাজ নেই।" ব্রহ্মা লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শ্রীমৎ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

অষ্টাবক্র আবার গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে গুরুদেব, এই জগতের পালন কর্তা কে? আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করব।" গুরু তাঁকে বললেন, "বৎস, জগতের পালনকর্তা হলেন বিষ্ণু। তখন গুরুর কাছ থেকে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করে অষ্টাবক্র আবার কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু তাঁকে দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র তাঁকেও আগের মতো পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বিষ্ণু বললেন, "এই বিরাট বিশ্বের আমি পালন কর্তা। বিশ্বে যত প্রাণী আছে, আমি সবাইকে আহারাদি যুগিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি।" অষ্টাবক্র বললেন, "আপনি সব প্রাণীকে আহার যুগিয়ে থাকেন বলছেন, তাহলে আমি কেন পেটভরে খেতে পাইনা। মাঝে মাঝে অনাহারেও দিন কাটাতে হয়।" বিষ্ণু বললেন, "তা আমি কী করব বলো? তোমার যেমন প্রারব্ধ তেমনি তো পাবে। তার চেয়ে বেশি আমি কোথা থেকে দেব?" বিষ্ণুর একথা শুনে অষ্টাবক্র তাঁকে বললেন, আমার ভাগ্যে যা মাপা আছে তার চেয়ে বেশি কিছু দেবার যখন তোমার শক্তি বা সামর্থ্য নেই তখন তুমি পালনকর্তা, সমস্ত প্রাণীর আহার যোগাও এসব বলে বৃথা অহংকার আস্ফালন করছ কেন? আর আপনাকে আমার কোনো দরকার নেই"। একথা শুনে বিষ্ণু অন্তর্হিত হলেন। অষ্টাবক্র গুরুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে গুরুদেব, বিশ্ব-সংসারের সংহারকর্তা কে?" গুরু বললেন, "বৎস? বিশ্বের সংহারকর্তা হলেন মহেশ্বর। তখন অষ্টাবক্র বললেন, "তাহলে আমাকে মহেশ্বরের মন্ত্র দিন, আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।" গুরুদেব অষ্টাবক্রকে মহেশ্বরের মন্ত্র দিলেন। অষ্টাবক্রও তদ্‌গতচিত্ত হয়ে বহুদিন তপস্যা করার পর মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে দর্শন দিলেন। অষ্টাবক্র তাঁকে যথারীতি প্রশ্ন করলেন, "আপনি কে? কী আপনার কাজ?" মহেশ্বর বললেন, "আমি এই বিশ্বসংসারের সংহারকর্তা মহাকাল।" অষ্টাবক্র তখন বললেন, "যাক, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, বড়ো ভাল হল, আপনি এখনই আমাকে সংহার করুন। আমি আর এই বিকলাঙ্গ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই না, এ দেহ আমি আর বইতে পারছি না।" একথা শুনে মহেশ্বর বললেন, "আমি তো তোমাকে সংহার করতে পারব না, তোমার প্রারব্ধ অনুসারে তোমার বহুদিন পরমায়ু আছে।" অষ্টাবক্র বললেন, "আমার প্রারব্ধই যখন সব বিষয়ের কর্তা তাহলে আপনি কেন বৃথা নিজেকে সংহারকর্তা বলে জাহির করেন? যান, আপনার সঙ্গে আমার কোনো কাজ নেই।"

এই কথা শুনে মহেশ্বর অন্তর্ধান করলেন। অষ্টাবক্র তখন গুরুদেবের কাছে এসে বললেন, "গুরুদেব, আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর- এই তিন দেবতার দর্শন পেলাম,

কিন্তু তাঁদের কাউকে দিয়েই আমার অভীষ্ট পূরণ হল না। তাঁরা সবাই একবাক্যে বললেন, আমার প্রারব্ধই আমার কর্তা আমি যেমন কর্ম করেছি তারই ফলস্বরূপ আমার প্রারব্ধ ও ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাদি রচিত হয়েছে। সেই প্রারব্ধকে উল্টে দেবার বা খণ্ডন করবার ক্ষমতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কারুরই নেই। তাহলে তো দেখছি আমিই আমার কর্তা, গুরুদেব কোন সাধনায় আমি 'আমার' দর্শন পাব, 'আমি'কে তা জানতে পারব, এবার আপনি আমাকে সেই সাধনার উপদেশ দিন।" গুরুদেব দেখলেন, বহুকাল ধরে অষ্টাবক্র কঠোর তপস্যা করেছেন, আর তার ফলে তাঁর চিত্ত নির্মল ও পবিত্র হয়ে উঠেছে, তাই তাঁর এখন আত্মানুসন্ধানের প্রবৃত্তি জেগেছে। কোনো সাধনাই তাই নিষ্ফল নয়। তাই দেখে তখন অষ্টাবক্রের প্রার্থনা অনুসারে তাঁর আত্মদর্শন বা আত্মোপলব্ধির জন্য গুরুদেব তাঁকে ব্রহ্মমন্ত্র দান করলেন এবং অষ্টাবক্রও একাগ্রচিত্ত হয়ে কঠোর তপস্যা করার ফলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করলেন। জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ – এই চরম ও পরমতত্ত্বের উপলব্ধিতে তিনি কৃতার্থ হয়ে গেলেন। যোগবাশিষ্ঠের সারাংশ শ্লোক তাঁর উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হল না।

যোগবাশিষ্ঠের সারবাক্য ঃ

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যৎ উক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব কেবলম্।।

অর্থ ঃ যা কোটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, তা আমি অর্দ্ধশ্লোকে বলছি – একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয় অর্থাৎ জীব কেবল ব্রহ্মই।

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, এই গল্প থেকে আমরা শিখলাম যে, অষ্টাবক্র যখন উপলব্ধি করলেন যে, আমার কৃতকর্মই আমার প্রারব্ধ হয়ে আমাকে চালিত করবে তখন আমিই আমার কর্তা, অতএব আমারই অন্বেষণ করা প্রয়োজন। অষ্টাবক্র ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসনা করে জানলেন – ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। মহারাজ, আপনার শ্রীমুখ থেকেই তো বহুবার শুনেছি ঃ

হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনুঃ।
(অর্থ ঃ হরিই জগৎ, জগৎই হরি। হরি আর জগৎ আলাদা নয়)।

তাহলে এই কথার সঙ্গে অষ্টাবক্রের ঐ কথার সমন্বয় কেমন করে হবে? জগৎ মিথ্যা, না জগৎই হরি? কোনটা সত্য?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই দাশু, ভগবানের অস্তিত্ব দু'ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

এক বিধিবাক্য বা অস্তিভাব দিয়ে আর এক নিষেধ বাক্য বা নাস্তিভাবে দিয়ে। এর মধ্যে যে মানুষ যে ভাব গ্রহণ করে তার পক্ষে সেটাই ভালো। জ্ঞানী পুরুষের কাছে – "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্" অর্থাৎ এই জগৎ সংসারে যা কিছু আছে সব মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এবং জীবও ব্রহ্মই অর্থাৎ 'সোঽহম্' আমি আছি, আর কিছুই নেই। এই হল নিষেধ বাক্য, সব কিছুকে নিষেধ বা নস্যাৎ করে ঈশ্বরের উপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধি করা। ভক্ত বলে থাকেন, এই জগৎ সংসারে যা কিছু দেখা যাচ্ছে সবই হরিময়, হরি ছাড়া আর কিছুই নেই।

"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনু।।"

এটি হল—ভক্তের ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা। একে বলা হয় বিধিবাক্য। বিধিবাক্য মেনে নাও বা নিষেধ বাক্যই গ্রহণ করো, যে ভাবকেই নেবে, তা সেই এক ঈশ্বরকেই স্থাপন বা প্রতিপাদন করে দেবে। তবে যে সাধকের কাছে যে ভাব মিষ্টি লাগে সেই সাধক সেই ভাবকেই গ্রহণ করে থাকে। দেখো ভাই দাশু, ধর্মসম্বন্ধীয় এক দোঁহা তোমাকে বলছি ঃ

সাহেবসে সাচ্চা রহো।
দুনিয়াসে সৎ ভাব।।
কে তো লম্বে কেশ কর্।
কে তো ঘোট মোড়াও।।

অর্থ ঃ ঈশ্বরের নিকট সাচ্চা থাকবে, দুনিয়ার সকলের সহিত সদ্‌ভাব রাখবে। কেউ মাথায় জটাজুট ধারণ করে ঈশ্বর আরাধনা করে থাকেন, কেউ মস্তক মুণ্ডন করে ঈশ্বরকে ডেকে থাকেন, তাতে কিছু আসে যায় না, যে পন্থাতেই হোক ঈশ্বরকে ডাকা চাই, ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে দর্শন করা চাই। মাথা মুড়ালে লোকে নিন্দা করবে অথবা জটা রাখলে লোকে মন্দ বলবে, সেদিকে তাকাবে না, নিন্দে করুক অথবা সুখ্যাতি করুক, তোমার তা দেখবার প্রয়োজন নেই। যার যা ইচ্ছে বলুক. তুমি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে খাঁটী থাকবে, আর দুনিয়ার লোকের সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে ঈশ্বর আরাধনা করতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বরকে পাবে।

দেখো ভাই দাশু, তোমার প্রশ্ন ছিল তোমার শুভাশুভ কর্মই যখন তোমাকে শুভাশুভ ফল দেওয়ার মালিক, তখন আর ঈশ্বরকে কেন ডাকতে যাব? তোমার একথা বলবার উদ্দেশ্য হল এই যে, আমি শুভ কর্ম করে যাব, শুভ ফল আপনা

যেখানেই মিলবে, তাহলে আর ঈশ্বরকে ডাকবার প্রয়োজন কী? তোমার প্রশ্নের আমি এই উত্তর দিচ্ছি যে, ঈশ্বরকে ডাকাও তো এক শুভকাজ, এই শুভকাজ করলেও তো শুভফলই মিলবে। তবে বলছ কেন যে ঈশ্বরকে ডাকব না?

দাশুবাবু ঃ মহারাজ, ঈশ্বরকে ডাকব না – এই কথাটি আমি আমাদের বাংলার এক শক্তিসাধক রামপ্রসাদের লেখা একটি গানের ভাব থেকে বলছি। ভক্ত রামপ্রসাদ একদিন অভিমান করে কালীমাতার উদ্দেশ্যে গাইছেন –

"শ্যামা মা মা বলে আর তোকে ডাকবো না
আমায় দিয়েছ, দিতেছ ভবে কতই যন্ত্রণা।"

এই গানের তাৎপর্য হল – আমি সংসারে এত দুঃখ কষ্ট পাচ্ছি, কিন্তু আমার সর্বশক্তিময়ী দুঃখনাশিনী মাতা আমার দুঃখ নিবারণ করছেন না। তাই আমি আমার মাতাকে মা মা বলে আর ডাকব না। এটি হল ভক্তের অভিমানের কথা। মহারাজ, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কিন্তু আমাদের তিনি দুঃখ নিবারণ করছেন না। সেই কারণেই আপনি উপদেশ করলেন, ঈশ্বর কী করবেন, এরকমই তোমার কর্মফল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই দাশু, ঈশ্বরের কাছে যাবার তিনটি মার্গ বা পথ আছে। জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ ও কর্ম মার্গ। কর্মমার্গ তোমার ভাল মনে হলে তুমি তাই অবলম্বন কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে একথা মনে রাখবে যে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে, এটাই পরম শুভকর্ম। এটি ছাড়া আর কোন পরম শুভকর্ম নেই, ঈশ্বরকে ডাকার মধ্যে সবকিছু শুভকর্ম নিহিত আছে।

যখন এসব সৎসঙ্গ হচ্ছিল, আমি সে সময় উপস্থিত ছিলাম। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম – হে প্রভু, জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গ, কর্ম মার্গ – এসব কিছুই জানি না, বুঝি না. তবে এটুকু জানি যে, যিনি যোগিজনের কাছে আত্মা, জ্ঞানীজনের কাছে ব্রহ্ম আবার তিনিই ভক্তগণের কাছে ভগবান।

আমি যতক্ষণ অন্তর জগতে ডুবে গিয়ে এসব চিন্তা করছিলাম, ততক্ষণ আর কি কি সৎসঙ্গ হল আমি শুনিনি। যখন আমার বাহ্য জগতে মন নেমে এল, তখন দেখলাম শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সভা শেষ হয়ে গেছে। তিনি স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা করতে উঠে গেলেন। আজকের সৎসঙ্গগুলি বড় ভাল লাগছিল। তাই একটি কথাও ভুলিনি, সবগুলি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি।

দ্বিতীয় পর্ব

স্থান ঃ ধ্যানকুঠী, আষাঢ় মাস, ১৩৪২ সাল সময় ঃ সকাল

চারুশীলা মাতা

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[শরীরের ষড় বিকার ঃ দেহ ও আত্মা স্বতন্ত্র ঃ দেহের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ ঃ গীতায় উক্ত আত্মতত্ত্ব ঃ একমাত্র উচ্চকোটীর সাধুমহাত্মাই জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে জয় করতে পারে ঃ গুরুপ্রদত্ত দীক্ষা – মন্ত্র নেওয়া কখন সার্থক ও কল্যাণময় হয় ঃ এ সম্পর্কে যবের বীজের গল্প ঃ কাপুরুষ কে? সাধু না গৃহী ঃ গৃহী অথবা সাধু – যার মধ্যে আত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে সেই হল বীরপুরুষ ঃ আত্মবোধ জাগ্রত হওয়ার একটি গল্প – তা হল 'রাজাকে কুকুর কামড়ানোর গল্প' ঃ শ্রীশ্রীশংকর ভগবানের একটি নাম হল ভাঙড় – এ সম্পর্কে গণেশকে লাথি মারার গল্প ঃ মিষ্টি কথা বলবে আর মিষ্টি ব্যবহার করবে ঃ মিষ্টি কথার গল্প ঃ শংকরাচার্য মেয়েদের পিশাচিনী বলেছেন কেন? নারী সম্পর্কে দুটি দুরকমের দোঁহা ঃ সুমতিই সম্পত্তি বা সুখস্বাচ্ছন্দের হেতু আর কুমতি হল দুঃখ ও বিপদের নিদান ঃ নির্বাসনা ও শুভ বাসনা, এ সম্পর্কে মাটি খাওয়ার দৃষ্টান্তর গল্প]

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীদেহ কিছু অসুস্থ হয়েছিল, আমি ও চারুমা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে প্রশ্ন করলাম – বাবা, আপনি কেমন আছেন? তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমাদের চিন্তান্বিত দেখে গুরুমহারাজ বালকের মতো হেসে আমাদের সকল চিন্তা যেন সরিয়ে দিলেন, তারপর বলতে লাগলেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। মা, এই শরীর জরা ব্যাধিগ্রস্ত ক্ষণভঙ্গুর হয়েই থাকে। শরীর ষড়বিধ বিকারগ্রস্ত। এই শরীরে ছ রকম বিকার লেগেই থাকে। এই ছটি বিকার হল – (১) অস্তি অর্থাৎ আছে, (২) জায়তে অর্থাৎ জন্ম হয়, (৩) বর্দ্ধতে অর্থাৎ বাড়তে থাকে, (৪) বিপরিণমতে অর্থাৎ পরিবর্তন হয়, (৫) অপক্ষীয়তে অর্থাৎ দিন দিন ক্ষয় বা ক্ষীণ হতে থাকে, (৬) বিনশ্যতি অর্থাৎ শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তুমি জ্ঞানী হও অথবা অজ্ঞানী হও, দেহধারী মাত্রেরই এই ছয় রকম দোষ বা বিকার দেখা দেয়। প্রথম 'অস্তি' অর্থাৎ আছে, না থাকলে আসবে কোথা থেকে? তবে অন্য রূপে আছে। তারপর 'জায়তে' অর্থাৎ মানুষের জন্ম হয়, এরপর 'বর্দ্ধতে' অর্থাৎ জন্মের পর সে বাড়তে থাকে। তারপর 'বিপরিণমতে' অর্থাৎ শিশু অবস্থা

থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত তার পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। সব মানুষ নিত্য তা দেখে থাকে, কিন্তু বুঝতে পারে না। এরপর 'অপক্ষীয়তে' অর্থাৎ মানুষ দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকে, জরাগ্রস্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। শেষে 'বিনশ্যতি' অর্থাৎ মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, একদিন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই হল স্বাভাবিক নিয়ম, আজ পর্যন্ত কেউ একে রোধ করতে পারেনি।

আমি (সরলাবালা) ঃ বাবা, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে জীবশরীর ষড়বিধ বিকারযুক্ত হবেই হবে। এই বিষয়ে যদি কারোর পূর্ণরূপে ধারণা হয়ে যায়, তাহলে তার আত্মীয় বিয়োগে কেন শোক হবে, রোগ হলে কেন দুঃখ হবে, নিজেরই বা মৃত্যুভীতি থাকবে কেন, যা নিশ্চিত হবেই হবে এবং যা কোন উপায়ে আটকে রাখা যায় না, তার জন্য মানুষ কেন রোগ শোক মৃত্যুভীতি ইত্যাদিতে কাতর হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, পরিপূর্ণরূপে যার এই বিষয়ে ধারণা হয়ে যাবে, তার শোকও হবে না, মৃত্যুভীতিও হবে না। তবে এ বিষয়ে দৃঢ় ধারণা হওয়া চাই। বিচার করে দেখলে তবেই দৃঢ় ধারণা হবে। তুমি শরীর নও, তোমার শরীর – এই সব কথা থেকে কী বুঝতে পারছ। বোঝা যাচ্ছে – তুমি শরীর থেকে আলাদা। সব সময় এটা বিচার করতে হবে। বিচার পাকা হয়ে গেলে, তবেই দৃঢ় ধারণা হবে। তা না হলে বিনা বিচারে ধারণা হওয়া মুসকিল। এই স্থূল দেহ একটি বাড়ির মতো। বাড়ি আর বাড়ির মালিক যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি শরীর ও শরীরস্থ সাক্ষীরূপী আত্মা স্বতন্ত্র। বাড়ি ভেঙে গেলে তাতে মালিকের গায়ে কোন আঘাত লাগে না কারণ, বাড়িটা ভেঙে পড়বার সময় সে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে সাক্ষী হয়ে ভাঙা বাড়ি দেখতে থাকে। যে ব্যক্তির বাড়ির প্রতি খুব মমত্ব রয়ে যায় সেই ব্যক্তি ভগ্ন বাড়ি দেখে বুক চাপড়ায়, মাথা কুটতে থাকে, হায়রে বাপরে করতে থাকে। আর যে ব্যক্তির বাড়ির প্রতি মমত্ব নেই, বাড়ি ভেঙে গেলে তার কোন দুঃখ হয় না। সে নিজেকে বাড়ি থেকে আলাদ করে সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে থাকে এবং বাড়ির দুর্দশা দেখতে থাকে। বাড়ির দৃষ্টান্ত হল এই স্থূল শরীর।

স্থূল শরীর থেকে আত্মা সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। শরীরে ব্যাধি দেখা দিলে, শরীর ভেঙে পড়লে আত্মার তাতে কোন ক্ষতি হয় না। এই দেহরূপী বাড়ি থেকে তুমি যদি সাক্ষীর মতো নিজেকে আলাদা করে নিতে পারো, তাহলে রোগ, শোক, যন্ত্রণা কিছুই বুঝতে পারবে না। রোগ এসেছে? আসতে দাও। জরা এসেছে? আসতে দাও। মৃত্যু এসেছে? আসতে দাও। তোমার দৃঢ় ধারণা হওয়া চাই যে, রোগ, জরা

মৃত্যু – এরা তো এসেছে শরীরে, আমাকে তো ছোঁয় নি। আমি হলাম অজর, অমর, আমার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আমি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন আত্মা। গীতাশাস্ত্রে এই আত্মতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশদভাবে শুনিয়েছেন।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত। (গীতা ২/১৮)

অনুবাদ ঃ নিত্য, অবিনশ্বর ও অপরিমেয় আত্মার এই দেহগুলি বিনাশশীল, নশ্বর। অতএব হে অর্জ্জুন, তোমার এই জড়দেহ কালে বিনষ্ট হইবেই, কিন্তু তুমি আত্মারূপে অবিনাশী। অতএব যুদ্ধ করে স্বধর্ম পালন কর।

দেখো বাছা সরলা, সকল শাস্ত্র মন্থন করে এই গীতাশাস্ত্র রচিত হয়েছে। তুমি নিত্য প্রতিদিন এই গীতাশাস্ত্র পাঠ করবে। আত্মা নিত্য, শরীর আদি অনিত্য – এই সার কথা গীতাশাস্ত্রে বহুভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিত্য প্রতিদিন গীতাশাস্ত্র পাঠ এবং আলোচনা করলে আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে তুমি কিছু ধারণা করতে পারবে।

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন –
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি –
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। (গীতা ২/২৯)

অনুবাদ ঃ কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যতুল্য দেখেন। অন্য কেউ এঁকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন। অপর কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন এবং কেউ কেউ এঁকে শুনে, বলে বা দেখেও জানতে পারেন না। কারণ, আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়।

দেখো বাছা, একদিন তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে আমি উপদেশ প্রদান করলাম আর তোমার আত্মা সম্পর্কে ধারণা হয়ে গেল, সে তো হবে না। বারংবার পুনঃ পুনঃ আত্মা সম্বন্ধে বিচার করতে হবে, তাঁর ধ্যান করতে হবে, তবেই ধারণা দৃঢ় হয়ে হৃদয়ে বসে যাবে। যে সাধকের নিত্যানিত্য বোধ দৃঢ় হয়ে যায়, তার জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এলেও তার মধ্যে কোন ব্যাকুলতা আসে না। তবে এরকম ভাব উচ্চকোটি সাধুমহাত্মার মধ্যেই দেখা যায়। নিম্ন কোটী সাধকের এরকম ভাব ধারণা হওয়া খুব মুসকিল, হয় না বললেই চলে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের এইসব কথা শুনে আমরা যেন এক অতীন্দ্রিয় শান্তি রাজ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন প্রাণ ভরে গিয়েছিল। এই সময় আমি বললাম – বাবা, আমার এক আত্মীয় আপনার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে চায়,

তাকে কি দয়া করবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, আমি তো হরিনামের এক সদাব্রত খুলে দিয়েছি। যে পিপাসিত হয়ে এখানে এসে যাচ্ছে তাকে দীক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। তবে দেখো, দীক্ষা দিলেই যে মানুষের কল্যাণ হবে এমন কোন কথা নেই। যে ব্যক্তি দীক্ষা নেবে তাকে বীজে জলসেচন করতে হয় অর্থাৎ সাধন করতে হয়। তবেই ফল লাভ করা যায়। নইলে দীক্ষা নিলাম আর বাক্সে ভরে রেখে দিলাম তাতে কোন কাজ হবে না। মালি জমিতে বীজ বুনে যদি তাতে জল না দেয়, তাহলে ফসল ফলে না। তেমনি গুরু হৃদয়-ক্ষেত্রে, মনের জমিতে যে মন্ত্রবীজ বপন করে দেন তাতে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে হয় শিষ্যকে, তবেই সে ফললাভ করতে পারে অর্থাৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে থাকে। দেখো বাছা, এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি, তাতে তোমার বুঝতে সহজ হবে।

যবের বীজের গল্প ঃ

এক সাধু মহাপুরুষের কাছে দুজন লোক এসে বলল, 'মহারাজ, আপনার কাছে আমরা দীক্ষা নেব।' সাধু বললেন, 'বেশ আমি তোমাদের দীক্ষা দেব। তবে আমি তো এখন দেশ ভ্রমণে বেরুচ্ছি, ফিরে এসে দীক্ষা দেব। এখন তোমরা এক কাজ কর। তোমাদের একটা করে যবের বীজ দিচ্ছি। তোমরা খুব যত্ন করে তা রেখে দাও, যাতে নষ্ট না হয়। আমি ফিরে এলে আমাকে ঐ বীজ ফেরৎ দেবে।' এই বলে সাধু দুজনকে একটা করে যবের দানা দিলেন। লোক দুটি তাই নিয়ে চলে গেল। সাধুও দেশ ভ্রমণে বের হলেন।

বাড়িতে এসে প্রথম লোকটি ভাবল যে, সাধুবাবা ফিরে এলে তাঁকে তো বীজ ফেরৎ দিতে হবে, তিনি বলেছেন যে বীজ যেন নষ্ট না হয়। এই ভেবে সে যবের বীজকে কাপড় দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে একটা বাক্সের মধ্যে ভরে রাখলো। দ্বিতীয় লোকটিও বাড়ি ফিরে সেই একই চিন্তা করতে লাগল – কীভাবে বীজটিকে তাজা রাখা যায়। সে ভাবল, সাধু তো দেশ ভ্রমণে গিয়েছেন। কবে যে ফিরবেন তার কোন ঠিক নেই। যদি তাঁর ফিরতে দেরি হয় তাহলে বীজটাকে এমনি ফেলে রাখলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই লোকটি তখন কিছুটা জমিতে সার দিয়ে যবের বীজটি তাতে পুঁতে দিল। তারপর প্রতিদিন সেই জমিতে প্রয়োজন মত জল ঢেলে তার পরিচর্যায় লেগে গেল। এইভাবে এক দানা যব থেকে যখন এক অঞ্জলি যব হল তখন সে বড়ো জমিতে সেই সব বীজগুলি লাগিয়ে দিল। এবার সেই এক অঞ্জলি

যব থেকে সে পেল এক ধামা যব। তখন সে আরও বড়ো জমিতে সেই সব যব লাগিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে বস্তা বস্তা যব ফলিয়ে তুলল। লোকটি ছিল গরীব। তার পর্ণকুটিরে এত যব রাখবার জায়গা নেই। তাই সে বীজের জন্য কিছু রেখে দিয়ে বাকি সমস্ত যব বিক্রি করে দিল। এইভাবে প্রতি বছর যবের ফলন বেড়েই চলল। যব বিক্রি করে অজস্র টাকা তার হাতে এসে গেল। পাকা ঘরবাড়ি তৈরি করে সে খুব আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

অনেকদিন পর সাধু মহাত্মা ফিরে এসে লোক দুটিকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হাজির হলে সাধু তাদের কাছে তাঁর দেওয়া সেই যবের বীজ কেমন আছে তা দেখতে চাইলেন। প্রথম লোকটি বাক্স থেকে কাপড়ে মোড়া বীজ বের করে সাধুর হাতে দিল। সাধু দেখলেন যে অনেকদিন ধরে বাক্সে-বন্ধ থাকার দরুণ যবের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় লোকটি এক বস্তা যব সাধুর কাছে ঢেলে দিয়ে বলল, 'আপনার সেই এক দানা বীজ থেকে আমি বস্তা বস্তা যব পেয়েছি। এই বলে কেমন করে সেই একটিমাত্র বীজ থেকে এত যব উৎপন্ন হল, কেমন করে তা বিক্রি করে সে ঘরবাড়ি অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হল তা সব সে সাধুর কাছে বলতে লাগল। সব শুনে সাধু খুব আনন্দিত হয়ে তাকে বললেন, 'তুমিই আমার শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত পাত্র, তোমাকে বীজমন্ত্র দিলে তা নিষ্ফল হবে না। সাধু তখন প্রথম লোকটিকে বললেন, 'দেখো, একই বীজ আমি তোমাদের দুজনকেই দিয়েছি। কিন্তু তুমি সেই বীজের কোন যত্ন নিলে না, ফেলে রেখে তা নষ্ট করলে, আর একে দেখো, সেই বীজের কেমন যত্ন নিয়ে তা থেকে এত ফসল ঘরে তুলেছে। কার্য অনুসারে ফল মেলে। তুমি বীজ মন্ত্র গ্রহণ করে কী করবে? যবের বীজের মতো তা নষ্ট করে ফেলবে। অতএব তুমি দীক্ষা নেবার অনধিকারী। গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র হৃদয়-জমিতে রোপন করতে হয়, তাতে ভক্তিবারি সিঞ্চন করতে হয়, তবেই জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের অধিকারী হয়ে মানুষ মোক্ষলাভ করতে পারে। দীক্ষা নিলাম অথচ জলসিঞ্চন করলাম না, (সাধন করলাম না) এতে কোন লাভ নেই।'

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উপরোক্ত দীক্ষামন্ত্র সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ উপদেশ শুনে সাধক কবি রামপ্রসাদ রচিত গানের একটি পংক্তির কথা মনে উদিত হল –

'মনরে কৃষি কাজ জাননা,
এমন মানব জমিন রইলো পতিত
তুমি আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

যে সাধক গুরুদত্ত বীজমন্ত্র গ্রহণ করে হৃদয় জমিতে আবাদ করে সোনা ফলাতে পারেন, তিনিই ধন্য, তাঁকে শত শত প্রণাম করি। এরপর আমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে বললাম –

বাবা, গৃহস্থ আশ্রম থেকে কি ভগবানকে ডাকা যায় না?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ বাছা, অবশ্যই ডাকা যায়। দেখো, এই ধরণের প্রশ্ন একদিন আশুবাবু (ডেপুটি সেক্রেটারী) আমাকে করেছিলেন।

আশুবাবু ঃ মহারাজ, কাপুরুষ কে? – সাধুকে কাপুরুষ বলবেন না গৃহস্থকে কাপুরুষ বলবেন? আমার এই প্রশ্নের উত্তর বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, তুমিতো গৃহস্থের সঙ্গে সাধুর ঝগড়া লাগিয়ে দিচ্ছ। গৃহস্থকে যদি কাপুরুষ বলি, তাহলে সে বলবে – আমি কিরূপে কাপুরুষ হচ্ছি? আমি তো সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি যুদ্ধ করছি। আর সাধুতো সংসার যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ভয়ে পালিয়ে যায়। তাই সাধু লোকই কাপুরুষ। দেখো ভাই, সাধুকে যদি কাপুরুষ বলি, তাহলে সে বলবে আমি কী করে কাপুরুষ হব – আমি তো সংসার বন্ধন ছিন্ন করে সাধন জগতে চলে এসেছি, তাই আমি তো বীরপুরুষের মতো কাজ করেছি। তাই আমাকে কাপুরুষ বললে, আমি তা স্বীকার করব না। তাহলে কাকে কাপুরুষ বলা হবে? দেখো ভাই আশুবাবু, তুমি তো সাধুর সঙ্গে গৃহস্থের দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিচ্ছ, আমি কী করে এর সমাধান করব? তুমিও (সরলাবালা) একই রকম প্রশ্ন করেছ, কাপুরুষ কে? গৃহস্থ না সাধু? আমি এই প্রশ্নের একই উত্তর দেবো, তা হল – নিজের স্বরূপ যে ব্যক্তি জানতে পেরেছে, সেই ব্যক্তিই হল বীরপুরুষ।

তুমি গৃহস্থ অথবা সাধু যাই হও না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। যে ব্যক্তি আত্মবোধ অর্জন করে নিয়েছে, আপন স্বরূপ জেনে ফেলেছে, সেই প্রকৃত বীরপুরুষ। আর যার হৃদয় অজ্ঞানতায় পূর্ণ হয়ে আছে, যার আপন স্বরূপের বোধ নেই, সেই কাপুরুষ। আশুবাবু এবং তোমার একই রকম প্রশ্ন ছিল। আমি একই প্রশ্নের একই উত্তর দিয়ে দিয়েছি। গৃহী আর সাধুর বিবাদেরও সমাধান করে দিলাম।

আশুবাবু এই উত্তর শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন, দেখো বাছা সরলা, ঈশ্বরকে ডাকার অধিকার সব মানুষেরই আছে। ঈশ্বর সাধুর ডাক শুনবেন, গৃহস্থের ডাক শুনবেন না, তা হয় না। বিচারপূর্বক আত্মবোধ অর্জন করা মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন। এই আত্মবোধ ক্ষণিকের মধ্যে এক বাক্যতেই হয়ে যেতে পারে, জন্মজন্মান্তরের

সাধনার ফলে ক্ষণিকের মধ্যে পূরণ হয়ে যায়।

আমি ঃ হাঁ বাবা, আমাদের এই কথা শোনা আছে যে একটি কথাতেই বৈরাগ্য জন্মে। আমাদের এই বাংলাদেশে লালাবাবু বলে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর অতুল ঐশ্বর্য ছিল। একদিন তিনি অপরাহ্ন বেলায় তাঁর বহিঃবাটীর বারান্দায় পদশ্চারণ করছিলেন, নিচে মৎস্য বিক্রেতা রমণীগণ চেঁচিয়ে বলছে, বাবুরা, শীঘ্র মাছের পয়সা দিন, আমাদের বাড়ি পরপারে, সন্ধ্যা সমাগত, আমাদের পারে যেতে হবে – 'সন্ধ্যা সমাগত পারে যেতে হবে'।

এই একটি কথার জন্যে লালাবাবুর প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি সারারাত ধরে বিচার করেছিলেন যে আমার জীবনে সন্ধ্যা সমাগত হয়েছে, আমাকেও তো পারে যেতে হবে, আমার পারের কড়ির সংস্থান করা তো হয়নি, আমার অতুল ঐশ্বর্য আমার পারের সহায়তা করতে পারবে না। তাই তিনি প্রত্যুষে উঠে তাঁর অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে এক বস্ত্রে পারের কড়ির সংস্থান করতে পদব্রজে বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে তাঁর অতি রমণীয় ঠাকুরবাড়ি আজও বিদ্যমান রয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ বাছা, এরকমই হয়ে থাকে। এই ভাবকে অবলম্বন করে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি –

রাজাকে কুকুর কামড়ানোর গল্প ঃ

এক রাজা ছিলেন। ওই রাজা রাত্রিতে নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন যে তিনি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছেন আর একটা কুকুর এসে তাঁকে কামড়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং তাঁর শরীর জ্বলে যেতে লাগল। অগত্যা তিনি স্বপ্নের মধ্যেই গেলেন এক বৈদ্যের কাছে। বৈদ্য বলল, 'আমাকে একটা পয়সা দাও, তোমাকে আমি ওষুধ দিচ্ছি। তোমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, শরীর সুস্থ হবে।' রাজা দেখলেন যে, তাঁর কাছে ওষুধ কেনার মতো একটা পয়সাও নেই, একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। রাজা বৈদ্যকে পয়সা দিতে পারলেন না, স্বপ্নের মধ্যেই এমন সময় এক সদ্‌গুরুর সঙ্গে রাজার দেখা হয়ে গেল। সদ্‌গুরু রাজাকে বললেন, 'বাছা, আমাকে পয়সা-কড়ি কিছু দিতে হবে না। আমি ওষুধ দিচ্ছি, তুমি ভালো হয়ে যাবে।' এই বলে তিনি রাজাকে ওষুধ দিলেন। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেলেন। তিনি সুস্থ হলেন। ঠিক তখনই রাজার ঘুম ভেঙে গেল। রাজা উঠে দেখলেন তার ঘরের দরজার বাইরে সেপাই পাহারা দিচ্ছে। তিনি

সেপাইকে বললেন, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?' সেপাই বলল, 'হুজুর, আমি তো বরাবর এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।' রাজার তখন হুশ হল যে তিনি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। রাজা তখন ভাবলেন, স্বপ্নের মধ্যে আমি এমন নিঃস্ব হয়ে গেলাম যে বৈদ্যকে দেবার মতো একটা পয়সাও আমার জুটল না! এবার রাজার মনে বিচার শুরু হয়ে গেল – কোন্‌টা সত্য, আমি রাজা, না কাঙাল? এতবড়ো রাজত্ব পেয়েও আমি বৈদ্যকে একটা পয়সাও দিতে পারলাম না। সেপাই পাহারা দিচ্ছে অথচ কুকুরের হাত থেকে সে আমাকে বাঁচাতে পারল না। আমি এ দেশের রাজা, এই তো রাণী আমার পাশেই শুয়ে আছে দরজায় সেপাই পাহারা দিচ্ছে, এরা তো আমার কোন কাজেই লাগলো না দেখছি। তাহলে কোন্‌টা সত্য – আমার রাজত্ব সত্য না, স্বপ্নে যে আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম, কুকুরে আমাকে কামড়াল, সেটাই সত্য।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে বিচার করতে করতে রাজার আত্মবোধ জাগ্রত হল যে, তিনি রাজাও নন, কাঙালও নন, তিনি হলেন সকল অবস্থার দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তিনি আত্মা।

একটি স্বপ্নকে উপলক্ষ্য করেই রাজার মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হল।

দেখো বাছা সরলা, জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফল এক ক্ষণিকের মধ্যে স্ফুরণ হয়ে গেল। তপস্যাবিহীন ব্যক্তির এরকম হয় না।

আমি ঃ বাবা, শঙ্কর ভগবানের একটি নাম ভাঙ্গড়। এই ভাঙ্গড় নামের তাৎপর্য কী – তা শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, এর তাৎপর্য বোঝাবার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

গণেশকে লাথি মারার গল্প ঃ

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী একটি ছোট গ্রামে বাস করে। তাদের একটি মাত্র মেয়ে। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু অর্থাভাবে তারা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না। ব্রাহ্মণের টাকা পয়সা না থাকলেও তার একটা গুণ ছিল, সে ভাগবত সম্পর্কে কথকতা করতে পারত। কিন্তু তাদের ছোট গ্রাম, পয়সা খরচ করে কে আর কথকতা শুনতে আসবে? মেয়ের বিয়ে দেবার খরচ কীভাবে জোগাড় হবে, কে তাকে টাকা দেবে – এইসব চিন্তায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। শেষে ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে একদিন সে ব্রাহ্মণীকে বলল, 'এখানে কেউ তো পয়সা দিয়ে আমার ভাগবত কথা শুনতে আসবে না, জঙ্গলের মধ্যে শিবঠাকুরের যে মন্দির আছে, আমি সেখানে

গিয়ে ঠাকুরকে কথকতা শোনাব'। দেখি শিবঠাকুর যদি প্রসন্ন হয়ে কিছু টাকাকড়ির ব্যবস্থা করে দেন।'

এই বলে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন জঙ্গলের ভিতর শির মন্দিরে যায়, সেখানে শিবঠাকুরের সামনে বসে কথকতা আরম্ভ করে দেয়। অনেকদিন অতিক্রান্ত হল, আর তিনদিন হলেই কথকতা শেষ হবে। এমন সময় এক বৈশ্য গঙ্গাস্নান সেরে শিবের মাথায় জল ঢালবে বলে সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। বৈশ্য শুনতে পেল, মহাদেব গণেশকে বলছেন, 'দেখো গণেশ, এই যে ব্রাহ্মণ রোজ আমাকে কথা শোনাচ্ছে, পরশু তার পাঠ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটি পয়সাও সে পেল না।' গণেশ উত্তরে বললেন, 'পিতা, কেউ তো এর কথকতা শোনেনি, কে এসে পয়সা দেবে?' তখন মহাদেব বললেন, 'বাইরের কোন লোক শোনেনি বটে, কিন্তু আমি তো শুনেছি, আমারই উচিত ওকে টাকা দেওয়া। ওর কথকতা শেষ হচ্ছে পরশু, সেদিন ওকে পাঁচশো টাকা দিতে হবে।' গণেশ বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আপনি নিশ্চিত থাকুন, পরশুদিন অবশ্যই আমি ব্রাহ্মণকে পাঁচশ টাকা দেব।'

এইসব কথাবার্তা শুনে বৈশ্য মনে মনে এক ফন্দি এঁটে ব্রাহ্মণকে বলল, 'হে ব্রাহ্মণ, এতদিন ধরে আপনি এখানে কথকতা করছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার দরুন এক কানা কড়িও মেলেনি। পরশু আপনার কথকতা শেষ হবে। তাই আমি এখন আপনাকে দুশো টাকা দেব, তার বদলে পরশু আপনি যদি কিছু পান, সেটা আমাকে দিয়ে দেবেন।' বৈশ্য দেখল গণেশ যখন বলেছে, তখন ব্রাহ্মণ পাঁচশো টাকা পাবেই পাবে। তাই আগে থেকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুশো টাকার চুক্তি করে নিলে তিনশো টাকা অমনিই তার হাতে এসে যাবে। ব্রাহ্মণও দেখল, এতদিন কথকতা করে কিছুই মেলেনি, সুতরাং হাতে হাতে যখন দুশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে তখন তা ছাড়ি কেন? ব্রাহ্মণ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল আর বৈশ্য তখনই তাকে দুশো টাকা দিয়ে দিল।

এরপর বৈশ্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল, পাছে ব্রাহ্মণকে একলা পেয়ে গণেশ তার হাতে গোপনে টাকা তুলে দেয়। এদিকে ব্রাহ্মণের কথকতা শেষ হয়ে গেল, অথচ টাকার দেখা নেই। গণেশ যে টাকা দেবে ব্রাহ্মণ তার কিছুই জানে না, তাই সে বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হল। তাই দেখে বৈশ্য তাকে বলল, 'ঠাকুর মশাই, আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমার মনে হচ্ছে, আজ নিশ্চয়ই আপনার বরাতে কিছু জুটবে। দু'জনে মন্দিরে বসে আছে, বেলাও শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এখনও কোন টাকার দেখা মিলল না। তখন গণেশের ওপর বৈশ্যের খুব রাগ হল। সে

ভাবল, এতদিন জানতাম মানুষই শুধু মিথ্যা কথা বলে, এখন দেখছি দেবতারাও কোন অংশে কম নয়, নইলে টাকা দেবে বলে এভাবে কথার খেলাপ করে? বৈশ্য তখন আর রাগ সামলাতে পারল না। শিবমূর্তির পাশে গণেশের যে মূর্তি ছিল হঠাৎ তার পেটে সে লাথি মেরে বসল। যেই না মারা অমনি গণেশের পেটে বৈশ্যের পা আটকে গেল, অনেক টানাটানি করেও বৈশ্য তার পা ছাড়াতে পারল না।

এমন সময় শিব ও গণেশের কথাবার্তা আবার বৈশ্যের কানে এল। শিব গণেশকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গণেশ, তুমি ব্রাহ্মণকে পাঁচশো টাকা দিয়েছ তো? গণেশ বললেন, বৈশ্যের মারফত দুশো টাকা ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়েছে, বাকি তিনশো টাকার ব্যবস্থা করছি। বৈশ্য যতক্ষণ না আরও তিনশো টাকা ব্রাহ্মণকে দিচ্ছে ততক্ষণ আমার পেটে ওর পা আটকে থাকবে, তার আগে আমি ওকে ছাড়ব না।" বৈশ্য আর কী করে, সে তখন গণেশকে বলল, 'দোহাই গণেশ ঠাকুর, এবারকার মতো আমাকে মাপ করে দাও। আমি এখনই ব্রাহ্মণকে তিনশো টাকা দিচ্ছি, দয়া করে তুমি আমার পা ছেড়ে দাও।' বৈশ্য তখন তিনশো টাকা বের করে ব্রাহ্মণের হাতে দিল আর গণেশও বৈশ্যের আটকে যাওয়া পা ছেড়ে দিয়ে তাকে মুক্তি দিলেন। পাঁচশো টাকা হাতে পেয়ে ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে তার মেয়ের বিয়ের আয়োজন করতে লাগল।

এই গল্পের তাৎপর্য হল যে, দেবতা দেন কোথা থেকে? একজনেরটা নিয়ে, অন্যজনকে দেন, নিজের ঘর থেকে কাউকে কিছু দেন না। একজনকে ভাঙেন, আর একজনকে গড়েন। এইজন্য শিবকে বলা হয় ভাঙ-গড় বা ভাঙড়। আর একটা কথা। এই গল্পের আর একটি তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। তা হল – দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুরুষকার অবলম্বন করেছিল বলেই তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। ব্রাহ্মণ চেষ্টাপূর্বক মহাদেবকে কথকতা শুনিয়েছিল বলেই প্রয়োজনীয় টাকা পেয়ে গিয়েছিল। প্রারব্ধের দিক থেকে দেখতে গেলে বলা চলে যে ব্রাহ্মণের কপালে অর্থপ্রাপ্তি ছিল, ওই অর্থ বৈশ্যের কাছে গচ্ছিত ছিল। মহাদেব বৈশ্যের কাছ থেকে সেই অর্থ আদায় করে দিয়েছিলেন।

এই সময় ধ্যান কুঠীরের পাশের বৃক্ষ থেকে একটি পাখী মিষ্টিস্বরে ডাকতে লাগল। সকলের কানটি সেই দিকেই গেল। গুরুমহারাজ তখন পাখীকে উপলক্ষ্য করে একটি দোঁহা আবৃত্তি করলেন।

'কাগা কাক লেত্ হ্যায়
কোয়েল কাক দেত্

মিঠা বচন শুনায় কে –
জগ্ আপনা কর্ লেত।'

অর্থ ঃ কাক কারোর কিছু লয় না, কোকিল কাকেও কিছু দেয় না। কিন্তু কাকের কর্কশ কা-কা শব্দে সকল ব্যক্তি বিরক্ত হয়, আর কোকিলের মিঠা বুলি শুনে সকল ব্যক্তি তার প্রতি অনুরাগী হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা সরলা, সকলের সঙ্গে মিষ্ট কথা বলবে আর সকল লোকের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করবে – এটাই হল সঠিক পথ।

আমি ঃ মিষ্টি কথা বলা যেমন শ্রেয়, মিষ্টি ব্যবহারও শ্রেয়, কিন্তু এমন অনেক লোক আমি দেখেছি যে তাঁরা খুব মিষ্টি কথা বলেন, কিন্তু ব্যবহার তাঁদের অতিশয় নিকৃষ্ট।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ বাছা, এমন লোকও হয়ে থাকে, ওই লোক 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্' অর্থাৎ মুখে অমৃত কিন্তু মনটা বিষে ভরা – এই ভাব ভাল নয়। মিষ্টি কথা আর মিষ্টি ব্যবহারই সবচেয়ে ভাল। এমন লোক আছে যার কাজকর্ম বেশ ভাল, কিন্তু তার কথাবার্তা কর্কশ। এ সম্পর্কে একটি উদাহরণস্বরূপ গল্প আছে।

মিষ্টি কথার গল্প

এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'সবচেয়ে মিষ্টি কোন্ জিনিস?' মন্ত্রী বলল, 'হুজুর, সবচেয়ে মিষ্টি হল – মিষ্টি কথা।' রাজা তা মানতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'চিনি, গুড়, মধু রয়েছে, এছাড়া আরও কত রকম ভোজ্য জিনিস রয়েছে, এসব ছেড়ে মিষ্টি কথাই সবচেয়ে মিষ্টি হল?' রাজার কথার কোন উত্তর না দিয়ে মন্ত্রী চুপ করে রইলেন।

কিছুদিন পর মন্ত্রী একদিন রাজাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। নানারকম ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন করা হল। রাজাও পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার সমাধা করলেন। খাওয়া দাওয়ার পর রাজা যখন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে বেরুবেন এমন সময় মন্ত্রী হঠাৎ রাজাকে একটা বিশেষ কটু কথা বলে বসলেন। সেই কথা শোনামাত্র রাজার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মন্ত্রীর সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে তিনি প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা মন্ত্রী রাজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজা রেগে গিয়ে বললেন, 'তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, তোমার মন্ত্রীপদ আমি খারিজ করে দিলাম আর তোমাকে মন্ত্রীগিরি করতে হবে না।' মন্ত্রী বললেন, 'রাজামশাই,

আপনাকে এত ভালো জিনিস খাওয়ালাম আপনিও খেয়ে কত খুশি হলেন আর সামান্য কি একটা কথা বলেছি, তাতেই আপনার সব আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। আপনি এখন বিচার করুন মহারাজ, সেদিন যে আপনাকে বলেছিলাম যে মিষ্টি কথাই হল সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস, তা কি আমি মিথ্যে বলেছি?'

দেখো বাছা সরলা, এইজন্য আমার উপদেশ – মিষ্টি কথাও বলবে, আর মিষ্টি ব্যবহারও করবে। দুটোই হওয়া চাই তবেই ঠিক হবে। এই দুটো জিনিস যার মধ্যে আছে, তার নিজের কল্যাণ হয়ে থাকে আর তাতে জগতেরও বহু কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে।

আমি ঃ মহারাজ, শঙ্করাচার্য্যের 'মণিরত্নমালা'-র এক জায়গায় পড়ে বড় দুঃখ হল, তিনি নারীকে পিশাচিনী বললেন কেন? তিনি কি তাঁর পিতার গর্ভে জন্মেছিলেন? যদি মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে থাকেন সমগ্র মাতৃজাতিকে তিনি পিশাচিনী বললেন কিরূপে?

আশ্রমের বড় পণ্ডিতমশাই সেই স্থানে বসেছিলেন, তিনি বললেন, মা, বহুস্থানে দেখা যায়, নারী থেকেই বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই নারীকে পিশাচিনী বলে ভগবান শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন। সংসারে যত অনর্থ হয়েছে, তা সব নারী থেকে হয়েছে।

আমি ঃ না বাবা, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না। আমার যদি ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পাণ্ডিত্য থাকত তাহলে আমিও ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিতাম যে, সংসারে নর পিশাচের অভাব নেই। পুরাণের মধ্যে তার বহু প্রমাণ আছে। সতী অহল্যা দেবীর দুর্গতি, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণী জানকী মাতার দুর্গতি প্রভৃতি তার যথেষ্ট সাক্ষী দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না মা, তুমি দুঃখ কোরো না। ভগবান শঙ্করাচার্য মণিরত্নমালায় মেয়েদের পিশাচিনী বলেছেন, কিন্তু সকলের জন্য তিনি ওকথা বলেন নি। যে সকল সাধক নারী জাতিকে মাতৃরূপে দেখতে শেখেনি, তাদের মনে বৈরাগ্যের উদয়ের জন্যই তিনি নারীকে পিশাচিনী বলেছেন। নইলে সকল নারীকে পিশাচিনী বলা কখনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। নারী সম্বন্ধে দু ধরণের দুটি দোঁহা আছে, তা শোনো। একদল বলছে –

'নাগন সে নারী বুরী
তিন ঠোর সে খায়

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

ধন ঘটে, যৌবন হরে
মরে নরক লে যায়।'

অর্থাৎ নাগিনীর (সাপ) চেয়েও নারী অধম কারণ সাপ মাত্র এক জায়গায় কামড়ায়। কিন্তু নারী কামড়ায় তিন জায়গায়। নারী ধন নাশ করে, যৌবন নাশ করে আর মৃত্যু হলে নরকগামী করে দেয়। আর একদল প্রতিবাদ করে বলছে –

'নারী নিন্দা মাত্ কর্,
নারী নর কী খান্
নারী সে নর হোতা হ্যায়
ধ্রুব প্রহ্লাদ সমান।'

অর্থাৎ নারীর নিন্দা কোরো না কারণ, নারী নরের খনি, নারীর গর্ভেই ধ্রুব, প্রহ্লাদের মতো নরশ্রেষ্ঠগণের জন্ম হয়।

আমি ঃ হাঁ বাবা, একথা স্বীকার করছি, নারী জাতির কিছু অংশ পিশাচিনী হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সমগ্র নারী জাতিকে পিশাচিনী বললে আমি মেনে নিতে পারি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না মা, ভগবান শঙ্করাচার্য্য সকল নারীর উদ্দেশ্যে 'পিশাচিনী' শব্দটি বলেননি, আংশিক নারীর উদ্দেশ্যেই তা বলেছেন।

আমি ঃ বাবা, এবার আমার মনে শান্তি হল, আপনার পক্ষপাতশূন্য মধুর বাক্য শ্রবণ করে। মনে আমার যে দুঃখ হয়েছিল তা দূর হল। এই সময় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ চারু মাতাতে বললেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মা, তুমি তো লক্ষ্মী মা, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কত মানুষকে তুমি অন্নবস্ত্র দান করে তৃপ্তি লাভ করছ।

চারুমা ঃ বাবা, আমার সম্বন্ধে একথা বলবেন না, তাহলে আমার অভিমান হবে। আপনার চরণে আমার প্রার্থনা, আপনি আমার ঝুঁটি ধরে আমাকে আমার গন্তব্য পথে চালিত করুন। আমাকে শুভ কাজে, সৎ কাজে নিয়োজিত হবার প্রবৃত্তি দিন। বাবা, আমাকে সুমতি দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মা, তুমি তো আপনা থেকেই সুমতি সম্পন্ন। তোমাকে বেশি বলার তো কিছু নেই,

যাঁহা সুমতি তাঁহা সম্পত্তি নানা
যাঁহা কুমতি তাঁহা বিপত্তিনিদানা

দেখো মা, সুমতিই হলো সম্পত্তি অর্থাৎ সুখ – স্বাচ্ছন্দের হেতু। কুমতিই সকল প্রকার দুঃখ ও বিপদের নিদান। এটি হল ভগবানের চিরন্তন অলঙ্ঘ্য নিয়ম। তোমাদের সুমতি হোক, তোমাদের শুভ বাসনা জাগ্রত হোক – এটাই আমার আশীর্বাদ।

আমি ঃ বাবা, নির্বাসনা হতে না পারলে তো জীবের মোক্ষলাভ হবে না। তাহলে শুভ বাসনা জাগ্রত হোক – এরূপ আশীর্বাদ কেন করলেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, নির্বাসনা হওয়া উচ্চকোটী সাধকের পক্ষে সম্ভব। নিম্নকোটির সাধক তো নির্বাসনা হতে পারবে না। তাদের ক্ষেত্রে শুভ বাসনা জাগ্রত হওয়াই ঠিক, এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তমূলক গল্প আছে।

মাটী খাওয়ার দৃষ্টান্তর গল্প

একটি ছেলের এক বদ অভ্যাস ছিল যে, সে সব সময় মাটি খেত। গুরুজন পিতামাতা সবাই তাকে বার বার মাটি খেতে নিষেধ করত কিন্তু সে মাটির খাওয়া ছাড়তে পারল না। তখন সেই ছেলেকে এক মহাপুরুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে বলা হল, 'এই ছেলের মাটি খাওয়ার অভ্যাস ছাড়িয়ে দিন।' মহাপুরুষ তখন ছেলেটিকে বললেন, 'তুমি মাটি খাওয়ার অভ্যাসের মধ্যে পড়ে গিয়েছো। বেশ, তুমি মাটি খাও। তবে আজে বাজে মাটি না খেয়ে গঙ্গার মাটি খাও। তাতে তোমার মন পবিত্র হবে। বাজে মাটি খেলে তোমার রোগ হবে, গঙ্গামাটি খেলে রোগ হবে না। গঙ্গামাটি যদি সব সময় পাওয়া না যায়, তখন মাটি খাওয়ার অভ্যাস আপনা থেকেই কমে যাবে।'

দেখো বাছা, এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হল যে, সাধারণ মানুষের বাসনার স্ফুরণ হওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি তা ছাড়তে পারছে না। তখন কী করতে হবে? তাহলে গঙ্গামাটি খাওয়ানোর মতো মানুষের মধ্যে শুভ বাসনা জাগ্রত হলে তা সাধককে আপনা থেকে নির্বাসনা করে দেবে।

এদিনের এই সৎসঙ্গগুলি শুনে আমার ও চারুমাতার প্রভূত আনন্দ লাভ হয়েছিল।

তৃতীয় পর্ব

স্থান ঃ ধ্যানকুঠী, পৌষ পূর্ণিমা, ১৩৪২ সাল, সময় ঃ বিকাল

চারুমাতা, আমি

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[শোক, দুঃখ দূর করার উপায় হল মোহত্যাগ, এ সম্পর্কে মোহাচ্ছন্ন রাজার গল্প ঃ শোক করা উচিত নয়, এ সম্পর্কে গীতার একটি শ্লোক ঃ শোক দূর করতে হলে তত্ত্ব চিন্তা করতে হবে ঃ জ্ঞানীর শান্তি লাভ হয় বিচারের দ্বারা আর অজ্ঞানীর শান্তি লাভ হয় প্রারব্ধ বা ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে ঃ অজ্ঞানী ব্যক্তির শোক দুঃখ দূর করার অন্যতম উপায় হল তীর্থ ভ্রমণ, এ সম্পর্কে প্রিয় শিষ্য সাক্ষী গোপাল বড়ালের শোকার্ত পুত্রবধূর উদাহরণ ঃ পরমাত্মাদেব দয়াময় হয়েও কেন তিনি শোকাঘাত দেন – এ সম্পর্কে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ কথিত নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা ঃ সদ্‌গুরু প্রদত্ত উপদেশের বিভিন্নতার কারণ - এ সম্পর্কে 'গুরুদাতা বন্দি ছোড়ে-র গল্প ঃ শরীর ত্রিবিধ – স্থূল শরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর! সূক্ষ্ম শরীরের শ্রেষ্ঠত্ব, এ সম্পর্কে 'মালা দিজিয়ে'র গল্প ঃ পতিসেবা স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম এবং এ সম্পর্কে বক ভস্মের গল্প ঃ কারণ শরীর কি ঃ আত্মা কি ও আত্মার স্বরূপ ঃ আত্মাই আধার ও আধেয় ঃ পরমাত্মাদেব বা ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই মুক্তির পথ, এ সম্পর্কে গীতার ১৮/৬৬ শ্লোকের উল্লেখ ঃ রোচক বাক্য ও যথার্থ বাক্য ঃ ঐহিক স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি ও মুমুক্ষু ব্যক্তি ঃ গুরুর উপদেশ শুধু শুনলেই হবে না, তাঁর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, এ সম্পর্কে পুত্তলিকার গল্প ঃ 'গুপ্ত সো মুক্ত, প্রকট যো ভ্রষ্ট' ঃ এ সম্পর্কে আলোচনা ঃ মনকে ব্যাকুল করা ঠিক নয়, যা ঘটবার তা ঘটবেই ঃ ঈশ্বরই যোগ ও ক্ষেম বহন করেন ঃ কর রাখনা সে হো রহনা (আমার তুমি, তোমার আমি), এ সম্পর্কে বাঁদরছানা ও বিড়ালছানার উদাহরণ ঃ সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বর ঃ সকাম ভক্ত ও নিষ্কাম ভক্ত ঃ নিষ্কাম ভক্তের গল্প ঃ ভগবানকে সবাই চিনতে পারে না, এ সম্পর্কে গীতার ৭/৩ নং শ্লোকের উল্লেখ ঃ ভগবান নিজেকে কাদের কাছে ধরা দেন।]

পৌষ পূর্ণিমা, চারুমাতার গোপালের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের পুণ্যময় আশ্রমে আজ বহু ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে গেল। আমি ও চারুমাতা প্রসাদ গ্রহণ করে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে প্রণাম করবার জন্য ধ্যানকুঠীরে গেলাম। আমরা প্রণাম করা মাত্র গুরুদেব প্রশ্ন করলেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, আমি তোমাদের একটা প্রশ্ন করছি, প্রশ্নটা হল – অন্ধকার কী করে দূর হয়?

আমি ঃ বাবা, আমি প্রশ্নের উত্তর দেব এমন সামর্থ্য আমার নেই, তবে আপনার

শ্রীমুখে বহুবার শুনেছি, অন্ধকার দূর করতে হলে আলো আনতে হয়।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা, ভালো উত্তর তুমি দিয়েছ। অন্ধকার দূর করতে হলে আলো আনতে হবে। তা না হলে কোনভাবেই অন্ধকার দূর হবে না। তোমরা এখানে আসবার আগে এক শোকার্ত মায়ী আমার কাছে এসে বলল – বাবা, আমার খুব দুঃখ হয়েছে। তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম – মায়ী, তোমার কী দুঃখ হয়েছে। মায়ী উত্তরে আমাকে বলল – বাবা, আমার পুত্র মারা গেছে, পুত্রশোক আমাকে ছাড়ছে না। আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। আমি তখন তাকে বললাম 'মায়ী, পুত্র মারা গিয়ে ভালোই হয়েছে। তুমি শোক করো না, মোহ দূর করো। তাহলে শোক আপনা থেকেই চলে যাবে। তোমার মোহ হয়েছে – 'আমার পুত্র' এ কারণে শোক তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তুমি তোমার চিত্তে বৈরাগ্যকে নিয়ে এস, দেখবে – শোক, দুঃখ ইত্যাদি তোমার চিত্ত থেকে দূর হয়ে গেছে। মায়ী, তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক গল্প বলছি, গল্পটি শুনলে তোমার চিত্ত শান্ত হয়ে আসবে।'

মোহাচ্ছন্ন রাজার গল্প

এক রাজা ছিল। তার একটি মাত্র পুত্র ছিল। রাজা বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। তাই তিনি যুবক পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজকার্য থেকে অবসর নিলেন। পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা খুব আনন্দিত হলেন। এইভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন রাজপুত্রের অসুখ করল। রাজপুত্রের অসুখ, তাই চিকিৎসার কোন ত্রুটি হল না। দেশের বড়ো বড়ো বৈদ্যরা এসে রাজপুত্রের চিকিৎসা করতে লাগলেন, কিন্তু রোগের কোন প্রতিকার হল না। রাজপুত্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। পুত্রের এই অবস্থা দেখে রাজা ঘোষণা করলেন, যে রাজপুত্রকে ভালো করে দিতে পারবে তাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করবেন। সেই ঘোষণা শুনে দেশ বিদেশ থেকে দলে দলে বৈদ্যরা আসতে লাগল, কিন্তু কেউই রাজপুত্রকে ভালো করতে পারল না।

রাজার এক সিদ্ধপুরুষ গুরু ছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে জানতে পারলেন, রাজপুত্রের বাঁচবার কোন আশাই নেই, তার মৃত্যু কেউ রোধ করতে পারবে না। এদিকে রাজগুরু দেখলেন, পুত্রের প্রতি রাজার যে রকম মোহ, তাতে পুত্রের মৃত্যু হলে রাজা সেই শোক সহ্য করতে পারবেন না। পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনিও দেহত্যাগ করবেন। কোন্ উপায়ে রাজার এই মোহ দূর করা যায়, কীভাবে রাজার প্রাণরক্ষা করা যায়, রাজগুরুর মনে তখন এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল। অনেক ভাবনাচিন্তার পর একদিন তিনি এক বৈদ্যের বেশ ধারণ করে রাজার কাছে এসে

বললেন, 'আমি আপনার পুত্রকে ভালো করে দিতে পারি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে দেখুন, আপনি তা পূরণ করতে পারবেন কিনা।' রাজা বললেন, 'বলুন, আপনার কী শর্ত, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব।' বৈদ্যরূপী গুরু তখন রাজাকে বললেন, 'কোন সুখী লোকের কাছ থেকে আপনি আমাকে একটা পয়সা এনে দিন, তাহলে আমি আপনার ছেলেকে ওষুধ দেব, তাতেই সে ভালো হয়ে উঠবে।'

রাজা তখন সুখী লোকের সন্ধানে বের হলেন। প্রথমেই তিনি এক জমিদারের কাছে গিয়ে পুত্রের অসুখের কথা আর বৈদ্য কী বলেছে তা জানিয়ে বললেন, 'তোমাকে আমি সুখী মানুষ বলেই জানি, তুমি আমাকে একটা পয়সা দাও, তাহলে আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করবে।' রাজার কথা শুনে জমিদার তখন বললেন, 'মহারাজ, আপনি আমাকে সুখী বলছেন! যদি ভিতরের কথা জানতেন তাহলে বুঝতেন আমার মতো দুঃখী মানুষ খুব কমই আছে। আমার স্ত্রীর মতো এমন মুখরা আর ঝগড়াটে মেয়েমানুষ আর নেই। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খালি আমার সঙ্গে বচসা আর ঝগড়া করে থাকে। তাই আমার মতো দুঃখী আর কে আছে বলুন।'

রাজা এবার গেলেন এক শেঠের কাছে। শেঠজী সব শুনে বললেন, 'মহারাজ, আপনি জানেন না কী দুশ্চিন্তায় আমার দিন কাটে। সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জমা খরচের হিসেব নিয়ে বসতে হয়, কিসে দুপয়সা আসবে, কেমন করে তা বজায় থাকবে, খরচপত্তর কীভাবে করতে হবে – এসব চিন্তাতেই আমি খুব দুঃখে থাকি। সুখ কী জিনিস তা আমার জানা নেই।

রাজা এবার মন্ত্রীর কাছে গিয়ে সব কথা শুনিয়ে বললেন, 'মন্ত্রী, তুমি খুব সুখে আছ, আমাকে একটা পয়সা দাও।' মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আমি খুব দুঃখে আছি। আমার পাঁচটি পুত্রই গোল্লায় গেছে। কেউ মাতাল, কেউ ব্যাভিচারী ইত্যাদি। এদের জন্য আমি খুবই দুঃখে আছি।'

এইভাবে রাজা সারা রাজ্য ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু এমন কাউকে পেলেন না যাকে সুখী বলা যায়। রাজা তখন বৈদ্যের কাছে এসে তাকে জানালেন যে সারা রাজ্যে তিনি কোনো সুখী লোক খুঁজে পেলে না। বৈদ্য তখন রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, সারা রাজ্য ঘুরে তো দেখলেন প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করছে, সব দিক দিয়ে সুখী তো কেউ নেই, তাহলে আপনিই বা কেন নিজের জন্য পরিপূর্ণ সুখ আশা করেন? পুত্রের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না। তার এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, এবার তাকে চলে যেতে হবে। আপনি কি তাকে ধরে

রাখতে পারবেন? যা হবার তা হবেই, তা কেউ রোধ করতে পারবে না। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখনই স্থির হয়ে যায় তার মৃত্যু কবে হবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।'

বৈদ্যের বেশে রাজগুরুর এইসব উপদেশ শুনে রাজার মনে তত্ত্বচিন্তার উদয় হল। তিনি বিচারে মগ্ন হলেন। তত্ত্বচিন্তার ফলে তাঁর হৃদয় জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং 'আমার ছেলে' এই অভিমান থেকে মুক্ত হলেন। গুরু যখন দেখলেন যে তাঁর মোহগ্রস্ত শিষ্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোক মোহ কাটিয়ে আবার রাজকার্যে মনোনিবেশ করেছেন, তখন তিনি আপন আশ্রমে ফিরে গেলেন।

দেখো বাছা সরলা, এই দৃষ্টান্ত শুনে ওই পুত্রশোকাতুরা মায়ের খুবই শান্তি লাভ হয়েছিল। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলেছেন –

'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।' গীতা ২/২৭ শ্লোক

অনুবাদ ঃ যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত এবং স্বীয় কর্মানুসারে মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা উচিত নয়।

দেখো বাছা সরলা, আমার প্রশ্ন ছিল যে, অন্ধকার কী করে নিবৃত্তি হবে। তুমি উত্তরে বললে যে, আলো আনলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। যেমন আলো নিয়ে এলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনি শোক, মোহ দূর করতে হলে তত্ত্ব চিন্তা করতে হবে। আলো না আনলে যেমন অন্ধকার দূর হয় না, তেমনি তত্ত্বচিন্তা ছাড়া শোক দূর হয় না। তত্ত্ব চিন্তা করলে হৃদয়-আকাশ মেঘমুক্ত হবে, জ্ঞান সূর্যের উদয় হবে, শোক মোহরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যাবে, শান্তি লাভ হবে। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর দু'ভাবে শান্তি লাভ হয়। জ্ঞানী বা বিচারবান ব্যক্তির ভাব এরকম হয়ে থাকে যে ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর কাজে কোন অমঙ্গল হয় না। আর অজ্ঞানীর এই ভাব হয় যে সবই প্রারব্ধ বা ভাগ্য। যা ভাগ্যে আছে, তাই হয়েছে, ব্যাকুল হয়ে কী করবে। এই দু প্রকার ভাবে দু-প্রকার ব্যক্তির শান্তি লাভ হয়ে থাকে। অজ্ঞানী ব্যক্তির আর এক প্রকারে শান্তি লাভ হয়ে থাকে। শোক হয়েছে, মনকে ভুলিয়ে দাও। যেমন কেউ কোনো তীর্থে চলে যায়, কেউ ভাগবৎ কথা শ্রবণ করতে লেগে যায়, এতে মন আনমনা হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আমার একটা দৃষ্টান্তের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমার প্রিয় শিষ্য সাক্ষী গোপাল বড়াল। তার মেজো ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পুত্রবধূ পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল। বিয়ের কিছুদিন পর মেজো ছেলে

মারা গেল। সাক্ষী গোপালের স্ত্রী আর পুত্রবধূ শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল। ওদের দুজনের এমন অবস্থা হল যে অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করল, বাঁচার মতো অবস্থা রইল না। সাক্ষীগোপাল পরম ভক্ত ছিল। সে তো নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে মনকে শান্ত করে শান্তি লাভ করল, কিন্তু তার স্ত্রী ও পুত্রবধূকে শান্ত করতে কোনো উপায়ে বোঝানো গেল না। তখন ওদের শান্তির জন্য তীর্থ পর্যটনে নিয়ে যাওয়া হল। তীর্থের পর তীর্থ পর্যটন করতে করতে তারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে আর দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে একেবারে আনমনা হয়ে গেল। বহু তীর্থ ঘুরে সাক্ষীগোপাল দিল্লীতে এসে পৌঁছল। পৌঁছে মনে করল, যাই দিল্লির দরবার দেখে আসি। সকলে মিলে দিল্লির দরবারে এসে এখানকার হো হো শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। কোথায় গেল পুত্রশোকে কাতরা মাতৃহৃদয় আর পত্নীর হৃদয়। অজ্ঞানীকে ভুলিয়ে দেবার ভাল জায়গা হল দিল্লির দরবার।

আমি ঃ বাবা, পরমাত্মাদেব দয়াময়, আমরা তাঁর পুত্র কন্যা। আমাদের ব্যথা দেবার জন্য তিনি এমন পুত্র শোকের সৃষ্টি কেন করেছেন? শোকাঘাত তিনি আমাদের কেন দেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা, বেশ প্রশ্ন করেছ। এর উত্তর তোমাকে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেবো। আমার মন্ত্রশিষ্য হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে একবার নিয়ে গেল, বৈদ্যবাটীতে তার বাড়িতে। তার বাড়িটা ছিল একেবারে গঙ্গার ধারে। সেদিন ছাদের উপর ঠাকুর ঘরে আমি বসে আছি, আমার দৃষ্টি গঙ্গার দিকে। এমন সময় দেখলাম এক পল্লীরমণী গঙ্গাজল নেবার জন্য ঘাটে এসেছে। তার কাঁকালে প্রকাণ্ড এক ঘড়া আর তার হাত ধরে সঙ্গে এসেছে চার-পাঁচ বছরের তার একটি ছেলে। জল ভরা হলে ছেলে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরবে, মা তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু ছেলেটি মায়ের হাত ধরবে না। সে কান্না শুরু করে দিল মায়ের কোলে চড়ে যাবে, কিছুতেই সে হেঁটে যাবে না। মা তাকে বোঝাতে লাগল, আমাকে ঘড়া ভর্ত্তি জল নিয়ে যেতে হচ্ছে, তোমাকে এখন কোলে নেব কী করে? কিন্তু তাতেও ছেলের কান্না থামে না, সে বার বার জেদ করতে লাগল মায়ের কোলে সে উঠবেই।

মা আর কী করে, এক পাশে ঘড়া নিয়ে আর এক পাশে ছেলেকে কোলে নিতে গেল। কিন্তু এমন পাজী ছেলে যে তবুও সে মায়ের কোলে উঠবে না। ছেলেটি বায়না ধরল, ঘড়া ফেলে দিয়ে শুধু তাকেই কোলে নিতে হবে। মা অনেক করে বোঝালো, কিন্তু ভবী ভুলবার নয়, কিছুতেই সে কথা শুনবে না, মাকে সে অস্থির

করে তুলল। শেষে ছেলেটি যখন দেখল মা তার কথায় কান না দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন সে কাদার মধ্যে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। মা তখন রেগে গিয়ে ছেলেকে আরও বেশি কাদার মধ্যে ঠেলে দিল, তারপর বেশ কয়েক ঘা চড়-চাপড় মেরে ঘড়া নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল। ছেলেটি তখন সেই কাদার মধ্যে হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে কাঁদছে। কিন্তু মা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তখন সে বেচারা আর কী করে, সেই কাদা মাখা গায়েই কাঁদতে কাঁদতে সে মায়ের পিছন পিছন ছুটতে লাগল। মা তখন ছেলের সমস্ত কাদা ময়লা ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে তাকে কোলে তুলে নিল।

দেখো বাছা, সরলা, এই যে দৃশ্য দেখলাম এতে সৎসঙ্গের কী সুন্দর এক দৃষ্টান্ত মিলে গেল। পরমাত্মা আমাদের মা, আমরা তাঁর দুষ্টু ছেলে। মা এক হাতে তাঁর বিশ্বকাজে ব্যাপৃত থেকে আর এক হাতে আমাদের কোলে তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েই রয়েছেন, তবু আমরা বিষয়রূপ কাদা গায়ে মেখে তার মধ্যেই শুয়ে আছি। মা আর কী করেন, তিনি আরও বেশি করে সেই কাদার মধ্যেই আমাদের ডুবিয়ে দেন আর সেইসঙ্গে রোগ শোক, দুঃখ এইসব চড়চাপড় মারতে থাকেন। দুষ্টু ছেলে জব্দ হয়ে তখন আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের শরণ নেয়। মা-ও তখন বিষয়রূপ সেই কাদা জ্ঞান-ভক্তিরূপ গঙ্গাজলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছেলেকে কোলে তুলে নেন। দেখো বাছা, এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে তো?

আমি ঃ হ্যাঁ মহারাজ, এখন আমি বুঝলাম যে আমরা সহজে প্রকৃত রাস্তায় যাই না, পরমাত্মারূপী মাতা তাঁর (ঘড়ায় জল ভরার ন্যায়) বিশ্বের কাজ এক হাতে করে আর এক হাতে আমাদের কোলে নিতে চাইছেন, কিন্তু আমরা দুষ্টু ছেলে-মেয়েরা বিষয়রূপী কাদায় আছাড় পাছাড় খেতে থাকি। তাই পরমাত্মারূপী মাতা বিষয়ের দোষ দেখিয়ে দেবার জন্য আমাদের পিঠে রোগ শোকরূপ চড় চাপড় মেরে থাকেন। তারই ফলস্বরূপ তিনি আমাদের বিষয়মুখী চিত্তকে অন্তরমুখী করে দেন, তখন আমরা পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হই। হে ধর্মপিতা, হে গুরুদেব, একদিন আমাদের সকল কাদামাটি ধুয়ে দিয়ে তিনি তাঁর অমৃতময় কোলে আমাদের তুলে নেবেন তো?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ অবশ্যই কোলে নেবেন, তবে মায়ের পিছু পিছু কাঁদতে হবে। না কাঁদলে মা অতি শিশুপুত্রকেও মাতৃ দুগ্ধ পান করায় না। মা বলে – এখন তো বাচ্চা চুপচাপ আছে, কেন ওকে ঘুম থেকে তুলব? ওকে ঘুমতে দাও। ও যখন ঘুম থেকে জেগে দুধ খাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকবে তখন ওকে দুধ পান করাবো।

আমি ঃ বাবা, আপনি আমার এমন উপদেশও তো কত সময় দিয়েছেন যে, পরমাত্মাদেবের কাছে কিছু চাইবার দরকার হয় না, আমাদের যা প্রয়োজন তা তিনি নিজে জেনেই আগে থেকেই তার ব্যবস্থা করে দেন, যেমন আমরা জন্মাবার পূর্বেই মায়ের বুকে দুধ দিয়ে থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, বাছা, এটাও একটা মত, আর ওটাও একটা মত। দুটি মতই সঠিক। শাস্ত্রকার নানা প্রকার মত দিয়ে গিয়েছেন, এর কারণ কী? এর কারণ হল – রকম রকম মানুষের রকম রকম ভাব হয়ে থাকে। সকল মানুষের তো আর একই মিষ্টিভাব ভাল লাগে না। কেউ তেতো খাবার পছন্দ করে, কেউ ঝাল খাবার পছন্দ করে, কেউ আবার মিষ্টি খাবার ভালোবাসে। এই কারণে শাস্ত্রকারগণ অনেক অনেক পথের সন্ধান দিয়েছেন। যে যেরকম অধিকারী তাকে তেমনি উপদেশ দিয়েছেন। সিংগী (আমার পিতা শরৎচন্দ্র সিংহ মশাই) একদিন আমাকে এই প্রশ্ন করল – মহারাজ, আমি এখানে আপনার কাছে উপদেশ নিতে আসি। এখানে যারা আপনার কাছে আসে তাদের সকলের জানার ইচ্ছা এই যে, কী উপায়ে মুক্তির পথ মিলে যাবে। এ বিষয়ে আপনি এক এক জনকে এক এক রকম মুক্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে থাকেন, সকলকে একই রকম উপদেশ দেন না, এর কারণ কী? আমি বললাম ভাই সিংগী, আমি তোমাকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্তমূলক একটি গল্প শোনাচ্ছি। তাতে তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে।

গুরু দাতা বন্দি ছোড় গল্প

এক সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর কয়েকজন শিষ্য ছিল। শিষ্যদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল যে, কারুর কাছে তারা কিছু চাইতে পারবে না, গৃহস্থের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তারা শুধু বলবে 'গুরু দাতা বন্দি ছোড়' অর্থাৎ গুরু দাতা বন্ধননাশী। এই ডাক শুনে কেউ যদি কিছু ভিক্ষে দেয়, তাতেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এইভাবে ভিক্ষান্নের দ্বারা গুরু ও তাঁর শিষ্যদের আহারের সংস্থান হয়ে যায়।

শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিল পরম গুরুভক্ত। এই গুরুগত প্রাণ শিষ্যটি প্রাণমন দিয়ে গুরুর সেবা করে, পুজো করে, নিজহাতে আহার্য প্রস্তুত করে সর্বদা গুরুর কাছে থাকে যাতে গুরুর কোনো অসুবিধা না হয়। গুরুদেবকে দর্শন করতে ও তাঁর উপদেশ শুনতে প্রতিদিন বহু ভক্ত আসত তাঁর কাছে। এই শিষ্যটি লক্ষ্য করল যে তার গুরুদেব সকলকে একরকম উপদেশ দেন না, বিভিন্ন ধরণের উপদেশ দেন। এই দেখে তার মনে খটকা লাগল। সে ভাবল এর কারণ কী? গুরু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ।

শিষ্যের মনের ভাব বুঝতে পেরে তিনি তাকে বললেন, 'বৎস, তোমার মনে যে সংশয় দেখা দিয়েছে, সে সংশয় ভগবান একদিন মিটিয়ে দেবেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

একদিন গুরুদেব শিষ্যদের বললেন, 'দেখো তোমরা কোনো গরীব গৃহস্থের বাড়ি ভিক্ষে করতে যেয়ো না, ভিক্ষে দিতে তাদের কষ্ট হয়। ধনী লোকেদের ঘর থেকে তোমরা ভিক্ষে নেবে।' গুরুর কথামতো শিষ্যরা এক জমিদার বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে বলতে লাগল 'গুরু দাতা বন্ধননাশী।' দরজার পাশে খাঁচাতে একটা ময়না ছিল। শিষ্যদের হাঁকডাক শুনে সে তাদের বলল, 'তোমাদের গুরু হলেন দাতা। তোমরা বলছ তিনি বন্ধননাশ করেন। তাঁকে তোমরা একবার জিজ্ঞাসা কোরো আমার এ বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পাব কেমন করে?' শিষ্যরা বলল, 'একথা আর গুরুদেবকে কী জিজ্ঞাসা করব, আমরাই বলে দিচ্ছি। ময়না, তুমি রাম রাম বলো।'

শিষ্যরা চলে গেল আর ময়নাও সেই থেকে রাম নাম বলা শুরু করে দিল, তাই শুনে জমিদারের আনন্দ আর ধরে না। সবাইকে ডেকে তিনি দেখাতে লাগলেন, ময়না কেমন ভগবানের নাম করছে। জমিদার তখন চাকরদের হুকুম দিলেন, 'ময়নাকে আর কাঠের খাঁচায় রাখিসনে, ওকে লোহার খাঁচায় রাখ আর ওর এক পায়ে শিকল রয়েছে, এখন দুপায়েই শিকল পরিয়ে দে।' ময়না দেখল এ তো ভালো বিপদ হল, রাম নাম নিয়ে আমার বাঁধন যে দ্বিগুণ হয়ে গেল, শিষ্যেরা আবার জমিদার বাড়িতে ভিক্ষে করতে এলে ময়না তাদের বলল, 'তোমাদের উপদেশ শুনে আমার কী দুর্দশা হয়েছে দেখো, ছিল এক পায়ে শিকল, রামনাম বলায় এরা আমার দুপায়েই শিকল পরিয়ে দিয়েছে। তোমাদের দিয়ে আমার কোনো উপকার হবে না। তোমাদের গুরু সিদ্ধপুরুষ। তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো – ময়নার বন্ধন কিসে ঘুচবে।'

শিষ্যেরা ফিরে এসে গুরুদেবকে বলল, 'মহারাজ, এক ময়না তার বন্ধন দশা কেমন করে ঘুচবে সেই উপদেশ আপনার কাছে জানতে চায়।' শিষ্যদের কথা শোনামাত্র গুরু অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তাঁর হাত পা অসাড় হয়ে গেল, মাথা এক পাশে হেলে পড়ল, দেহে জীবনের চিহ্নমাত্রও রইল না। অনেক শুশ্রুষার পর গুরুদেব সুস্থ হলেন, শিষ্যরা তাঁকে আর ময়নার কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

আবার একদিন শিষ্যরা এসেছে জমিদারের বাড়িতে। তাদের দেখে ময়না জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি আমার কথা গুরুদেবকে বলেছিলে? শিষ্যরা বলল, 'না, ময়না,

তোর কথা আর কখনো গুরুদেবের কাছে তুলব না। সেদিন তোর কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, মনে হল তাঁর প্রাণও বুঝি বেরিয়ে গেল।' এই কথা শুনে ময়না পাখা ঝাপটাতে লাগল, তার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল আর সে মড়ার মতো পড়ে রইল খাঁচার মধ্যে। তাই দেখে চাকররা হইহই করে ছুটে এল, খবর পেয়ে জমিদারবাবুও হন্তদন্ত হয়ে এসে দেখলেন, ময়নার নিথর দেহ খাঁচার মধ্যে পড়ে রয়েছে। অমনি খাঁচা থেকে ময়নাকে বের করে আনা হল, তার পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হল, সকলেই ধরে নিল যে, ময়না মারা গেছে। ময়নার জন্য সবাই যখন দুঃখ করছে, এমন সময় সুযোগ বুঝে ময়না হঠাৎ উঠে দু পাখা মেলে উড়ে পালাল।

এতক্ষণে শিষ্যদের খেয়াল হল কেন ময়নার কথা শুনে গুরুদেব অমন অজ্ঞান হওয়ার ভান করেছিলেন। তারা বুঝতে পারল যে এইভাবে ইঙ্গিত করে তিনি ময়নাকে তাঁর উপদেশ জানিয়ে দিয়েছেন। শিষ্যদের দিয়ে গুরু যদি মুখে তাঁর উপদেশ বলে পাঠাতেন তাহলে জমিদারের চাকররা হয়তো তা শুনে ফেলত। সেই জন্যই তিনি ময়নাকে মড়ার ভান করে পড়ে থাকাবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ইঙ্গিত শিষ্যরা বুঝতে পারেনি, শিষ্যদের মুখে গুরুর অবস্থা শুনে চাকররাও কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু যাকে উদ্দেশ্য করে উপদেশ দেওয়া, সেই ময়না ঠিক তা বুঝে নিয়েছে।

গুরুগতপ্রাণ যে শিষ্যটির মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল যে গুরুদেব সকলকে কেন একরকম উপদেশ দেন না, তারও সেই সংশয় এখন দূর হয়ে গেল। এতদিনে সে বুঝতে পারল যে, মানুষের পক্ষে রামনাম যে মুক্তির উপায় তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ময়না চাইছে খাঁচার বাঁধন থেকে মুক্তিলাভ করতে। রামনামে সেই বন্ধন দূর হয় না। তাতে বরং বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। কাজেই সকলের পক্ষে একই নিয়ম কখনো খাটে না। মানুষের পক্ষে যা মুক্তিপ্রদ, ময়নার পক্ষে সেটাই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অধিকারী অনুযায়ী সদ্‌গুরু উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাই সকলের ক্ষেত্রে একই উপদেশ প্রযোজ্য নয়।

দেখো বাছা সরলা, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুনে তোমার পিতার সংশয় নাশ হয়েছিল, তোমারও সংশয় আশা করি দূর হয়ে যাবে। দেখো বাছা তোমাদের চারপুরুষকে আমি দেখেছি। তোমার পিতার শরৎচন্দ্র সিংহ, তার পুত্র পূর্ণচন্দ্র সিংহ, তার পুত্র সতীনাথ সিংহ, তার পুত্র মহেশ্বর চন্দ্র সিংহ। এখন আমি তো তোমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি হয়ে গেছি। তোমাদের চারপুরুষ আমার সামনেই হয়েছে। আমার সমসাময়িক

ব্যক্তি আর দেখা যায় না। আমারও তো এখন চলে যাবার সময় হয়েছে, এখন চলে যাবো।

চারুমাতা ঃ বাবা, ও কথা বলবেন না, আপনার পাদস্পর্শে ধরিত্রী পবিত্র হয়েছে। কত তাপিত মানুষ শোকাতুর হয়ে আপনার অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে শান্তি লাভ করছে, কত ক্ষুধাতুর ব্যক্তি অন্ন পাচ্ছে, কত বস্ত্রহীন মানুষ বস্ত্র পাচ্ছে, কত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি ওষুধ পাচ্ছে, মুর্খ ব্যক্তি বিদ্যালাভ করে বিদ্বান হয়ে যাচ্ছে কত অজ্ঞানী জীব আপনার দয়ায় মহান জ্ঞান লাভ করছে। আপনি চলে যাবার কথা বলছেন? আপনি চলে গেলে আপনার প্রিয় জীবের কে কল্যাণ সাধন করবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ লক্ষ্মী মায়ী, এখানে তো স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তি থাকতে পারে না। ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি কত কত অবতার আর্বিভূত হয়েছেন, কিন্তু এই সব অবতার তিরোধান করেছেন। চিরদিনের জন্য কেউ এখানে আসে না। আমি কী করে থাকব? আমাকেও চলে যেতে হবে। এই শরীর তো এখন পাকা ফলে পরিণত হয়েছে, খুব শীঘ্র পড়ে যাবে।

চারুমাতা ঃ বাবা, আপনি ধর্ম পিতা, আপনি চলে গেলে আমরা ধর্ম জীবনে কাঙ্গাল হয়ে যাবো। আমাদের কী গতি হবে! আপনি আমাদের ধর্মপথে আলো দেখাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মায়ী, স্থূল বস্তু মাত্রই নাশ হয়ে যায়, তা সংযোগ বিয়োগরূপ হর্ষ শোকের অধীন। সূক্ষ্মের মধ্যে সংযোগ বিয়োগের হর্ষ শোক কিছুই থাকে না। সূক্ষ্মের মধ্যে কিছু অভাব নেই। সূক্ষ্ম বস্তুতে মনকে ডুবিয়ে রাখলে আর অভাব বোধ কিছু থাকবে না।

আমি ঃ বাবা, স্থুল সূক্ষ্ম কাকে বলে তা বিস্তারিত ভাবে শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, তুমি তো খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। এসম্পর্কে আমি আর কী বলব? শাস্ত্রকারগণ বহু বহু শাস্ত্রে এ বিষয়ে বর্ণনা করে গেছেন। আমি তো এখন তাঁদের আলোচনার চর্বিত চর্বণ করছি।

আমি ঃ বাবা, চর্বিতচর্বণ যত হবে ততই আলোচ্য ধর্ম বিষয়ের ধারণা আমাদের দৃঢ় হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হাঁ বাছা, এ কথা ঠিক। ধর্ম আলোচনায় সময় দেওয়াই ঠিক। পরনিন্দা পরের সম্বন্ধে আলোচনা কোরো না। দেখো বাছা, তুমি তো উত্তম অধিকারী, তোমাকে বেশী কথা বলতে হবে না। আমি যা বলব, তা তুমি বুঝতে পারবে। শরীর

ত্রিবিধ যথা– স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম– এই পঞ্চভূতের একত্রে সংযোগের ফলস্বরূপ এই স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়েছে। স্থূল শরীরের ক্রিয়া হয়ে থাকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক। কর্মেন্দ্রিয় যথা– বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। এইসব নিয়ে স্থূল শরীর অবস্থান করে। এই সব ইন্দ্রিয়গুলির সম্ভোগ করার বিষয় হচ্ছে – শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ বিষয়ের সংযোগ-বিয়োগে মানুষের সুখ দুঃখ হয়ে থাকে। বিষয়ীভূত এই স্থূল শরীর নিকৃষ্ট। মানুষের যত অভাব সবই এই স্থূল শরীরে। স্থূল শরীরের থেকে সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার – এই সব বস্তু নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর রচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম শরীর যে শ্রেষ্ঠ তা তোমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে হল যে, আমি পদ্মফুল দিয়ে ইষ্টদেবের পুজো করব, কিন্তু এখন পদ্মফুল তুমি কোথায় পাবে। স্থূলভাবে তোমার এখন পদ্মফুল পাবার কোন উপায় নেই। পদ্মফুলের এই অভাব সূক্ষ্ম শরীরে-পূরণ হয়ে যাবে। কীভাবে পূরণ হবে? যেমন, তুমি চোখ বন্ধ করে মনে মনে স্মরণ কর যে, তুমি এক মনোহর পুষ্করিণীতে দেখলে সেখানে সুন্দর সুন্দর পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। তুমি সেই পদ্মফুল তুলে এনে ওই পদ্মফুল দিয়ে তুমি তোমার ইষ্টদেবের চরণে পুজো করছো। তাহলে দেখো, সূক্ষ্ম শরীরে তোমার পদ্মফুলের অভাব দূর হয়ে গেল।

আমি ঃ বাবা, স্থূলভাবে পদ্মফুল সংগ্রহ করে ইষ্টপুজো করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ মনে মনে পদ্মফুল দিয়ে ইষ্টপুজো করে কি ঠিক সে রকম আনন্দ পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাচ্চা, স্থূলের চেয়ে সূক্ষ্ম পুজোয় অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

আমি ঃ তবে কি আমরা স্থূলভাবে পুজো বিধি ছেড়ে দেব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, যদি স্থূলভাবে বস্তু পাওয়া যায়, তাহলে স্থূলপুজো করবে। যদি পুজোর জন্য স্থূলবস্তু না পাওয়া যায় তাহলে সূক্ষ্মভাবেই পুজো করবে। স্থূল সূক্ষ্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কখনো কখনো স্থূলভাব সূক্ষ্মতে পৌঁছে যায়, আবার কখনো কখনো সূক্ষ্মভাব স্থূলে পৌঁছে যায়। দেখো, এ সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সূক্ষ্মভাবে তুমি তেঁতুল খাচ্ছ এটি স্মরণ কর, দেখবে তোমার জিবে জল এসে গেছে। কেন এমন হল? তুমি তো স্থূলভাবে তেঁতুল খাও নি। সূক্ষ্মভাবে অর্থাৎ

মনে মনে তেঁতুল খাওয়া স্মরণ করেছ, কিন্তু তোমার স্থূল শরীরে তেঁতুল খাওয়ার ভাব এসে গেল। তোমার জিবে জল এল। সূক্ষ্ম শরীরের ভাব স্থূল শরীরে ক্রিয়া করতে লাগল। সেইরকম স্থূলের কার্যও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনের উপর ক্রিয়া করে, তখন স্থূল শরীরের থেকে সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ। যা কিছু অভাব স্থূলভাবে হয়, সূক্ষ্মতে কোন কিছুর অভাব থাকে না। দেখো বাছা, তুমি তো এখন কলকাতা যাবে, তুমি আমাকে এখানে কি ছেড়ে চলে যাবে?

আমি ঃ বাবা, আমরা স্থূলভাবে আপনার চরণ ছেড়ে দূরে চলে গেলেও সূক্ষ্মভাবে আমাদের মাথার উপর সহস্রদল কমলে আপনার শ্রীচরণ কমল বসিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এখন তুমি বুঝতে পেরেছ, স্থূলের অভাব সূক্ষ্ম দিয়ে পূরণ হয়ে যায়। দেখো, মানসিক বল কত কাজ দেয় – এর এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

'মালা দিজিয়ে'-এর গল্প ঃ

ধর্মপ্রাণ এক সাধু মহাত্মার দুজন শিষ্য ছিল। সাধুমহাত্মার সর্বদা শাস্ত্র আলোচনা আর নারায়ণ দেবতার বিগ্রহের সেবা পুজোয় দিন কেটে যায়। শিষ্য দুটিও গুরুগতপ্রাণ। একমাত্র গুরুসেবা ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। গুরুই তাদের ধ্যান জ্ঞান, গুরুসেবায় তারা সিদ্ধিলাভ করেছিল।

এক বৈশাখ মাসের প্রভাতে একজন শিষ্য গুরুদেবকে প্রণাম করে বলল, 'মহারাজ, আজ আমাকে বহু দূরদেশে যেতে হবে, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।' একথা বলতে বলতে শিষ্যের চোখে জল এসে গেল। ভক্তবৎসল গুরুর চোখেও জল এসে গেল। গুরু তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস, যেখানে যাচ্ছ, কাজ হয়ে গেলেই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, বিলম্ব কোরো না।'

দূরের দেশ। জাহাজে করে শিষ্য চলছে সেই দেশে। সারাদিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় চারদিক আকাশে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল কালবৈশাখীর তাণ্ডব। তুমুল ঝড় উঠল। প্রবল বৃষ্টিপাতে চারদিক ঝাপসা হয়ে গেল। জাহাজ বোধহয় আর রক্ষা পাবে না। বিপন্ন যাত্রীরা যখন আর্তকণ্ঠে হাহাকার করছে, শিষ্য তখন একান্তে বসে গুরুদেবের পাদপদ্মের ধ্যানে বিভোর। চোখ তার মুদ্রিত, মুখে শুধু 'গুরু গুরু' নাম।

এদিকে গুরুদেব ঠিক সেই সময়ে নিজের আশ্রমে নারায়ণের সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করছেন। ফুলের মালা ঠাকুরের গলায় পরাবেন বলে হাতে তুলে নিয়েছেন,

কিন্তু মালা তিনি পরাতে পারলেন না। হাতের মালা হাতে নিয়েই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দেহ নিঃস্পন্দ, শ্বাস রুদ্ধ, সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ অবলুপ্ত, মালা হাতে নিয়ে গুরুদেব কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর যে শিষ্যটি কাছে ছিল, সে বলে উঠল, 'গুরুদেব, আর কোনো চিন্তা নেই, ঝড় থেমে গিয়েছে। এবার আপনি ঠাকুরের গলায় মালা পরিয়ে দিন।'

শিষ্যের কথা শুনে গুরুদেব চমকে উঠলেন, ভাবলেন, এই শিষ্য কেমন করে ঝড়ের কথা জানতে পারলো? তিনি তখন ওই শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৎস, কী কারণে আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, কোন্ ভাব আমার মনকে অধিকার করেছিল – তা তুমি কেমন করে জানলে?' শিষ্য বলল, 'গুরুদেব এ তো আপনারই কৃপা। আপনার শ্রীচরণ ছাড়া আমার তো অন্য কোন সাধনা নেই। আপনার চরণ কমলই আমার একমাত্র সম্বল, একমাত্র ভরসা।' এই বলে, শিষ্য গুরুর পায়ে মাথা রেখে তাঁকে প্রণাম করল। গুরু তখন দুহাত দিয়ে শিষ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বৎস, তোমার সকল সাধনা আজ সিদ্ধ হয়েছে, এখন থেকে তুমি আর সাধক নও, তুমি একজন সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছ।'

দেখো বাছা সরলা, এই গল্পে মানসিক শক্তি অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের কত শক্তি তা বুঝিয়ে দিয়েছে। সিদ্ধ গুরু সূক্ষ্ম শরীরে যে কাজ করে শিষ্যের জাহাজ রক্ষা করলেন, গুরুর এই কাজ দ্বিতীয় শিষ্যও সূক্ষ্ম শরীরে তা দেখে নিল। এই গল্পে গুরুসেবার ফলও বুঝিয়ে দিয়েছে। সাধন ভজন যা কিছু করো বা না করো, একমাত্র গুরুসেবার ফলস্বরূপ সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। এই কারণে একটি কথা প্রচলিত আছে –

'গুরু গুরু জপ
সর্বশ্রেষ্ঠ তপ'।

আমরা যখন এই সকল উপদেশ শুনছিলাম তখন এক স্বামী স্ত্রী সেখানে উপস্থিত হল, স্ত্রী এসেই প্রথমে গুরুমহারাজকে প্রণাম করতে উদ্যত হল। গুরুমহারাজ নিষেধ করে তাকে বললেন, আগে তোমার স্বামী দেবতাকে প্রণাম কর, তারপর আমাকে প্রণাম কর। কিন্তু ওই স্ত্রীলোকটি গুরুমহারাজের আগে তার স্বামীকে প্রণাম করতে ইতস্তত করতে লাগল, আর বারবার আমাদের দিকে চাইতে লাগল। তখন আমি গুরুমহারাজকে প্রশ্ন করলাম – বাবা, এটাই কি বিধি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ মায়ী, এইরকমই বিধি। এ সম্পর্কে একটা দোঁহা আছে –

'গুরু গোবিন্দ সামনে খাঁড়ো
কিস্‌কো লাগি আগে পায়
বলিহারী – বলিহারী, গুরু তুমহারী
যো গোবিন্দ মিলায়।'

দোঁহার অর্থ ঃ

প্রশ্ন – গুরুদেব এবং গোবিন্দদেব উভয়েই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কাকে আগে আমি প্রণাম করব? কে বড়ো?

উত্তর ঃ গোবিন্দদেবই বড়ো, কিন্তু গুরুদেব গোবিন্দদেবের চেয়ে অধিক বড়ো, যেহেতু গুরুদেব গোবিন্দদেবকে চিনিয়ে দেন। তাই আগে গুরুদেবকেই প্রণাম করতে হবে। অতএব হে গুরু,

'তোমারই বলিহারী
তোমারই বলিহারী'

এই দোঁহাটি আবৃত্তি করে শ্রীশ্রীগুরুদেব ওই স্ত্রী লোকটিকে বলতে লাগলেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো মায়ী, তোমার স্বামীদেবই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন! তিনি তোমাকে বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন– ইনি আমার গুরুদেব। এনার উপদেশ গ্রহণ করলে আমাদের কল্যাণ হবে। তবেই তো তুমি আমাকে গুরুদেব বলে চিনে নিয়েছ, তা না হলে তুমি আমাকে চিনতে পারতে না। স্ত্রীলোকের স্বামীই হলেন পরম দেবতা, আর যত দেবতা রয়েছেন তাঁরা স্বামী দেবতার নীচে অবস্থান করছেন। আমি তোমার পতিদেবতাকে প্রণাম করতে বলেছি, তুমি কেন সঙ্কোচ করছো?

স্ত্রীলোক ঃ বাবা, আমার পতিদেবকে প্রণাম করতে লজ্জা হচ্ছিল, যেহেতু আপনার সামনে কেমন করে প্রণাম করব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, এটা তোমার পক্ষে ঠিক হচ্ছে না। একটা চল্‌তি কথা আছে–

"আহারে ব্যবহারে
লজ্জা নাহি করে"

স্ত্রীর মনে এই ভাব হওয়া চাই পতিদেবতা নারায়ণ। দেখো বাছা, পতিভক্তির একটি গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি। ওই গল্প শুনে তুমি বুঝতে পারবে যে, স্বামী ভক্তি হলে, স্ত্রীর সিদ্ধিলাভ হয়ে যায়। স্বামী লজ্জা করবার মতো বস্তু নয়।

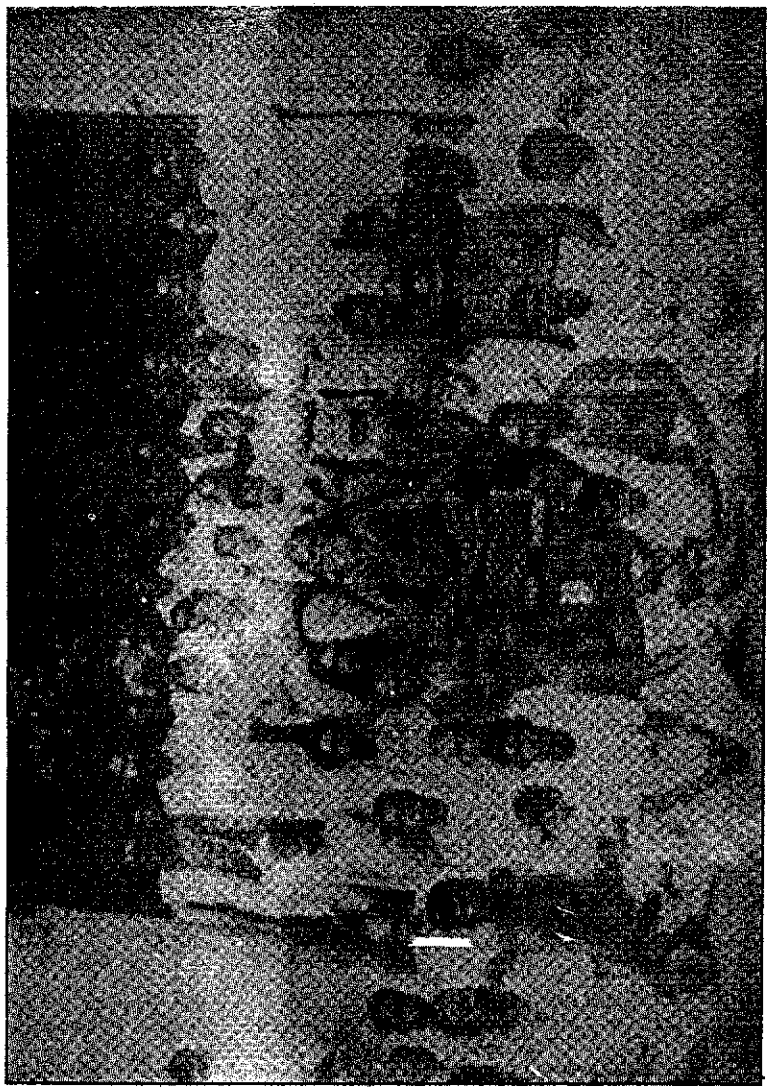

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী ও শিষ্য-ভক্তগণ

বক ভস্মর গল্প ঃ

একবার এক সাধু মহা অরণ্যে প্রবেশ করলেন। একটি জলাশয়ের ধারে ধুনি জ্বালিয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। সাধু বিস্মিত হল এই ভেবে যে, আমি এত যত্ন করে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হলাম, তাহলে কেন আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। সাধু দেখলেন - জলাশয়ের কাছে একটা বক খাড়া হয়ে মাছ মেরে খেয়ে নিচ্ছে। এই দেখে সাধুর মনে হল যে, এই বক আমার সামনে জীব হত্যা করছে, এই কারণে আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল। তখন সাধু যেইমাত্র বকের উপর রোষ দৃষ্টি ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে বক ভস্ম হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে সাধুর মনে খুব অহংকার হল। তিনি ভাবলেন, আমি তো সিদ্ধপুরুষ হয়ে গেছি। আমার সাধনা তো এখন সিদ্ধ হয়ে গেছে কারণ, আমার রোষ দৃষ্টিতে এক বক ভস্ম হয়ে গেছে।

এই ভাব নিয়ে সাধু এক নগরে ভিক্ষে করতে গেলেন। এক গৃহস্থের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি ভিক্ষে চাইলেন। গৃহস্বামী তখন গৃহে ছিল না, তার পত্নী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আমাদের গৃহ আজ পবিত্র হয়ে গেছে। আজ সাধু মহাত্মা আমাদের দ্বারে এসেছেন অতিথি হয়ে। আসুন প্রভু, ভিতরে আসুন। এই সব কথা বলে পত্নী সাধুকে বহু সমাদর করে ভিতরে নিয়ে গেল। সাধুজীকে আসনে বসাল, তারপর গলবস্ত্র হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। সাধু খুব আনন্দিত হয়ে বললেন, বৎসে আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমি যাতে নিজে রান্না করে আহার্য দ্রব্য তৈরী করতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও।

ইতিমধ্যে গৃহস্বামী এসে গেল। পত্নী সাধুজীকে বলল– হে সাধুজী, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি আমার পতিদেবতার সেবা করে তারপর আপনার আহার প্রস্তুতের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করে দেবো। এই বলে আবার সে পতিদেবতার হাত পা ধুয়ে দিল, তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে বহুবিধ অন্ন ব্যাঞ্জন নিয়ে এসে পরিতোষ সহকারে তাকে আহার করিয়ে দিল। সাধু মনে করল পত্নীর পতিসেবা হয়ে গেছে, এখন সে আমার আহার প্রস্তুতের জন্য রান্নার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু তা নয় ওই নারী বিছানার উপর শায়িত পতির পদসেবা করতে লাগল।

ক্ষুধার্ত সাধুর আর ধৈর্য্য রইল না। তিনি বললেন– আমি ক্ষুধাতুর। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে তাড়াতাড়ি রান্নার দ্রব্য সামগ্রী দাও, তা না হলে আমি এখান থেকে চলে যাব। স্ত্রীলোক বলল, না না বাবা, আপনি কেন চলে

যাবেন? আপনি অতিথি নারায়ণ, আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলে আমার অকল্যাণ হবে। আপনি একটুখানি অপেক্ষা করুন। আমি পতি নারায়ণের সেবা করে তারপর অতিথি নারায়ণের সেবা করব। একথা শুনে সাধুর খুব ক্রোধ হল। তিনি রোষ কশায়িত নেত্রে স্ত্রীলোকটির উপর বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিন্তু ওই নারী সাধুর দৃষ্টি দেখে কিছুমাত্র ভীত হল না, সে হাসতে হাসতে বলল, হে সাধুজী, আমি অরণ্যের বক নই যে আপনি আমাকে ভস্ম করে দেবেন।

একথা শুনে সাধুর খুব চমক লেগে গেল। এসব কথা এই নারী জানল কী করে? যা হোক, সাধুর ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে মাতা, আপনি বলুন, আপনি কী উপায়ে গভীর অরণ্যের ভিতর বক ভস্মের বৃত্তান্ত অবগত হলেন? আমার খুব আশ্চর্য লাগছে। তখন স্ত্রীলোকটি সাধুকে বলল, হে সাধুজী, আমি পতিসেবায় সিদ্ধিলাভ করেছি। তখন সাধুর চোখ খুলে গেল। তখন তিনি হাত জোড় করে সতী সাধ্বী নারীর উদ্দেশে বললেন; মাতা, আমি তোমার সন্তান, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি জানতাম না যে ঘরে বসেই এরকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। যা হোক, সাধুর সিদ্ধপুরুষ বলে যে অহংকার হয়েছিল, এই ঘটনার পর সাধুর সেই অহংকার চলে গেল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাচ্ছা, সাধ্বী নারীর কীভাবে সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে। এই কারণে আমার উপদেশ ভক্তিভাবে পতিসেবা করবে। পতি সাধারণ ব্যক্তি নয়। পতিসেবা স্ত্রীলোকের পরমধর্ম।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীমুখে এই সকল উপদেশগুলি শ্রবণ করে স্ত্রীলোকটি তাঁর স্বামীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করলেন এবং তারপর গুরুমহারাজকে প্রণাম করে তাঁরা চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা সরলা, আমাদের সৎসঙ্গের ধারা কোন্ ধার থেকে কোথায় চলে গেছে এখন তুমি বল, আমাদের কী সৎসঙ্গ হচ্ছিল?

আমি ঃ বাবা, আপনি আমাদের স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর আর কারণ শরীর সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। স্থূল শরীর কি উপাদানে গঠিত তা বলেছেন, সূক্ষ্ম শরীর কি উপাদানে গঠিত তা বুঝিয়েছেন, স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর শ্রেষ্ঠ তা বুঝিয়ে বলেছেন, এখন কারণ শরীর কি উপাদানে গঠিত তা আমাদের বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ বাছা, তুমি একজন ভাল শ্রোতা, আচ্ছা প্রশ্ন করেছো। ভাল শ্রোতা হলে বক্তারও বলবার স্ফুরণ বা প্রেরণা এসে যায়। অনাদি অনির্বচনীয়

অবিদ্যা বা অজ্ঞানই হল কারণ শরীর। এই অবিদ্যাই আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। এই কারণে বলা হয়– স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ অতিরিক্ত 'আত্মা'। এই ত্রিবিধ শরীর ছাড়া যে বস্তু রয়ে যায় তা হল - আত্মা। আত্মা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয়, কারণ নয়। আত্মা 'অণোরোনিয়ান্ মহোতো মহীয়ান্' অর্থাৎ আত্মা অণুর চেয়ে অণু মহানের চেয়েও মহান, অর্থাৎ বৃহৎ থেকেও বৃহৎ। এই আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়াই চরম সাধনা। আত্মতত্ত্ব অবগত হলে জীবের 'মোক্ষ', 'মুক্তি', 'নির্বাণ', 'কৈবল্য প্রাপ্তি' ইত্যাদি যা বলবে তা হয়ে থাকে। আত্মাই সর্ব বস্তুর আধার, আত্মাই সকল বস্তুর আধেয়। এই আধার আর আধেয়রূপী আত্মাকে বোঝো, অনুভব কর, তার সন্ধান কর। আত্মার সন্ধান করতে দেশ বিদেশ যেতে হবে না, নিজেদের হৃদয়েই সন্ধান কর, তাকে পেয়ে যাবে।

আমি ঃ বাবা, আপনি বললেন, আত্মাই 'আধার' আবার ওই আধারে 'আধেয়' রূপে বিদ্যামান। এই আধার ও আধেয় কাকে বলে - তা আরও সহজভাবে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, যেমন কোন বৃক্ষ আর ওই বৃক্ষের ফল। বৃক্ষ আধার আর বৃক্ষের ফল আধেয়। যেমন মৃত্তিকা আর বৃক্ষ। মৃত্তিকা হল আধার আর বৃক্ষ হল তার আধেয়। পরমাত্মাই আধার আর আধেয় রূপে জগৎ সংসারে তিনি বিরাজিত থাকেন। তাঁকে ছাড়া কোন বস্তুই নেই।

আমি ঃ বাবা, জগৎ সংসারকে তো চোখে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু জগৎ সংসারের যিনি আধার সেই পরমত্মাদেবকে তো দেখতে পাচ্ছি না। না দেখে কি করে তাঁকে ধারণায় আনব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাচ্ছা, যেমন প্রতিপদের চাঁদ দেখে পূর্ণিমার চন্দ্রের কেমন রূপ তা বুঝতে পারা যায়, সেইরকম পরমাত্মাদেবের এক কণা দেখে তার পরিপূর্ণতা বুঝে নিতে হবে। যেমন বিলেত থেকে এক টুকরো কাপড়ের স্যাম্পল (নমুনা) এল, তার এক টুকরো দেখে ক্রেতা বুঝে যায় কাপড়ের থান কেমন হবে, তেমনি পরমাত্মাদেবের এক কণায় এই সৃষ্টি রচনা হয়েছে। তুমি এই সৃষ্টিকে তাকিয়ে দেখো।

'সৃষ্টি', 'স্থিতি', 'লয়' কী আশ্চর্য রূপে সাধিত হয়ে থাকে। একবার অন্তরমুখী হয়ে চিন্তা করে দেখো। একবার হিমালয় পর্বতকে দেখো একবার সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে দেখো, তখন বুঝতে পারবে সৃষ্টিধর পরমাত্মাদেব কেমন। পরমাত্মাদেব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, পরমাত্মাদেব অনুভূতিগ্রাহ্য হয়ে থাকেন।

আমি ঃ বাবা, এই গভীর আত্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

অতি সুগম, অতি সহজ রাস্তা যা আছে, তা আমাদের বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (গীতা ঃ ১৮/৬৬)

অনুবাদ ঃ সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সমস্ত কর্তব্য কর্ম আমাতে অর্পণ করে তুমি সর্বশক্তিমান, সর্বাধার পরমেশ্বররূপ আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হতে মুক্ত করব, তুমি শোক করো না।

বাচ্ছা সরলা, তুমি গীতা শাস্ত্র প্রতিদিন পাঠ করছো তো? দেখো, সব শাস্ত্র নিংড়ে এই গীতাশাস্ত্র রচিত হয়েছে। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হয়ে যাও। আমি সব পাপ থেকে আমার শরণাপন্ন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেবো। দেখো বাছা, সরলা, কত সুগম পথের কথা ভগবান বলে দিয়েছেন। তবুও মানুষ সেই পথে যাচ্ছে না।

আমি ঃ হে ধর্মপিতা, হে গুরুমহারাজ, আমি আপনাকে বারবার প্রশ্ন করে বিরক্ত করছি। কিন্তু আপনি ছাড়া আমাদের পিপাসা নিবারণ করবেন, এরূপ বিশ্বাসের স্থানই বা আমরা আর কোথায় পাব? ভগবানের শরণাগত হতে পারলেই তিনি আমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করে দেবেন। বাবা, এত সহজ সুগম পথ পেয়েও মানুষ কেন সেইপথে যায় না, যেতে ইচ্ছে হয় না, অথবা প্রকৃত পথ জানে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না মায়ী, রাস্তা জানে, ওই রাস্তা ধরে গেলে যে মুক্তি মিলে যাবে -- এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের নেই।

আমি ঃ বাবা, আপনার মহাবাক্যে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আপনি আমাদের সুগম রাস্তা বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, তুমি তো নিজের রাস্তা করে নিয়েছ।

আমি ঃ কই পিতা, আমি তো এখনও ঈশ্বরকে সব কিছু সমর্পণ করে একান্ত মনে তাঁর শরণাগত হতে পারি নি। যদি পারতাম তাহলে চিত্তে সমতা আসত, সংসারের তুচ্ছ সুখ দুঃখ চিত্তকে আর অভিভূত করতে পারত না। বাবা, আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে ভালো করে প্রকৃত রাস্তা বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, সরলা, ঈশ্বরতত্ত্ব তো কোন ঔষধি নয় যে তোমাকে খাইয়ে দেবো। কোন মোটা বস্তু নয় যে হাতে দিয়ে দেবো। তুমি এই ঈশ্বরতত্ত্বকে বোঝবার চেষ্টা কর, তবেই বুঝবে।

আমি ঃ বাবা, বোঝবার আমার একান্ত ইচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ইচ্ছে যার হচ্ছে তাকেই চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা হলেই তবে রাস্তা মিলে যাবে। কিন্তু সেই চেষ্টারই ত্রুটি হচ্ছে। বাছা, তোমার প্রশ্ন শুনে আর তার ভাব গ্রহণ করবার শক্তি দেখে আমি তোমার উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি।

আমি ঃ বাবা, আপনি আমায় কি রোচক বাক্য বলছেন? আপনি আমার 'ইষ্টদেবতা'। ইষ্টদেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন, এ তো সামান্য কথা নয়।

বাবা, পৃথিবীতে আজ আমার জন্মগ্রহণ করা সার্থক হল। আমার পিতামাতাও আজ ধন্য হলেন, আমার উর্দ্ধতন সাতপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ আজ ধন্য হলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না, বাছা, তোমাকে আমি রোচক বাক্য বলিনি, যথার্থ বাক্যই বলেছি। আমি তোমার ধর্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন শুনে খুবই প্রসন্ন হয়েছি। দেখো বাছা, যে ব্যক্তি সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছে, অথবা নদী পার হয়ে যাচ্ছে, সেই ব্যক্তির নৌকার আর প্রয়োজন থাকে না। আমার এই শরীররূপী নৌকা রাখার কিছু কাজ বা প্রয়োজন নেই। তবে আমি এই শরীর ধারণ করে আছি ভক্তলোকদের জন্য, মুমুক্ষু ব্যক্তিদের জন্য। আমি সংসার সমুদ্র পার হয়ে গেছি, আমাকে উপলক্ষ্য করে আরও দশজন ব্যক্তি পার হয়ে যাক্, এটাই আমি চাই। এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করে এমন ব্যক্তি আমার কাছে এলে আমি খুবই সন্তুষ্ট হই। আমার কাছে বেশিরভাগ লোক আসে ঐহিক বা জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। আমার কাছে কেউ আসে রোগ নিরাময়ের ঔষধের জন্য, কেউ আসে পুত্রের ব্যাধি হয়েছে তার নিরাময়ের জন্য, কেউ এসে বলে আমি বন্ধা, আমার যেন একটি পুত্র লাভ হয়, কেউ আসে তার যেন অর্থ লাভ হয়, আবার কেউ আসে যশলাভের জন্য।

নিঃস্বার্থ মুমুক্ষু ব্যক্তি, ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি খুব কমই আসে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে ব্যক্তি এসে থাকে, সে তো বেশি দিন টেকে না, তার স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে গেলেই সে ব্যক্তি চলে যায়। সে ভাবে যে, আর ওনার কাছে গিয়ে কী করব, আমার তো কামনা পূরণ হয়ে গেছে। যার স্বার্থ সিদ্ধি হয় নি সেও চলে যায়। সে বলে, সাধু মহাত্মার কাছে গেলাম, আমার কামনা কিছুই পূরণ হল না, তাহলে আর কী জন্য তাঁর কাছে যাব? এইজন্য কোন নিঃস্বার্থ ধর্ম পিপাসু ব্যক্তি আমার কাছে এলে আমি খুবই আনন্দিত হই এই ভেবে যে এই ব্যক্তি টিকে থাকবে আর আমি যা উপদেশ দেব তা সে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করবে। দেখো বাছা, উপদেশ শুনলেই কিছু কাজ হবে না, সেই উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করলে তবেই কাজ হবে। দেখো, এই হৃদয়ঙ্গম ভাব নিয়ে এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি :-

পুত্তলিকার গল্প ঃ

কোন এক বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। ওই শিল্পী দুটি খুব সুন্দর পুতুল তৈরি করলেন। দলে দলে লোক আসতে লাগল পুতুল দেখতে, তারা কিনবে বলে পুতুলের দর জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু দাম শুনে সকলে পিছিয়ে যায়। অত দাম দিয়ে দুটো কাঠের পুতুল কিনতে কেউ রাজী হল না। নিজের দেশে পুতুল বিক্রি হচ্ছে না দেখে শিল্পী পুতুল নিয়ে দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ঘুরতে ঘুরতে এক রাজ্যে এসে শিল্পী সোজা রাজবাড়িতে তার পুতুল নিয়ে হাজির হলেন। সে দেশের যুবরাজ তখন রাজা হয়েছেন। তিনি পুতুল দেখে শিল্পীকে বললেন, এ দুটি পুতুলই আমার চাই। যত টাকা লাগে লাগুক আমি পুতুল দুটি কিনে নেব। তখন শিল্পী হাত জোড় করে রাজাকে বললেন, 'হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে। আমি নিজের হাতে পুতুল দুটি তৈরি করেছি আর এই দুই পুতুলের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা যে বলতে পারবে, তাকেই আমি পুতুল বিক্রি করব। এখন আপনি বলুন কোন্ পুতুলটি শ্রেষ্ঠ।' নতুন রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। দুটো পুতুলই অবিকল একই রকম দেখতে। একই প্রকার চোখ, নাক, কান, কোন রকম প্রভেদ নেই। কিছুই ঠিক করতে না পেরে তিনি চিন্তিত হয়ে মন্ত্রীর দিকে তাকালেন।

বুড়ো অভিজ্ঞ মন্ত্রী তখন রাজাকে বললেন, 'তুমি কোনো চিন্তা কোরো না, দুটি পুতুলের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা আমি এখনই বলে দিচ্ছি।' এই বলে মন্ত্রী এক ঘটি জল আনালেন, তারপর ঘটির জল একটা পুতুলের কানে খানিকটা ঢেলে দিলেন। এক কানে জল ঢালতেই আর এক কান দিয়ে সেই জল বেরিয়ে গেল। এবার দ্বিতীয় পুতুলটিকে নিয়ে তিনি তারও এক কানে জল ঢাললেন, কিন্তু অন্য কান দিয়ে সে জল বেরুল না। জল গিয়ে আটকে রইল পুতুলের বুকের কাছে। মন্ত্রী তখন রাজাকে বললেন, 'রাজা, এই পুতুলটাই হল শ্রেষ্ঠ'।

রাজা অবাক হয়ে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেমন করে বুঝতে পারলেন যে এই পুতুলটাই শ্রেষ্ঠ?' মন্ত্রী তখন বলতে লাগলেন, দেখো দুটি পুতুলেরই মানুষের আকৃতি, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই হল ভগবানের আরাধনা করা, আর যে ভগবানের আরাধনা করবে, তাকে সদ্‌গুরুর কাছে উপদেশ শুনতে হবে। যে উত্তম অধিকারী, সে সদ্‌গুরুর উপদেশ শুনে তা হৃদয়ে ধারণ করে রাখে। আর যে অধম, নিকৃষ্ট, গুরুর উপদেশ শুনে তার এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। উপদেশ শোনাই তার সার হয়। কিছুই তার কাজে আসে না। রাজা, এই শিল্পী

প্রকৃতপক্ষে শিল্পী নয়, ইনি একজন মহাপুরুষ। তোমার কল্যাণের জন্য, তোমাকে সৎকাজে প্রবৃত্ত করতে তিনি এই পুতুলের দৃষ্টান্ত সঙ্গে নিয়ে নিজে শিল্পী সেজে তোমার কাছে এসেছেন। এখনই তুমি এই সদ্‌গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ো, তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। রাজা তখন শিল্পীরূপী সদ্‌গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁর সদ্‌গুরু আশ্রয় মিলে গেল।

দেখো বাছা সরলা, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে কী প্রতিপাদন হল? প্রতিপাদন হল, যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর উপদেশ নিয়ে আপন হৃদয়ে ধারণ করে নেয়, ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। আর যে ব্যক্তি উপদেশ শ্রবণ করে হৃদয়ে ধারণ না করে বাইরে ফেলে দেয়, ওই ব্যক্তি নিকৃষ্ট হয়ে যায়। আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। দেখো, তুমি ভালো ভালো খাবার খেয়েছ, কিন্তু সবটাই বমি হয়ে গেল। যেমন খেলে তেমনি বমি হয়ে গেল। এরকম হলে কী হল? এতে মানুষ দিন দিন দুর্বল হয়ে যায়। এরকম ভাবে উপদেশ নিয়ে বমি করে দিলে মনের পুষ্টিসাধন হয় না। একটা প্রচলিত কথা আছে ঃ

'গুপ্ত সো মুক্ত, প্রকট যো ভ্রষ্ট'

একথার অর্থ হল, গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রকে যদি গোপন রাখতে পারো তবে সাধনার দ্বারা তুমি মুক্ত হতে পারবে। আর যদি সেই মন্ত্রকে প্রকট করো অর্থাৎ চারদিকে প্রচার করতে থাকো, তাহলে তুমি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ মন্ত্রের কোনো ফল তোমার জীবনে ফলবে না।

আমি ঃ বাবা, আপনি যে বললেন, 'গুপ্ত সো মুক্ত প্রকট যো ভ্রষ্ট' – একথা কি সর্ববাদীসম্মত ও সর্বস্থানের জন্য বললেন? তা যদি হয় তাহলে গুরুদেব মৌন হয়ে গেলেন, কাউকে উপদেশ দিলেন না, তাহলে পরম্পরাগতভাবে সকল শিক্ষাদীক্ষা তো কালে লুপ্ত হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, আচার্য্যকোটী মহাত্মা উত্তম অধিকারীর কাছে গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে শাস্ত্রের নির্দেশ আছে। আমি তোমাকে যা বলেছি তা নিম্নকোটী ব্যক্তির জন্য, সাধকের জন্য, সিদ্ধপুরুষের জন্য নয়। গীতা শাস্ত্রে ভগবানও একথা বলেছেন। গীতার ওই শ্লোক আমি তোমাকে শোনাচ্ছি ঃ

ইদং তে নাহতপস্কায় নাহভক্তায় কদাচন।

ন চাহশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি।। (গীতা ১৮/৬৭)

অনুবাদ ঃ এই গীতাশাস্ত্র তপস্যাহীন, গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বলবে না, আর যারা আমার প্রতি দোষদৃষ্টি রাখে তাদেরও

কখনও বলবে না।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।। গীতা ১৮/৬৮

অনুবাদ ঃ যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তিপূর্বক এই পরম গুহ্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট বলবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হবেন – এতে কোন সন্দেহ নেই।

দেখো বাছা, গীতাশাস্ত্রের এই দুই শ্লোক থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল যে, আচার্য কোটী অথবা সিদ্ধকোটী মহাত্মা সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরতত্ত্ব বলেন না। ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বাক্য শ্রবণের প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তির কাছে তাঁরা ঈশ্বরীয় তত্ত্ব কথা প্রকাশ করেন। তাহলে শ্রোতা আর বক্তা উভয়ের কল্যাণ হয়ে থাকে। জনসাধারণের জন্য 'গুপ্ত সো মুক্ত, প্রকট যো ভ্রষ্ট' – এই বাক্যটি ঠিকই আছে।

আমি ঃ বাবা, আমাদের শীঘ্রই কলকাতা যেতে হবে। এই পবিত্র সৎসঙ্গ ছেড়ে আপনার পবিত্র চরণ ছেড়ে আমাদের যেতে ইচ্ছে করছে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ মায়ী, তুমি তোমার ইচ্ছাকে এখানে রেখে কলকাতা যাবে।

আমি ঃ বাবা, একথার কী তাৎপর্য, তা বুঝলাম না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এ কথার তাৎপর্য হল যে, তোমার শরীর কলকাতায় যাবে, তা যেতে দাও। কিন্তু তোমার মন, তোমার ইচ্ছাশক্তিকে এখানে রেখে যাও। এতে কী লাভ হবে তা শীঘ্র জানতে পারবে। যেখানে শরীর রয়েছে, সেখানে মনকে যেতে হবে। যেখানে মন রয়েছে, সেখানে শরীরকে যেতে হবে। দেখো মায়ী, আমার কাছে আগে তোমার শরীর এসেছে অথবা আগে তোমার মন এসেছে কোন্‌টা ঠিক? মনই আগে এসেছে, মনে হল গুরুমহারাজের কাছে যাব, মন তো আগেই চলে এল, পিছনে পিছনে শরীর এল। এই কারণে আমি তোমাকে বলেছি, তোমার মনকে এখানে রেখে যাও, তাহলে শরীরও তাড়াতাড়ি ঘুরে এখানে এসে যাবে।

আমি ঃ বাবা, এখন আপনার শ্রীদেহ নিত্যই অসুস্থ হয়, এজন্য দূরে যেতে আমরা বিশেষ কাতর হচ্ছি। বাবা, আপনি ইচ্ছাময়, আপনি সুস্থ থাকবেন। এটাই আপনার চরণে একান্ত প্রার্থনা। আপনার শ্রীমুখের আশ্বাসবাণী পেলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারব।'

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না মায়ী, মনকে ব্যাকুল করা ঠিক নয়।

'যো হোনেকা হ্যায়

ওহি হো হোগাই হোগা
উসকো রোকনেওয়ালা
কোই নেহি হ্যায়।'

এইরকম ভাবের আর একটি বাক্য আছে তা সব সময় মনে রাখবে।

দোঁহা – রাই ঘটে নেহি তিল বাড়ে
রহ্‌রে চিত্ত নিঃশঙ্ক

দোঁহার অর্থ ঃ

ওরে মন, তুমি নিঃশঙ্ক হও, যেহেতু তোমার রাই অর্থাৎ (সরিষা) পরিমাণ কম হবে না, তিল পরিমাণটুকু পর্যন্ত বেড়ে যাবে না।

দেখো বাছা সরলা, এই দোঁহার ভাব স্মরণ করে নিঃশঙ্ক চিত্ত হয়ে যাও।

'মালিককো তো কই মালিক নেহি হোতা।'

পরমাত্মাদেব আমাদের মালিক, তাঁর উপর আর কোন মালিক নেই। মালিক যা করবেন তাই হবে। তার উপর আর কোন কথা হবে না। কথা না চললে কোন ক্ষতি নেই। আমাদের মালিক পরমাত্মাদেব পরমদয়াল একেবারে করুণাধার, তাঁর উপর সর্বসমর্পণ করে রেখে দাও। এতে কী হবে, 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' (গীতা)

যে ব্যক্তি তাঁর উপর সর্বসমর্পণ করে রাখে, তার যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) ভগবান নিজেই বহন করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। দেখো বাছা, আশ্রমকে দেখো, এই বছরে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে এই টাকা আসছে। আমি তো রোজগার করছি না, আর কারোর কাছ থেকে টাকা চাইছিও না।

তাহলে কোথা থেকে টাকা আসছে। পরমাত্মাদেব যোগক্ষেম নিজেই বহন করছেন। তাই আমার এই উপদেশ যে, তুমি পরমদয়াল পরমাত্মার উপর তোমার সব ভার ছেড়ে দাও। 'কর রাখ্‌নাসে হো রহনা।'

আমি ঃ বাবা, 'কর রাখনাসে হো রহনা' একথার অর্থ বুঝলাম না। আপনি বিশদভাবে বলুন। আপনার মধুর উপদেশ শোনবার জন্য কত দূর দূরান্তর থেকে লোক ছুটে আসে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কে জানে মায়ী, আমি তো কিছু জানি না। পরমাত্মাদের যেমন বলাচ্ছেন সেরকমই আমি বলছি। 'কর রাখনাসে হো রহনা' একথার প্রকৃত অর্থ হল ঃ 'আমার তুমি, তোমার আমি।'

দেখো বাচ্চা, পরমাত্মাদেবকে একদম নিজের মতো করে নাও। অথবা তুমি একদম তাঁর হয়ে যাও। তাঁর হয়ে যাওয়াই খুব আরামের। এর একটা দৃষ্টান্ত আছে। তা হল — বাঁদর ছানা আর বিড়াল ছানা। বাঁদর ছানা মাকে দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। এটি হল 'কর রাখনা' (অর্থাৎ আমার তুমি)। এর বিপদের সম্ভাবনা আছে। বাঁদর ছানা বাচ্চা তো, তার হাত যদি শিথিল অর্থাৎ আলগা হয়ে যায় তাহলে সে পড়ে যাবে। কিন্তু বিড়ালছানা একদম মায়ের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকে। এ হল 'হো রহনা' (অর্থাৎ তোমার আমি।)

বিড়ালছানার কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, মা যেখানে যায়, বাচ্চাকে মুখে করে নিয়ে যায়। এটি একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু এর ভাব গ্রহণ করার যোগ্য হওয়া দরকার। তুমি বিড়াল ছানার মতো একদম পরমাত্মার উপর সব ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকো, তাহলে শান্তি পাবে। তুমি একদম তাঁর উপর নির্ভরশীল হয়ে যাও। সদা সর্বদা মনে এই ভাব রাখো যে, আমি পরমাত্মার গদি অথাৎ আরাম কেদারায় বসে আছি, তাঁর কোলেই বসে আছি। দেখো, পুত্র যখন মায়ের কোলে থাকে, তখন সে কত আরামে থাকে। পরমাত্মা 'সর্বব্যাপী বিভু'। তুমি তাঁকে ছেড়ে থাকবে কোথায়? এইজন্য আমার উপদেশ হল — তুমি সব সময় মনে রাখবে যে তুমি পরমাত্মাদেবের কোলেতেই বসে আছ। এরকম ভালো জায়গা তুমি কোথায় পাবে? তুমি তো পরমাত্মাদেবের কোলেই আছ, কিন্তু তোমার জানা নেই — গুরুদেব কী করছেন? আমি তো তাঁর ভাবটি তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আমি ঃ বাবা, আপনার এই উপদেশগুলি শুনে আমি ও চারুমাতা বড়োই শান্তি পেলাম।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ খোঁচা না দিলে মধু পড়ে না। তুমি খোঁচা দিচ্ছ, তাই মধু পড়ছে। লক্ষ্মীমায়ী (চারুমাতাকে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ লক্ষ্মীমায়ী বলে অধিক সময় ডাকতেন) চুপচাপ বসে মধুর আস্বাদ নিয়ে যাচ্ছেন। একজন মধুর চাক ভাঙছে। ওই মধুতে কতজন মানুষের কল্যাণ হচ্ছে।

আমি ঃ বাবা, আপনার শ্রীমুখে শুনেছি, ঈশ্বর দু প্রকার। এক সগুণ ঈশ্বর, আর এক নির্গুণ ঈশ্বর। নির্গুণ ঈশ্বর আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের ধারণার অতীত, সগুণ ঈশ্বরকে আমরা ধারণায় আনতে পারি, যেমন রাম ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ইত্যাদি। বাবা, এই যে সগুণ ঈশ্বর, এঁরা যখন এই পৃথিবীতে শ্রীমূর্তি পরিগ্রহ করে এসেছিলেন, তখন তাঁদের কেন সকলে চিনতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে এসেছিলেন,

কতগুলি নিরীহ সরল প্রকৃতির গোপ এবং সরলা গোপী ছাড়া কে তাঁকে চিনতে পেরেছিল? অসংখ্য রাজন্যবর্গ, জনসাধারণ কেউই তো তাঁকে পরম ঈশ্বর বলে চিনতে বা জানতে পারেন নি, কী জন্য তারা চিনতে পারেন নি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ চিনতে পারেনি, একথা তোমাকে কে বলেছে? চেনে নি — এ ধারণা তোমার কেন হল?

আমি ঃ বাবা, আমার অন্তর কেঁদে বলে দেয় যে তাঁকে কেউ চিনতে পারেন নি। যদি চিনতে পারতো তাহলে কি সেই কোমল হাতে অশ্ববল্গা দিয়ে অর্জুনের রথের সারথি হতে দিত? আমি যখনই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ও সেনাপতির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে পার্থসারথীরূপে চিন্তা করি, তখনই আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে আর ভাবি, এই অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনাপতি কেউই তো প্রাণের ঠাকুরকে চিনতে পারল না, যদি চিনতে পারতো তাহলে যুদ্ধ আর হতো না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কৃষ্ণ ভগবানের নাম করতেই তোমার চোখে জল এসে গেছে। মায়ী, তোমার ভক্তি ধন্য হোক্।

আমি ঃ বাবা, আমরা ঘোর বিষয়ী, আমরা ভক্তিধনের চির কাঙ্গাল, আমাদের কী গতি হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাচ্চা, তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমাদের হৃদয়ে যে রকম ঐশ্বরিক রঙ লেগে আছে তাতে বৈষয়িক রঙ আর লাগবে না।

আমি ঃ বাবা, আপনার শ্রীমুখের বাণী মিথ্যে হবার নয়, আপনার আশীর্বাদ বাণী শুনে বড়ো আশ্বস্ত হলাম। বাবা, আজ আপনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন যে বিষয় রঙ আর আমাদের হৃদয়কে রঞ্জিত করতে পারবে না। এখন আপনি বলুন, কয়েকজন গোপ গোপীনি ছাড়া কেন শ্রী কৃষ্ণ ভগবানকে কেউ চিনতে পারে নি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সরল হৃদয়কমলে শ্রীভগবান তাড়াতাড়ি আসর জমিয়ে ফেলেন, এ ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে যে, ঈশ্বর কী সকামীকে কৃপা করবেন না? না করলে তো ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ এসে যাবে. ঈশ্বর সকামীকেও কৃপা করেন, তবে কিছু দেরীতে। সকামী বিষয় ভোগান্তে যখন নিষ্কামী হয়ে যায়, তখনই সে ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে থাকে। তোমাদের পুরাণে এক নিষ্কাম ভক্তের গল্প আমার মনে পড়ে গেল। ওই গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। শোনার পর খুব আনন্দ পাবে।

পদধূলির গল্প ঃ

বহুদিন হল ভগবান গোলোক ছেড়ে মর্ত্যলোকে গিয়ে রয়েছেন দেখে নারদ ঋষি ভাবতে লাগলেন, আমরা এতদিন ধরে তাঁর দর্শনলাভে বঞ্চিত রয়েছি। তাই একবার মর্ত্যে গিয়ে দেখে আসা যাক – কী এমন কাজে তিনি সেখানে আটকে পড়ে রয়েছেন। এই ভেবে নারদ বৃন্দাবনে এসে দেখলেন – ভগবান সেখানে গোপ গোপীদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। এই দেখে নারদের খুব রাগ হল। রাগ হল এই ভেবে যে, গোলোকের পতি হয়ে প্রভু কিনা এইসব অসভ্য নীচজাতি গোয়ালাদের দলে ভিড়ে গেলেন! নারদের ইচ্ছে হল – প্রভুকে একবার এর কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু প্রভুকে একান্তে পাওয়া যাচ্ছে না। সব সময় তিনি গোপ গোপী পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। নারদ তাই তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সুযোগ এসে গেল। নারদ ভগবানকে বললেন, প্রভু আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে – আপনি তার উত্তর দিয়ে আমার কৌতুহল মিটিয়ে দিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, নারদের মনোভাব আগেই তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই তিনি একটু হেসে নারদকে বললেন, 'কী তোমার প্রশ্ন, বলো?' নারদ বললেন, 'প্রভু, আপনি গোলোকপতি কিন্তু গোলোক ছেড়ে লক্ষ্মীদেবীকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে আপনি এই সব গোয়ালাদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এর কারণ কি তা আমি বুঝতে পারছি না। কৃপা করে, আমাকে বুঝিয়ে দিন।' ভগবান বললেন, 'নারদ আমি এখন খুব অসুস্থ, ভীষণ জ্বর। আমার সুস্থ হওয়ার একটা ব্যবস্থা করো দেখি, তারপর তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো।' নারদ বললেন, 'প্রভু, কিসে আপনার অসুখ সারবে বলে দিন, আমি এখনই আপনাকে ওষুধ এনে দিচ্ছি।' শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'যদি কোনো ভক্তের পদধূলি এনে আমার গায়ে মাখিয়ে দিতে পারো, তাহলে আমার অসুখ সেরে যাবে।' নারদ বললেন, 'সে কী প্রভু? আপনার গায়ে মাখাবার জন্য কোন্ ভক্ত পদধূলি দেবে? পাপের ভয়ে কেউ তা দেবে না।' ভগবান বললেন, 'তবু একবার চেষ্টা করে দেখো না। আমি অসুস্থ জানতে পারলে আমার রোগ সারাতে কোনো ভক্ত পায়ের ধুলো দিতেও তো পারে।' নারদ তখন পদধূলি সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

নারদ স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল – এই তিন ভুবন ঘুরে এলেন, কোথাও পদধূলি পাওয়া গেল না। নারদ ফিরে এসে ভগবানকে বললেন, 'প্রভু, আমি ত্রিভুবন ঘুরে এলাম,

কিন্তু দেবতা অসুর মানুষ কেউই আপনার জন্য পায়ের ধুলো দিতে রাজি হল না।' ভগবান বললেন, 'ত্রিভুবন তো ঘুরে এলে, তুমি বৃন্দাবনে গোপ-গোপীদের কাছে গিয়েছিলে?' নারদ বললেন, 'না প্রভু বৃন্দাবনে যাইনি।' ভগবান তখন বললেন, 'একবার সেখানে গিয়ে দেখো না, কেউ আমার জন্য পায়ের ধুলো দেয় কিনা।'

নারদ বৃন্দাবনে গিয়ে গোপ গোপীদের ডেকে বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের খুব অসুখ। তিনি বলেছেন ভক্তদের পায়ের ধুলো গায়ে মাখিয়ে দিলে তাঁর অসুখ সেরে যাবে। তোমরা কি তাঁর জন্য তোমাদের পদধূলি দিতে পারবে?' একথা শোনামাত্র সবাই বলে উঠল, 'নিশ্চয় পারব। তাদের উৎসাহ দেখে নারদ তাঁদের বললেন 'ওরে মূর্খ, তোরা জানিস না, শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তোদের পায়ের ধুলো তাঁর গায়ে মাখালে যে তোদের পাপ হবে।' তারা নারদকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুর পাপ হলে আমাদের কী হবে?' নারদ বললেন, 'তোদের নরকে গিয়ে পচতে হবে।' তাই শুনে গোপ গোপীরা বলল, 'আমরা নরকে যাব সেও ভালো, আমাদের প্রাণের সখা শ্রীকৃষ্ণ তো সুস্থ হয়ে উঠবেন। নাও ঠাকুর, আর দেরি কোরো না, কিসে পদধূলি নেবে বলো।' নারদের কাছে পদধূলি নেবার মতো কোন পাত্র ছিল না। তাই দেখে তারা বলল, 'তোমার গায়ের নামাবলী খানাই না হয় খুলে দাও, তাতেই আমরা পদধূলি বেঁধে দিচ্ছি।' নামাবলী খুলতে নারদ ইতস্তত করতে লাগল। গোপ গোপীরা তখন জোর করে তাঁর গা থেকে নামাবলীখানা খুলে নিল, তারপর সকলে মিলে, নিজেদের পায়ের ধুলো সেই নামাবলীতে বেঁধে তা নারদের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও ঠাকুর, তাড়াতাড়ি গিয়ে আমাদের প্রিয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সুস্থ করে তোলো।'

গোপ গোপীগণের ভাব দেখে নারদ তো অবাক। তাদের পদধূলির বোঝা শ্রীকৃষ্ণের কাছে নামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, গোপ গোপীরা আপনার জন্য পদধূলি দিয়েছে, আপনি তা গায়ে মেখে সুস্থ হয়ে আমাকে বলুন, কেন আপনি এদের মধ্যে পড়ে রয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, 'এখনো তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওনি নারদ? তুমি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবন ঘুরে এলে, আমি সুস্থ হব জেনেও পাপের ভয়ে কেউ তোমাকে পদধূলি দিল না। আর বৃন্দাবনের গোপ গোপীদের ভাবখানা দেখো, আমার জন্য তারা নরকে পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত। এরকম নিঃস্বার্থ প্রেমিক ভক্তের টানেই আমাকে গোলোক ছেড়ে পৃথিবীকে আসতে হয়েছে। তারা যে আমাকে তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলে জানে, এমন ভক্তই তো আমার প্রাণ।' এদের ছেড়ে কি থাকা যায়? নারদ, এখন বুঝলে তো? কেন আমি

গোলোকপতি, লক্ষ্মপতি হয়েও পৃথিবীতে এসে রয়েছি। দেখো নারদ, গোলকপতি লক্ষ্মীপতি হয়েছি বলে আমি কি পৃথিবীপতি নই? পৃথিবীতে এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিকদের জন্য আমি পৃথিবীতে এসেছি। নারদ, আমি জগৎপতি হয়ে কী করে জগৎবাসীকে ছেড়ে থাকি। লক্ষ্মীকেও বরং ছেড়ে থাকা যায় কিন্তু আমার এইসব নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভক্তকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ভক্ত মেরা প্রাণ
হাম ভক্তকা প্রাণ।

দেখো বাছা, সরলা, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প থেকে কী বোঝা গেল। বোঝা গেল যে, ভগবান ইতর ভদ্র বলে কিছু জানেন না। যে ব্যক্তি তাঁকে ভক্তি করে থাকে, প্রেম করে থাকে, ভগবান তারই হয়ে যান। তার কাছেই ধরা দেন। দেখো বাছা, তোমার প্রশ্ন ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন, তখন সব মানুষ কেন তাঁর পা আঁকড়ে পড়ে রইল না, সব মানুষ কেন তাঁকে চিনতে পারল না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। গীতা ৭/৩

অনুবাদ ঃ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেউ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রযত্ন করেন, আর প্রযত্নশীল মুমুক্ষুগণের মধ্যেও ক্বচিৎ কেউ আমাকে স্বরূপতঃ (স্বীয় আত্মারূপে) জানতে পারেন।

দেখো বাছা, গীতা শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলেছেন, সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে বহু পুণ্য বলে কোন ব্যক্তি নিজেকে জানবার জন্য যত্নশীল হয়ে থাকে। সেই রকম সহস্র সহস্র সিদ্ধলোকদের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমাকে পরমাত্মা বলে চিনতে পারে। তাহলে দেখো বাছা, সব মানুষ তাঁকে কেমন করে চিনবে?

'একোঽহং বহুস্যাম্'

এক ব্রহ্ম, তিনি বহু হয়েছেন। কেন বহু হয়েছেন? বহু হলেন, খেলা করবার জন্য। একা একা তো খেলা হয় না। তাই তিনি নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করলেন। চোর চোর খেলায় যে বুড়িকে ছুঁয়ে দিতে পারে তাকে আর চোর হতে হয় না। এখন সবাই যদি বুড়িকে ছুঁয়ে দেয় তাহলে খেলা চলবে কী করে? সেই রকম সকলেই যদি ভগবানকে চিনে নিতে পারে তাহলে তারা সবাই তো ভগবানে লীন হয়ে যাবে। তাহলে এখানে (জগতে) রইবে কে? তিনি খেলবেন কাকে নিয়ে? তাই বুড়িরূপী পরমাত্মা বা ভগবান সহজে কাউকে ধরা দেন না। তবে এখানে একটা কথা বলবার

আছে। সরল হৃদয় যাদের, তাদের ভগবান শীঘ্র ধরা দেন। বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের ছিল সরল চিত্ত বা অন্তঃকরণ, তাই ভগবান তাদের কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন।

আমি ঃ বাবা, অনন্ত শ্রীভগবানের অনন্ত কথা। আপনার উপদেশও অনন্ত। জ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপদেশ শুনছি। বাবা, এখন আশীর্বাদ করুন — উপদেশসমূহ যেন কার্যে পরিণত করতে পারি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ মায়ী, আমি তো আশীর্বাদ করেই চলেছি। তোমরা এই সব উপদেশ অনুসারে কাজ করে যাও — এটাই আমার আশীর্বাদ।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের আশীর্বাদ মাথায় ধারণ করে তাঁর চরণে প্রণাম করে আমরা দেওঘরে চারুমাতার চারুনিবাস বাটীতে চলে এলাম। বাড়ি ফিরে এসেও শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বরাভয় শ্রীমূর্তি স্মরণ করতে লাগলাম এবং তাঁর মধুর উপদেশগুলি কানে বাজতে লাগল।

চতুর্থ পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ শিবমন্দির, ১৩২০ সাল ঃ আশ্বিন মাস, সময় ঃ সকাল
পিতা শ্রী শরচ্চন্দ্র সিংহ মহাশয়
ও
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি থাকে, সুখ নেবে আর দুঃখ নেবে না, তা হয় না, এ সম্পর্কে একটি গল্প, গল্পের নাম 'চাষার দুঃখ নিবারণের গল্প' ঃ আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয় পরমাত্মার প্রাপ্তি হলে ঃ পরমাত্মাদেব আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির ডাকে তিনি কী কর্ণপাত করেন? হ্যাঁ করেন, এ প্রসঙ্গে 'বিনা তারের টেলিগ্রাফ'-এর উদাহরণ ঃ ঈশ্বর দুঃখ কষ্টের সৃষ্টিকর্তা হলেও তবু তাঁকে দয়াময় বলা হয় কেন? ঃ পরমাত্মাদেবকে কীভাবে পাওয়া যাবে ঃ ভগবানের কৃপালাভের উপায়, এ সম্পর্কে নারদের তেলের বাটির গল্প ঃ ভক্তিলাভের ক্রম ঃ নববিধা ভক্তি ঃ ভক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে গীতার ৯।৩৪ শ্লোকের আলোচনা ঃ সাধারণ সন্ন্যাস ও কাষ্ঠ সন্ন্যাস ঃ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের অন্তিম সময়ে কাষ্ঠ সন্ন্যাস গ্রহণ ও দেহত্যাগ।]

আমি এবং আমার পিতৃদেব শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের চরণ দর্শন করবার জন্য কলকাতা থেকে ব্যাকুল চিত্তে এসে শুনলাম যে, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ছ'মাসের জন্য কাশীধামে চলে যাচ্ছেন। করণীবাদ শিবমন্দিরে এসে পিতা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে প্রণাম করে কাতরতার সঙ্গে তাঁকে এই কথাগুলি বলতে লাগলেন।

পিতা ঃ মহারাজ, আমরা সংসারীরা সর্বদা আপনার কাছে আসতে পারি না। অনেক দূর থেকে অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এখানে এসে শুনলাম, আপনি আজই রাতের ট্রেনে চলে যাবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই সিংগী, এর উত্তর আমি একটি দোঁহার মাধ্যমে দেব। দোঁহাটি হল ঃ

'বীর ছোড়ায়কে যাতে হো।
দুর্বল যানকে মোয়।।
হৃদয় সে যব্ যানে স্যেকে
তব্ জানেঙ্গে তোয়।।'

মর্মার্থ ঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন – হে কৃষ্ণ, তুমি বীর বলশালী, আমরা দুর্বল, তাই তুমি আমাদের হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছ। কিন্তু এতে তোমার কী আর

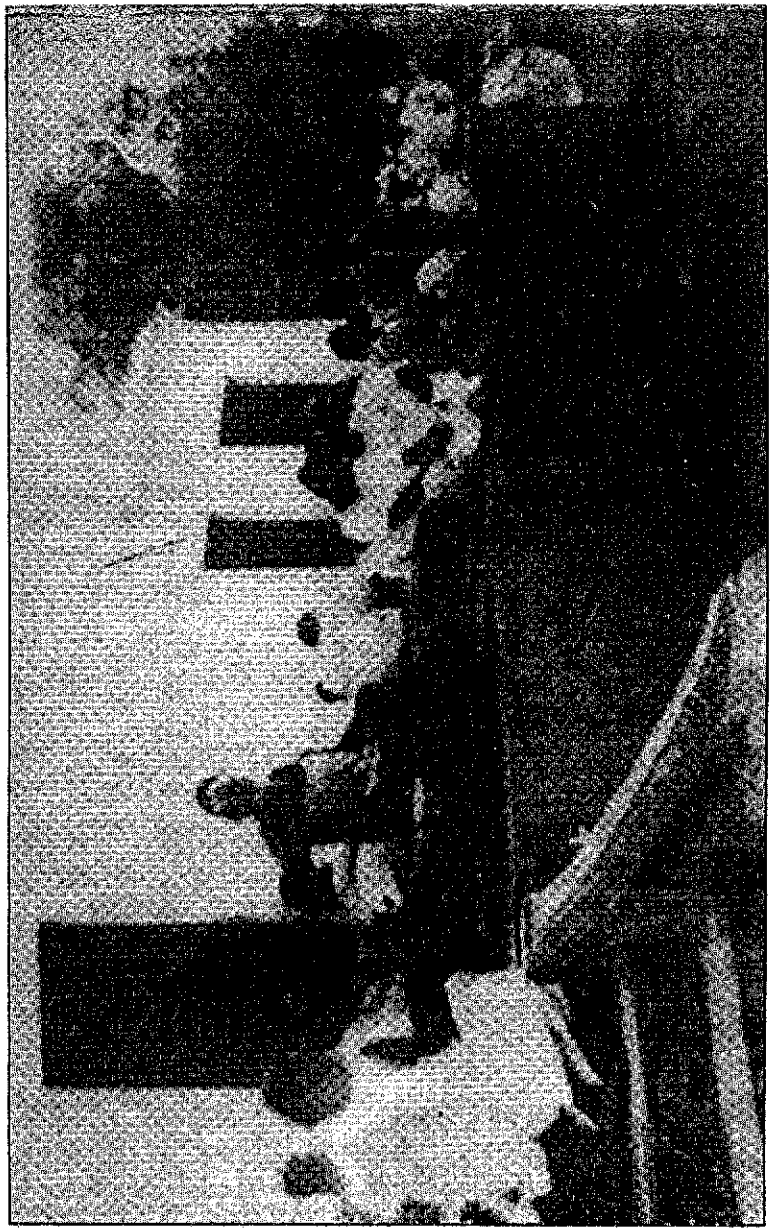

ভক্ত পরিজন সহ শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী

বাহাদুরী। আমাদের হৃদয় থেকে যদি তুমি চলে যেতে পার, তখনই তোমাকে বাহাদুর বলে স্বীকার করব।

দেখো ভাই সিংগী, এখন তোমার উত্তর পেয়ে গেছ তো? আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার যে ফটো তোমাদের হৃদয়ে তুলে নিয়েছ, তা কী করে আমি উঠিয়ে নিয়ে যাব? তোমরা তো তোমাদের হৃদয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়েছ, আমি তো তোমাদের কাছে বন্দি হয়ে গেছি। আমার এই সাড়ে তিন হাতের স্থূল শরীর কাশীধামে যাচ্ছে, এতে তোমরা দুঃখ করছো কেন? তোমরা কী এই সাড়ে তিন হাত বিশিষ্ট স্থূল শরীরের ধ্যান করে থাকো?

পিতা ঃ না মহারাজ, আমি আপনার

'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'

এই ভাব নিয়েই ধ্যান করি

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তাহলে তুমি গুরুমহারাজ চলে যাবে বলে কেন দুঃখ করছো?

পিতা ঃ মহারাজ, দুঃখ যাতে না হয় এ সম্পর্কে আপনি আমায় কিছু উপদেশ শুনিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি বিরাজিত থাকে। সুখ নেবে, আর দুঃখ নেবে না – তা হয় না। সুখ চাইলে, দুঃখকে নিতে হবে। এ কথার দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

চাষার দুঃখ নিবারণের গল্প ঃ

এক চাষা বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদে মাঠে কাজ করছে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে, গরমে সে খুব দুঃখ কষ্ট ভোগ করছে। চাষা আকাশের দিকে চায় আর বলে, 'ভগবান, আর যে পারিনে, তুমি আমার শরীরটাকে পাষাণের মতো করে দাও, তাহলে রোদের তাপ থেকে বেঁচে যাই।' এমন সময় দেববাণী হল – 'তথাস্তু'।

দৈববাণী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষার আর গরমের দুঃখ কষ্ট রইল না। মাঠের কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে এলে চাষার বউ প্রতিদিনকার মতো নিজের হাতে তেল মাখিয়ে তাকে স্নান করতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু স্নান করে চাষার কোন আরাম বোধ হল না, স্নান সারা হলে বউ তাকে খেতে দিল, কিন্তু খেয়েও চাষা কোন তৃপ্তি পেল না। সে কেবল ভাবতে লাগল, কোনো দিন তো এমন হয় না। আজ কেন এমনটা হল। চাষাকে চিন্তিত দেখে বউ তাদের ছোট ছেলেকে স্বামীর কোলে বসিয়ে দিল। ছোট ছেলেকে চাষা খুব ভালবাসে, বউ ভাবল ছেলেটাকে কোলে নিলেই তার স্বামীর

সব চিন্তা দূর হয়ে যাবে। চাষা ছেলেটাকে আদর করতে লাগল, কিন্তু তাতেও সে কোনো সুখ পেল না। এসব দেখে তার ভয়ানক চিন্তা ধরে গেল, আজ আমার এ কী হল, কিছুতেই কোনো আনন্দ সুখ পাচ্ছি না কেন?

ভাবনা চিন্তায় চাষা অস্থির হয়ে উঠেছে এমন সময় আবার দৈববাণী হল। চাষা শুনতে পেল ওরে মূর্খ, আজ যে তুই পাষাণ হবার বর চেয়ে নিয়েছিস, তাই আজ থেকে তোর সুখও নেই, দুঃখও নেই। সুখ হবে আর দুঃখ হবে না এমন পাষাণ আমি তৈরি করতে পারি না। জেনে রাখিস যার দুঃখ থাকবে না, তার সুখও থাকবে না। কেবল সুখ নেব, দুঃখ নেব না। এমন কোনো উপায় আমার জানা নেই। চাষা তখন হাত জোড় করে বলতে লাগল, 'হে ভগবান, আমি আগে যেমন সুখ দুঃখ ভোগ করতাম, আমাকে সে রকমই করে দাও। আমি বুঝতে পেরেছি যে, যা কিছু বিধান তুমি আমাদের জন্য করেছ, তা আমাদের কল্যাণের জন্যই করেছ। সুখ আর দুঃখ যদি চলে যায়, তাহলে আমাদের রইল কী? আমরা যে পাষাণ হয়ে যাব। ফের দৈববাণী হল – 'তথাস্তু'। চাষা আগেকার মতো সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোকের বশবর্তী হয়ে গেল।

পিতা ঃ মহারাজ, সুখে হর্ষ, দুঃখে শোক, পরমাত্মাদেব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন – আমাদের তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে – আপনার গল্প শুনে এই প্রতিপাদন হল। কিন্তু সুখ-দুঃখ হর্ষ শোক ছাড়া পরমাত্মাদেব আমাদের জন্য আর উত্তম কী জিনিস সৃষ্টি করেছেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, সিংগী, পরমাত্মাদেব আমাদের জন্য আর এক মনোহর বস্তু রেখেছেন।

আত্যন্তিক দুঃখকা নিবৃত্তি
পরমাত্মাকো প্রাপ্তি।

পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ পরম সুখ ভগবান সৃষ্টি করেছেন। পরমাত্মার প্রাপ্তি হলেই আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখের নিবৃত্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নেই।

পিতা ঃ পরমাত্মাদেবের প্রাপ্তি কী করে হবে, আমাদের ডাক কী তাঁর কাছে পৌঁছবে? পরমাত্মাদেব আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির ডাকে কর্ণপাত করবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ পরমাত্মাদেব পিঁপড়ের ডাকও শুনে থাকেন আর তোমার ডাক শুনবেন না? তুমি ডাকলেই তা তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। পরমাত্মাদেবের সাথে আমাদের 'বিনা তারের টেলিগ্রাফ' আছে। তুমি যেমনি হৃদয়ে পরমাত্মাদেবের স্মরণ

করবে তা ঝট করে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। তোমরা জান না, আমি জানি বলেই একথা বলছি। তোমরা আমার কথা নিঃসংশয় আর নিঃসন্দেহ হয়ে বিশ্বাস করো। তোমাদের বিশ্বাসের জন্য আমি আর একভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো, মানুষে মানুষেও এই বিনা তারে টেলিগ্রাফ চলছে। তুমি যাকে স্মরণ করবে ওই ব্যক্তি যত দূরেই থাক না কেন, ঝট্ করে তোমার ওই স্মরণ বা ডাক তার কাছে চলে যাবে। দেখো, যে ব্যক্তির প্রতি তোমার প্রেম ভালবাসা নেই, তাকে তুমি তোমার স্মরণে রাখো না। ওই ব্যক্তি তোমার অতি নিকট আত্মীয় হলেও সে দূরেই থাকে, পর হয়েই থাকে। একারণে বলা হয় যে –

'ঈশ্বরকো প্রেম করো।
উসিকো স্মরণ করো।'

ঈশ্বর তোমার আপনজন হয়ে যাবেন। এই 'বিনা তারকা টেলিগ্রাফ'-এ যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তুমি মানুষের সাথে পরীক্ষা করে দেখোই না। তুমি যাকে স্মরণ করবে, ওই স্মরণ ঝট্ করে ওই ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যাবে। তুমি ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে।

পিতা ঃ মহারাজ, মানুষে মানুষে তো বিনা তাদের টেলিগ্রাফ চলেই থাকে, এ তো আমরা প্রতিদিন পরীক্ষা করে দেখেই থাকি। যাকে আমরা বেশী করে স্মরণ করে থাকি ওই ব্যক্তি সামনে এসে যায়। ওই ব্যক্তি যদি দূর দেশে থাকে, কাছে এসে উপস্থিত হতে পারে না, তখন একখানি চিঠি সে পাঠিয়ে দেবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, বিনা তারকা টেলিগ্রাফকে অবিশ্বাস করার তো কোন উপায় নেই, যেহেতু বিজ্ঞানের প্রভাবে দেখো বিনা তারের টেলিগ্রাফ 'রেডিও যন্ত্র' বেরিয়ে গেছে। কোথায় বিলেতে গীত হচ্ছে, বক্তৃতা হচ্ছে, এখানে বসে তা শুনে নিচ্ছ, কোন তারও নেই, কোন সংযোগও নেই। তাহলে এখন তোমাকে বিনা তারের টেলিগ্রাফ বিশ্বাস করতেই হবে। যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিয়েছ যে বিলেতের কথাবার্তা এখানেই শোনা যাচ্ছে। পরমাত্মাদেব যেখানেই থাকুন কোন ক্ষতি নেই, তুমি তাঁকে হৃদয়ে ডাক, তোমার কথা তাঁর কাছে অবশ্যই পৌঁছবে।

পিতা – মহারাজ, আজ আমার হৃদয় বড়ো শান্তি লাভ করল। আমাদের কথাবার্তা পরমাত্মাদেব শুনছেন, এই উপদেশ শুনে খুবই আনন্দ হল। চিত্ত একদম সুস্থ হয়ে গেল। তবে মনে মনে একটা প্রশ্ন জাগছে – পরমাত্মাদেব সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু হয়েও কেন তিনি আমাদের জন্য দুঃখ সৃষ্টি করলেন? দুঃখ সৃষ্টি করার জন্য তাঁকে

দয়াময় বলতে আমি পারছি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না বাছা সিংগী, পরমাত্মাদেবকে দয়াময় বলতেই হবে। ভগবান যদি দুঃখের সৃষ্টি না করতেন তাহলে সুখের বোধ হত কেমন করে। সুখকে বোঝবার জন্যই পরমাত্মাদেব দুঃখের সৃষ্টি করেছেন। সুখ দুঃখের বোধক, দুঃখ সুখের বোধক। এই জন্যই ভগবান সৃষ্টিকে দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশ করেছেন। এখন তুমি বুঝতে পারছো যে ঈশ্বরকে দয়াময় প্রেমময় বললে তোমার নিজেরই কল্যাণ হবে।

পিতা ঃ মহারাজ, আমাদের বাংলা দেশে কবি চণ্ডীদাস মহাসাধক ছিলেন। তাঁর রচিত গানের দু লাইন মনে পড়ছে –

'কহে চণ্ডীদাস শুন সর্বজন
সুখ দুঃখ দুটি ভাইরে।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁইরে।'

এই গানের তাৎপর্য হল – সুখ দুঃখকে ছেড়ে ঈশ্বরকে প্রীতি করবে অর্থাৎ ভালবাসবে। সুখের জন্য যদি ভালবাস তাহলে তো দুঃখও ভোগ করতে হবে। যেহেতু সুখ দুঃখ পাশাপাশি দুই ভায়ের মতো থাকে। একজন এলে অপরজনও আসবে। আপনার বাক্য 'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি পরমাত্মা প্রাপ্তি'-র সঙ্গে চণ্ডীদাসের গানের সমন্বয় হয়ে গেল। আপনি বলেছেন – পরমাত্মা প্রাপ্তি না হলে সুখ-দুঃখ ভোগ করতেই হবে। চণ্ডীদাসও বলেছেন – সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে ভগবানকে প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসবে। মহারাজ, আমি পরমাত্মাদেবকে দয়াময় প্রেমময় সবকিছু বলতে চাই, কিন্তু তাঁকে পাব কোথায়? শাস্ত্রকার নির্দেশ দিয়েছেন 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অর্থাৎ ঈশ্বর হলেন বাক্য মনের অগোচর।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ বাক্য মনের অগোচর বলা আছে। কিন্তু এ-ও তো বলা হয়েছে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্' (গীতা - ৬/২১ শ্লোক) ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অতীত, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিভাত হয়ে থাকেন।

পিতা ঃ আমি মহা অজ্ঞ, পরমাত্মাদেব পরম বিজ্ঞ, বিজ্ঞ ব্যক্তি অজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মেশে না। আমি অজ্ঞ, পরমাত্মাদেব আমার বুদ্ধিতে কী করে ধরা দেবেন এবং আমার কাছে আসবেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এক পরমপুরুষ পরমাত্মাদেব বিজ্ঞ। আর তাঁর কাছে সমস্ত ব্যক্তি অজ্ঞ। বিজ্ঞতা লাভের জন্য তাঁকে পেতে হবে, তা নয়। তাকে পেতে হবে প্রেমের

দ্বারা। এ সম্পর্কে মীরাবাঈ-এর একটি গীত আছে

'নদী নাহনসে হরি মিলে তো জলজন্তু হই
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বহুৎ বাদুর বাদুরাই
তিরণ ভক্ষণসে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা
স্ত্রী ছোড়কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে খোজা
দুধ পীকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা
তুলসী পিদনে হরি মিলে তো মেই পিঁদি
কুঁদা আউর ঝাড়, পাথর পুজনে হরি
মিলে তো মেই পুজি পাহাড়।'

পিতা ঃ মহারাজ, আমরা সংসারী মানুষ। আমাদের চিত্ত বিষয়াসক্ত। আমরা মীরাবাঈ-এর মতো সদা সর্বদা শ্রীহরিকে ডাকতে পারি না। তাহলে কী করে আমাদের প্রতি ভগবানের কৃপা বর্ষিত হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই সিংগী, এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ একটা গল্প বলছি, তাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে।

নারদের তেলের বাটির গল্প ঃ

একদা নারদ ঋষির মনে বড়ো অহংকার হল যে, আমার মতো ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আর কেউ নেই। মনের এই অহংকার নিয়ে একদিন তিনি তাঁকে দর্শন করবার জন্য হরিগুণগান করতে করতে গোলোকে শ্রীকৃষ্ণর কাছে উপস্থিত হলেন। অন্তর্যামী ভগবান নারদের মনোভাব বুঝে গেলেন। নারদ প্রণাম করবার পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু নারদের সঙ্গে কোনো কথা না বলে আনমনা হয়ে বসে রইলেন। তখন নারদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, অনেক দিন পর আপনাকে দর্শন করতে এসেছি, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন না কেন? তখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'নারদ, মর্ত্যলোকের একটি মেয়ে বড়ো ভক্তিমতী, তার মতো আমার ভক্ত আর কেউ নেই। আমি তার কথাই ভাবছিলাম। আর ভাবছি, একবার গিয়ে তাকে দেখে আসি। তাই তুমি আমাকে অমন আনমনা দেখেছ,' নারদ বললেন, 'প্রভু আপনার ওই পরম ভক্তকে দেখবার আমারও বড়ো ইচ্ছে করছে।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ উভয়ে মর্ত্যলোকে এসে গ্রামের এক কৃষকের বাড়িতে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন কৃষকের বউ ঘরের কাজে খুবই ব্যস্ত,

এতটুকু তার সময় নেই। আড়াল থেকে বউটিকে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন, 'নারদ, এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলছিলাম। মেয়েটি আমার পরম ভক্ত।' তাই শুনে নারদ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, এ আবার ভক্ত হল কেমন করে? এখানে এসে দেখছি, মেয়েটি ঘোর সংসারী সংসারের কাজ নিয়ে যেরকম ব্যস্ত, তাতে ওর ভগবানের নাম নেবার সময়ই বা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ ও নারদ সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে সারাদিন কেটে গেল। বউটির সংসারের কাজ আর ফুরোয় না। তার কাজ যখন শেষ হল, তখন গভীর রাত। খাটিয়ায় তার স্বামী শুয়েছিল, সে এসে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়লো। শোবার সময় স্বামীকে বলল, একবার প্রেমের সঙ্গে বল 'শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি'। এইভাবে ভগবানের নাম স্মরণ করে বউটি ঘুমিয়ে পড়ল।

এসব দেখে শুনে হাসতে হাসতে নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'প্রভু আপনি বললেন, এই চাষার বউ আপনার পরম ভক্ত, কিন্তু ওর মধ্যে ভক্তির কোনো লক্ষণই দেখলাম না। সারা দিন রাতের মধ্যে মাত্র তিনবার ও আপনার নাম নিয়েছে, বাকি সময়টা তো দেখলাম সংসার নিয়েই মেতে রইল। এতেই আপনি কেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না।' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'নারদ, তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে আমার একটা কাজ করো। আমি তোমাকে এক বাটি সরষের তেল দিচ্ছি, সেই তেলের বাটি নিয়ে তুমি স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতাল ঘুরে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু খুব সাবধান, এর এক ফোঁটা তেল যেন মাটিতে না পড়ে। সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখবে। তুমি ফিরে আসার পর তোমাকে বুঝিয়ে দেব কৃষকের বউ আমার কেমন ভক্ত।'

তেলের বাটি নিয়ে নারদ রওনা হলেন। প্রভু বলে দিয়েছেন, ত্রিভুবন ঘুরে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে, কিন্তু কানায় কানায় পূর্ণ ভর্ত্তি তেলের বাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, তেল উপচে পড়ে যাবে। এদিকে প্রভুর হুকুম, এক ফোঁটা তেলও যেন মাটিতে না পড়ে। নারদ বড়ো মুসকিলে পড়ে গেলেন। অথচ কিছু করার নেই। খুব সাবধানে তেলের বাটি নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে নারদ বহুদিন পর সেই কৃষকের বাড়িতে ফিরে এলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তেলের বাটি ফেরত দিয়ে নারদ বললেন, 'কানায় কানায় ভর্ত্তি এই তেল সামলাতে আমাকে বড়োই বেগ পেতে হয়েছে। আপনি বলে দিয়েছিলেন মটিতে যেন তেল না পড়ে, আবার তাড়াতাড়ি ত্রিভুবন ঘুরে আসতে হবে। এই দুদিক সামলাতে গিয়ে আমার যে কী কষ্ট হয়েছে তা বলবার

নয়।' 'যা হোক, আপনার আদেশ তো পালন করলাম। এখন বলুন, এই চাষার বউকে কেন আপনি পরম ভক্ত বলছেন?'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন হেসে বললেন, 'নারদ তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওনি? তুমি হলে ঋষি, দিনরাত বীণা বাজিয়ে আমার গুণগান করেই তোমার দিন কাটে। আচ্ছা বলতো নারদ, এই যে তেলের বাটি নিয়ে তুমি ত্রিভুবন ঘুরে এলে, এর মধ্যে কতবার তুমি আমার নাম স্মরণ করেছ?' নারদ বললেন, 'প্রভু তেল যাতে না পড়ে, সারাক্ষণ সেদিকেই আমার মনটা পড়ে ছিল, তাই আপনার নাম স্মরণ করবার কথা একবারও মনে পড়েনি।' ভগবান বললেন, 'তবেই বুঝে দেখো, কে আমার পরম ভক্ত। নারদ, এই সংসারটাও হল কানায় কানায় ভরা তেলের বাটির মতো। যারা এই সংসারের সমস্ত কাজ শেষ করে অন্তত একবারও আমাকে ভালোবেসে ডাকে, সেই মধুর ডাকে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এই মেয়েটি সংসারের এত কাজ নিজে হাতে করে আমাকে ভুলে না গিয়ে শোবার সময় আমাকে ভক্তিভরে স্মরণ ও আমার নাম করে। নারদ, এই যে তুমি অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কেবল আমার নামগান করে বেড়াচ্ছো, এতে আর বাহাদুরীর কী আছে? সংসারের সব দিক সামাল দিয়ে যে আমার নাম নেয়, আমি তার বাহাদুরী দিয়ে থাকি। নারদ ঋষির ভক্ত অভিমান দূর হয়ে গেল। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।'

দেখো ভাই সিংগী, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুনে তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলেছে তো? সংসারী মানুষ বিষয়াসক্ত জীব, কী করে ভগবানকে ডাকবে। আমি অজ্ঞ, বিজ্ঞ ভগবান আমার কাছে কেন আসবেন, এই সংশয় তোমার দূর হল তো? অজ্ঞ জীবের সাথে ভগবানকে খেলা করতে হয়। অজ্ঞ জীবের সাথে তাঁকে প্রেমের খেলাও খেলতে হয়। বিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে তিনি (ভগবান) প্রেম করবেন, খেলা করবেন – এ রকম বিজ্ঞ ব্যক্তি ভগবান কোথায় পাবেন – তাই

'এক ভগবান বিজ্ঞ
সমুচা মুনুষ্য অজ্ঞ'

দেখো ভাই সিংগী, তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আমরা সারাদিন ধরে ঈশ্বরকে ডাকবো, গৃহীলোক সময় ধরে ডাকবে। দুজনের ডাক বরাবর হয়ে যাবে। আর এক দৃষ্টান্ত তোমাকে দিচ্ছি। ধনী যে সে এক টাকা দান করতে পারে, কিন্তু যে গরীব সে যদি একটা আধলাও দান করে, ভগবানের কাছে সেই আধলার মর্যাদাও অনেক বেশি, কেননা ধনীর অনেক টাকা রয়েছে, তা থেকে এক টাকা দান করা তার পক্ষে

এমন বেশি কিছু নয়। কিন্তু গরীবের পক্ষে একটা আধলা দান করা তার বড়ো মনেরই পরিচয় দেয়। ভগবান ভক্তের ভাবটাই গ্রহণ করেন, বস্তু তার কাছে বড়ো নয়।

পিতা ঃ মহারাজ, আপনার উপদেশ শুনে বুঝতে পারলাম যে, ভগবানকে দিনভর ডাকো আর না ডাকো, তাঁকে ভক্তিভরে একবার ডাক দিলেই ভগবান তা শুনতে পান। এখন আমাদের ভক্তি উপার্জন প্রথমে করতে হবে। কীভাবে ভক্তি অর্জন হবে, সে সম্পর্কে উপদেশ দান করুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, ভক্তিলাভের একটা ক্রম আছে। তা হল সাধনসাপেক্ষ। ভক্তি সাধনের নটি ধাপ বা সিঁড়ি আছে। তাদের নাম – নববিধা ভক্তি। এই নববিধা ভক্তি যদি সাধন করতে পারো তাহলে ভক্তির চরম সীমায় পৌঁছে যাবে। তোমাকে আর অন্য কোনো সাধন করতে হবে না।

(নববিধা ভক্তির সাধন ক্রম)

১। শ্রবণ ২। কীর্তন ৩। স্মরণ ৪। পাদসেবন ৫। অর্চন ৬। বন্দন ৭। দাস্য ৮। সখ্য ৯। আত্মনিবেদন।

দেখো সিংগী, এই নববিধা ভক্তি সাধনের দ্বারা শ্রী ভগবান একেবারে আপনার জন হয়ে যান। কেমন করে হয়ে যান? আপনা থেকেই হয়ে যান।

প্রথম শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ করতে হবে, দ্বিতীয় ভগবানের গুণকীর্তন করতে হবে। তৃতীয় সর্বদা ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। চতুর্থ শ্রীভগবানের পাদপদ্মের সেবা করতে হবে। পঞ্চম শ্রীভগবানের অর্চনা অর্থাৎ পূজা পাঠ উপাসনা করতে হবে। ষষ্ঠ ভগবানের বন্দনা অর্থাৎ স্তবস্তুতিতে মগ্ন থাকতে হবে। সপ্তম, তোমাকে ভগবানের দাস হয় যেতে হবে। অষ্টম ভগবানের সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। নবম, নিজেকে শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে হবে। এই আত্মনিবেদন দ্বারা কী হবে? তুমি হবে ভগবানের, ভগবান হবেন তোমার। এতে কিছু সংশয় নেই। গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন –

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ। (গীতা ৯/৩৪)

অনুবাদ ঃ তুমি মদগতচিত্ত হও, আমার ভজনশীল ও পূজনশীল হও এবং কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে মন ও বুদ্ধি সমাহিত করলে আমাকেই লাভ করবে।

অর্থাৎ শ্রীভগবান নিজমুখে বলেছেন, তুমি মদ্‌গত চিত্ত হয়ে গেলেই আমাকে

লাভ করবে অর্থাৎ আমি তোমার হয়ে যাব। দেখো ভাই সিংগী, শ্রীভগবান গীতাশাস্ত্রে মানুষকে কত আশ্বাস বাণী দিয়েছেন। তবুও মানুষ এমনই বেইমান যে তাঁকে ভালবাসে না।

পিতা ঃ মহারাজ, আপনি কাশীধামে যাবেন। এখন একটা ভাল সুযোগ মিলেছে। এখন আপনি জটা কেটে ফেলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করুন। আপনার জটা খুব ভারি হয়ে গেছে। আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আমাদের খুব সুবিধে হবে। আপনি ব্রহ্মচারী হয়ে বসে আছেন, তাই আমরা আপনার সেবা করতে পারছি না। আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলে, আমরা নিজেদের হাতে আপনার সেবা করব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না ভাই সিংহী, আমি তো এরকম সন্ন্যাস নেব না। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি, তবে আমি একদম 'কাষ্ঠ সন্ন্যাস' গ্রহণ করব। কাষ্ঠ সন্ন্যাস গ্রহণ করলে আমার সেবা তুমি কী করে করবে?

পিতা ঃ মহারাজ, কাষ্ঠ সন্ন্যাস কী রকম হয়ে থাকে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কাষ্ঠ সন্ন্যাস হল যে, একদম কাঠের মতো পড়ে থাকতে হবে। আমি যদি সন্ন্যাস নিই, তাহলে আমি এরকম সন্ন্যাসই নেব। কুশ বিছিয়ে তার উপর একেবারে দিগম্বর হয়ে পড়ে থাকবো। শরীরের উপর কোন আচ্ছাদন রাখবো না, কারোর সাথে দেখা করব না, কারোর সঙ্গে কথা বলব না, একেবারে মৌন হয়ে থাকবো। কিছু আহার গ্রহণ করব না। জোর করে মুখে কিছু গুঁজে দিলে তা গিলব না।

পিতা ঃ মহারাজ, এরকম সন্ন্যাস নিলে শরীর ধারণ হবে তো?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কিছুদিন শরীর থাকে, কিন্তু বেশি দিন শরীর থাকে না। অন্নময় কোষ, স্থূল শরীর অন্নজল ছাড়া বেশিদিন থাকে না। দেখো বাছা সিংগী, এরকম সন্ন্যাস তুমি যদি নিতে বল, তাহলে আমি নেব, আমি সাধারণ সন্ন্যাস নেব না।

একথা শুনে আমার পিতা বালকের ন্যায় কাঁদতে লাগলেন। অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষস্থল ভেসে যেতে লাগল। বড়ো দুর্দিনের কথা স্মরণ করে ব্যাকুল চিত্তে তিনি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের দয়ার্দ্র কোমল করুণ নয়নের ওপর দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলেন –

পিতা ঃ মহারাজ, আপনি যে সন্ন্যাসের কথা বললেন, তা আমি বুঝে গেছি। এখন এরকম কথা আপনি আমাকে আর শোনাবেন না। আমরা ধর্ম জগতের বিষয়ে এখন পর্যন্ত শিশুমাত্র। আপনি আমাদের ধর্মপিতা। আপনি এই ধরণের সন্ন্যাস

নেবার সংকল্প এখন ছেড়ে দিন। মহারাজ, আপনার স্থূল শরীর যেখানে রাখবেন, আমাদের কাছে ওই স্থান পরমতীর্থে পরিণত হবে। আপনি কাশীধামে শরীর ত্যাগের সংকল্প করেছেন?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ স্থূল শরীর রাখবার পক্ষে দুটি স্থান প্রশস্ত। এক হল - গঙ্গাতীর অথবা পর্বত শিখর।

পঞ্চম পর্ব

স্থান ঃ করণীবাদ শিবমন্দির, ১৩২২ সাল ঃ আষাঢ় মাস, সময় ঃ বিকেল

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[শ্রীগুরুদেব হলেন কৃপার আধার, অগতির গতি আর নিরুপায়ের উপায় ঃ গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করতে নেই, গুরু গৃহী হলেও তাঁকে যথার্থ ভক্তি করতে পারলে শিষ্যের কল্যাণ হবেই, এ সম্পর্কে গুরুশিষ্যের একটি গল্প : নিষ্ঠাসহ ভক্তিপূর্বক সাধনা করলে তার ভাল ফল মিলবেই, এ সম্পর্কে শিঙ্গাপষ্টীর গল্প ঃ গুরুদেবকে ভালবাসবে কিন্তু তাঁর আশ্রম ও আশ্রিতজনদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করব, এটা ঠিক নয় ঃ সংসারে থেকেও ধর্মলাভ হয়, তারজন্য ভগবানের সঙ্গে প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও মিথ্যে নয়, সত্যের আশ্রয় নিতেই হবে, তবেই হবে উন্নতি। ক্রোধকে সব সময় দমন করা যায় না, তখন কী করা উচিত? ফোঁস করবে, তবে কামড়াবে না ঃ লোভকে কী করে জব্দ করা যায় – এ সম্পর্কে লোভী হাড়ের গল্প ঃ খাওয়ার ব্যাপারে লোভ পরাস্ত হয় ঃ কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগীর কাছে পরাস্ত হয়ে যায় ঃ ষড় রিপু তথা দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কৌশল করে জয় করতে হবে, এ সম্পর্কে একটি গল্প ঃ জ্ঞানী বিচার করে, যোগী চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে, কর্মী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আর ভক্ত ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করে মনকে ইন্দ্রিয়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না – ললিতা দেবীর উপাখ্যানের মাধ্যমে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ দূরীকরণ ঃ ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রধান উপায় হল বিশ্বাস, এ সম্পর্কে বিশ্বাসী ভক্তের গল্প ঃ ঈশ্বরকে পাবার জন্য দরকার ব্যাকুলতা ঃ পাগল পণ্ডিতের মুখে 'বালানন্দ' নামের অন্তর্নিহিত অর্থ ঃ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক একটি ভজনগীত পরিবেশন।]

ভূমিকা ঃ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গুরু মহারাজের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন বৈদ্যবাটীতে গঙ্গার কূলে তার বিরাট দোতলা বাড়ি। এই বাড়িতে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ অনেকবার আতিথ্য স্বীকার করে ২/৪ রাত্রি বসবাস করেছিলেন। ওই সময় কলকাতা থেকে বহু ভক্ত বাঙালিবাবুগণ সপরিবারে মহারাজকে দর্শন করতে আসতেন। হরিপদবাবু সকল ভক্তদের বহু সমাদরে পান ভোজন করাতেন এবং তারা যাতে মহারাজের সাথে সৎসঙ্গ করতে পান, তার ব্যবস্থা করে দিতেন। মহারাজকে উপলক্ষ্য করে ওই সময় তিনি বহু ব্যক্তির সেবা যত্ন করতে পেরে জীবনের সার্থকতা লাভ করেছিলেন। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সোনার ব্যবসায়ী ছিলেন, অন্ন সংস্থানের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব হয়েও সোনার ব্যবসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঈশ্বর

এবং গুরুতে তাঁর যথেষ্ট প্রেম ভক্তি ছিল। তিনি দেওঘরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে দর্শন করতে এসে সৎসঙ্গ করছেন।

হরি ঃ মহারাজ, আপনার চরণযুগল কেন আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, আপনার চরণ তো আমাদের জন্য, আমরা আপনার চরণের উপর মাথা নত করব। আপনার চরণের আচ্ছাদন মেনে নেব না।

একথা শুনে শ্রীগুরুমহারাজ হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন –

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই, তোমরা তো ডাকাত আছ, আমার চরণের উপর ডাকাতি করবে?

হরি ঃ মহারাজ, আপনার একথার কী তাৎপর্য তা বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তোমাকে বুঝিয়ে দেব। দেখো, গোমাতাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করে থাকি। গাভীমাতাকে শুকনো তৃণ খাইয়ে থাকি আর তার দুধ বের করে নি। দেখো, শুকনো তৃণ তাকে দিয়ে অমৃত বের করে নিয়ে থাকি। ঠিক সে রকম গৃহস্থগণ সাধুগণকে ব্যবহার করে থাকে। গৃহস্থগণ সাধুর কাছে এসে চরণের উপর একটা ফুল আর একটা ফল দেয় আর সাধুর সাধনলব্ধ যে সাত্ত্বিকী বৃত্তি তা তাঁর চরণের উপর মাথা রেখে টেনে তুলে নেয়। একে তুমি কী বলবে? ডাকাতি বলবে তো? তোমরা তো ডাকাত, আমার পায়ের উপর ডাকাতি করছো, জোর করে আমার সাধনলব্ধ সাত্ত্বিকী বৃত্তি ছিনিয়ে নিচ্ছ।

হরি ঃ না না মহারাজ, আমরা ডাকাত নই। আমরা আপনার কৃপাপাত্র হয়ে আছি। আপনি হলেন কৃপাধার। আপনি কৃপা করে আমাদের চরণ কমল দিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের কল্যাণের আর কোন উপায় নেই। মহারাজ, আপনি একজন সাধারণ গুরু নয়, আপনি হলেন নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি করে দেন। যার পুঁজি আছে তার তো গতি হয়েই থাকে, কিন্তু যার পুঁজি নেই অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বৃত্তি নেই, তারও আপনি নিজের পুঁজি দিয়ে অর্থাৎ নিজের সাধনালব্ধ বৃত্তি দিয়ে তাকে উদ্ধারের রাস্তা করে দেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হরিপদ, এ কথা তো তোমার ভক্তির কথা।

হরি ঃ মহারাজ, গুরু পাদপদ্মে ভক্তি করলে শিষ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে। গুরু, মন্ত্র, ইষ্ট – এই তিনটি বস্তু এক করবার জন্য শাস্ত্র নির্দেশ করেছেন। যে ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের উপর মনুষ্য বুদ্ধি নিয়ে আসবে, তাকে নরকগামী হতে হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই শাস্ত্রকার এরকমই নির্দেশ করে গেছেন। বহুলোক আমার

কাছে এসে থাকে। তারা বলে, বাবা, আমাদের গুরু গৃহী, তাঁকে আমরা কী করে ভক্তি করবো, তাঁর মধ্যে কী করে ঈশ্বরবুদ্ধি নিয়ে আসবো? আমাদের গুরুদেব ভালো নয়, এসব কথা শুনে আমি হাসতে থাকি, আর তাদের বলি, বাবু আমাদের গুরুদেব ভালো নয়। এতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমরা ওই গুরুদেবকে ভক্তি করে গেলে তাঁর গতি যাই হোক কিন্তু শিষ্যের কল্যাণ অবশ্যই হবে। এ সম্পর্কে এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

গুরুশিষ্যের গল্প

এক অজ্ঞানী ব্যক্তি গুরুপদ লাভ করল। দু চারজন শিষ্যও তার জুটে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুদেবকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। একবার ওই শিষ্য গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছে। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে একদিন তারা এক নদীর ধারে এসে পৌঁছল। গুরু শিষ্য দুজনেই চিন্তা করলে লাগল, কী করে নদী পার হব। শিষ্য চিন্তা করল, গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করে আমাকে তো ভবসমুদ্র পার হতে হবে, তাঁরই পাদপদ্ম স্মরণ করে তাহলে কেন এই সামান্য নদীটা পার হতে পারব না। অবশ্যই পারব। এই দৃঢ় সংকল্প করে শিষ্য চোখ বুঁজে তার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করল, চিত্ত স্থির হওয়ার ফলে তার শরীরস্থ বায়ু স্থির হয়ে গেল। বায়ু স্থির হওয়ায় তার শরীরও সেই সঙ্গে এত হালকা হয়ে গেল যে, সে 'জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব' বলতে বলতে অনায়াসে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছল।

ওপারে গিয়ে শিষ্য গুরুদেবকে ডাকতে লাগল, 'গুরুদেব, আপনি তাড়াতাড়ি এপারে চলে আসুন।' জ্ঞানহীন গুরু ভাবল, আমার নামের এমনই মহিমা যে আমার নাম নিয়ে শিষ্য জলের ওপর হেঁটে নদী পার হয়ে গেল। এই ভেবে গুরু জলে নেমে 'জয় আমি জয় আমি' বলে এগিয়ে যেতে লাগল। গুরু যতই এগোয় ততই সে গভীর জলে ডুবে যেতে লাগল। গুরু তখন শিষ্যকে ডাক দিয়ে বলল, 'তুমি তো আমার নাম নিয়ে নদী বেশ পার হয়ে গেলে, কিন্তু আমার নাম নিয়ে আমি যে জলে ডুবে যাচ্ছি।' শিষ্য দেখল গুরুদেব অগাধ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন সে আগেকার মতো শরীরের বায়ুকে স্থির করে গুরুর নাম নিয়ে গুরুর কাছে এগিয়ে গেল এবং তাকে উদ্ধার করে ওপারে এনে তুলল এবং সুস্থ করল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই হরিপদ, এই গল্পের সিদ্ধান্ত কী হল? সিদ্ধান্ত হল যে, গুরু যেমনই হোক, কিন্তু গুরুভক্ত শিষ্যের কল্যাণ হবেই হবে। ভক্তি এমনই জিনিস।

ভক্তি যে ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হবে তার ফল মিলে যাবে। ভক্তির আর এক দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল, তা তোমাকে শোনাচ্ছি।

শিঙ্গাপন্থীর গল্প ঃ

এক সাধু গঙ্গার তীরে কুটীর বানিয়ে সাধন ভজনে দিন কাটাতে লাগলেন। কিছুদিন সাধনভজনের পর দলে দলে লোক এসে তাঁকে বিরক্ত করতে লাগল। কেউ বলে দীক্ষা দাও, কেউ বলে আমার উদ্ধারের পথ বাতলে দাও। নানা জনের নানান আবদারে অতিষ্ট হয়ে সাধু তাঁর কুটীরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরের লোকজনে সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎও বন্ধ হয়ে গেল। সাধু যখন প্রাতঃকৃত্যের জন্য কুটীর থেকে বেরোতেন তখন এক ব্যক্তি সেই সময় তাঁকে প্রতিদিন অনুসরণ করে বলত 'হে গুরুদেব, আমাকে দীক্ষা দিন, আমি আপনার কাছ থেকে মন্ত্র নেব, আপনাকে ছাড়া আমি কাউকে জানি না, আপনার শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা।' রোজ এই কথা শুনতে শুনতে সাধু একদিন মহাবিরক্ত হয়ে ক্রোধপূর্বক বলে উঠলেন, 'যা তুই শিঙ্গ শিঙ্গ' জপ কর।'

ওই ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শিঙ্গ শিঙ্গ জপ করতে করতে সিদ্ধিলাভ করল। এই সিদ্ধপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়ে বহুজন শিষ্য হয়ে গেল। তারাই ক্রমে সিঙ্গাপন্থী সম্প্রদায় নামে এ দেশে পরিচিত হয়ে উঠল। এখন পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের সাধু এদেশে আছেন।

দেখো ভাই হরিপদ, এই গল্পের তাৎপর্য কী হল? তাৎপর্য হল এই যে, ভক্তিপূর্বক যে নাম নিয়ে সাধনা করবে, তার ফল মিলে যাবে।

হরি ঃ মহারাজ, আপনাকে আমি খুবই ভক্তি করে থাকি। কিন্তু আপনার আশ্রমের উপর আমি খুব বিরক্ত। এই যে এখানকার বিদ্যার্থীরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাঠ মুখস্থ করছে, এতে আমার খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর উত্তর আমি শীঘ্রই দিচ্ছি।

ওই স্থানে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি পুত্র তপোনাথ এবং কাশীনাথ বসেছিল। গুরুমহারাজ পুত্র দুটির উপর দৃষ্টিপাত করে কপট বিরক্তি প্রকাশপূর্বক বলতে লাগলেন – তপোনাথ, কাশীনাথ তোমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাও, আমি তোমাদের পিতাকে ভালবাসি। তোমাদের দেখলে আমার খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ওঠো, ওঠো, তোমরা শীঘ্রই এখান থেকে চলে যাও।

এই কথাগুলি বলে হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দিকে চেয়ে মহান উপদেষ্টা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ মধুর ভাবে হেসে বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, তুমি যে কথা বললে সেকথা ঠিক নয়। তুমি আমাকে ভালবাসবে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করবে, কিন্তু আমার আশ্রমবাসীদের ভালবাসবে না, এটা কী রকম কথা হল। যে আমাকে ভালবাসবে, সে আমার আশ্রমকে ভালবাসবে, আশ্রমবাসীদেরও ভালবাসবে। তবেই ঠিক হবে। যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে, সে ব্যক্তি আমার আশ্রম তো দূরের কথা, আমার কুকুরকেও পর্যন্ত ভালবাসবে। দেখো ভাই হরিপদ, আমি যদি বলি আমি তোমাকে ভালবাসি কিন্তু তোমার ছেলেদের ভালবাসিনা, তাদের এখান থেকে বিদায় করো, তখন তোমার মনের অবস্থা কেমন হবে? আর কি তোমার মন এখানে টিকবে? দেখো বাছা, নিজের প্রাণ যে ব্যবহার পেতে চায়, অপরের প্রতিও সেইরকম ব্যবহার করতে হয়। তোমার যেমন ছেলে, আমার তেমনি শিষ্য। তোমার ছেলে যেমন তোমার প্রিয় আমার শিষ্যরা, আমার আশ্রিত বিদ্যার্থীরা তেমনি আমার প্রিয়।

একটা কথা তোমাকে আমি বলছি, এই কথাটা তুমি ভালো করে মনে রাখবে কথাটা হল –

যো ব্যবহার আপ্না প্রাণ চাহ্তা
ওহি ব্যবহার অপর ব্যক্তিসে কর্না।

অর্থাৎ, তুমি অপরের কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা কর, অপরের প্রতিও তেমনি ব্যবহার তোমাকে করতে হবে।

এই কথাটি সাধারণ কথা নয়, এটি অমূল্য বাক্য। যে ব্যক্তি এটি পালন করবে তার মহান কল্যাণ সাধন হবে।

হরি ঃ আপনার উপদেশ অতি মূল্যবান অর্থাৎ এমন উপদেশ যার মূল্য নির্ণয় করা যায় না। আপনার উপদেশ পালন করে গেলে মানুষের ইহলোক, পরলোক দুলোকেরই কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে। এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনি ওই প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলে আমার চিত্ত সুস্থ হয়ে যাবে। মহারাজ, আমি একজন ব্যবসায়ী। আমাকে তো মিথ্যে কথা বলতে হয়। মিথ্যে না বললে ব্যবসার উন্নতি হবে না। এক টাকার মাল কিন্তু খদ্দেরকে বলতে হয় পাঁচ সিকে দিয়ে কিনেছি। ওই খরিদ্দার পাঁচ সিকে দিয়ে কিনে নিল। তাতে আমার এক সিকি লাভ হল। এতে কি আমার পাপ হচ্ছে না? আমার এই সংশয় আপনি নাশ করুন।

শ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, হরিপদ, একটি দোঁহার মাধ্যমে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবো।

সত্তীয়া সং মাত ছোড়িয়ো।
সং ছোড়ে পথ যায়।
সং কি বাঁদি লছমী।
ফির মিলেগি আয়।

অনুবাদ – হে সত্য পথের পথিক, তুমি সত্যকে ছেড়ো না, সত্যকে না ছাড়লে অবশ্য আপাততঃ তোমার পথ বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার উপার্জন কম হবে, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সত্যের বাঁদি অর্থাৎ ঝি, বাঁদি তার প্রভুকে ছেড়ে আর যাবে কোথায়, আবার এসে প্রভুর চরণতলে নিশ্চয় মিলিত হবে।

দেখো ভাই হরিপদ, এই দোঁহা থেকে কী নিশ্চয় হল? নিশ্চয় হল যে, সত্যবাদী কখনো আপন সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। সত্যের পথ আঁকড়ে ধরে থাকলে আপাতত লক্ষ্মীর দেখা না পেতে পারো, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কিছু পরে লক্ষ্মীদেবীকে আসতেই হবে, কারণ লক্ষ্মীদেবী হলেন সত্যদেবের বাঁদী। বাঁদী প্রভুকে ছেড়ে যাবে কোথায়? হয়তো কিছু দেরী হতে পারে। কিন্তু তাকে আসতেই হবে, প্রভুকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। তুমি সত্যদেবকে ধরে থাকো, সত্যদেবের বাঁদী লক্ষ্মীদেবী ফের আপনিই এসে যাবেন। দেখো ভাই হরিপদ, এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলল তো?

হরি ঃ মহারাজ, আমার প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে। আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি হল – গৃহস্থ আশ্রমের ভিতরে কী ধর্মকর্ম হয় না?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ অবশ্যই হয়ে থাকে। কেন হবে না। তিন আশ্রমকে প্রতিপালন করে গৃহস্থ আশ্রম। দেখো ব্রহ্মচর্য আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম আর সন্ন্যাস আশ্রম – এই তিন আশ্রমে যারা রয়েছে, তারা তো রোজগার কিছু করে না। তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে কীভাবে? তাদের খাওয়া পরার দায়দায়িত্ব সব কিছু গৃহস্থ আশ্রমই বহন করে। এইজন্যই এই তিন আশ্রমের পুণ্যের কিছু কিছু অংশ গৃহীদের আপনা থেকেই মিলে যায়। এই তো গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, যে কোন আশ্রমের মানুষই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা হল ভগবানকে জানা বা ভালবাসা। ভগবানকে যে প্রীতি বা ভালবাসতে পারে, সেই হল ধার্মিক – সে জ্ঞানী, হোক, যোগী হোক, কর্মী হোক আর ভক্তই হোক। সে বাণপ্রস্থ আশ্রমের লোক হতে পারে, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের লোক হতে পারে, সন্ন্যাস আশ্রম বা গৃহস্থ আশ্রমের লোকও হতে পারে। দেখো ভাই হরিপদ, সব ধর্মের সার হল ধর্ম। ধর্ম হল ভগবানের সঙ্গে

প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।

ভগবানের সঙ্গে প্রীতি বা ভালবাসার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক - কারোর বাধা নেই, কারোর মানা নেই। যাগ যজ্ঞ হবণ পূজনাদি, বেদ অধ্যয়নাদি – এ সব ক্ষেত্রে সব মানুষের অধিকার নেই, কিন্তু প্রেমপূর্বক ঈশ্বরকে ডাকার অধিকার সব মানুষের আছে। দেখো, গুহ চণ্ডাল হয়েও প্রেমের প্রভাবে শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ভগবানের সাথে 'মিতালী' করে নেয়। দেখো বাছা হরিপদ, ভগবানের কাছে উচ্চ নীচ বলে কিছু নেই। যে ব্যক্তি ভগবানকে প্রেমপূর্বক একান্তভাবে ডাকবে, ভগবান তখন তারই হয়ে যান।

হরি ঃ মহারাজ, আপনার মধুর যুক্তিপূর্ণ উপদেশসমূহ শুনে খুবই আনন্দ পেলাম। মহারাজ, আমার আর একটি প্রশ্ন আছে – আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের সময় সময় ক্রোধ করতে হয়, কিন্তু শাস্ত্র বলছেন ঃ ক্রোধ করলে তোমার পাপ হবে। অথচ ক্রোধ না করলেও আমাদের চলবে না। এর কী উপায়, আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর একটা ভালো উপায় আছে। আমি তোমাকে এ বিষয়ে একটা গল্প বলছি।

'ফোঁস করবে কামড়াবে না'-র গল্প

একদিন নারদ ঋষি বীণা বাজিয়ে হরিনাম করতে করতে চলেছেন, এমন সময় একটা সাপ ফণা তুলে তাঁকে ছোবল মারতে এগিয়ে এল। তখন নারদ তাকে বলল, 'ওরে মূর্খ, তুই আমার উপর হঠাৎ রেগে গেলি কেন? তুই কি জানিস না, ক্রোধ যে করে তাকে নরকে যেতে হয়? তুই আমার কথা শোন, ক্রোধ ত্যাগ কর, তোর কল্যাণ হবে। নারদের কথা শুনে সাপের ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল, সে বলল, 'ঠাকুর, আমি তো ক্রোধের বশে অনেককেই যে কামড়েছি, তা হলে আমার কী গতি হবে?' আমাকেও কি তাহলে নরকে যেতে হবে?' নারদ বললেন, 'তোর কোন চিন্তা নেই, আমি তোকে হরিনাম মন্ত্র দিচ্ছি, সেই মন্ত্র তুই জপ করতে থাক, তাহলেই তোর সব পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।' নারদ সাপকে হরিনাম দিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন, দেখিস আর কারুর কোন অনিষ্ট করিস না।

নারদ চলে যাবার পর সাপ রাস্তার ধারে মড়ার মতো পড়ে রইল আর মনে মনে হরিনাম জপ করতে লাগল। এভাবে দু'চারদিন কেটে গেল। বাচ্ছা ছেলেরা একদিন খেলা করতে করতে সেখানে এসে দেখল, একটা সাপ মড়ার মতো পড়ে রয়েছে। সাপটা মড়া না জ্যান্ত তা ঠিক করতে না পেরে তারা কাঠি দিয়ে সাপটাকে খোঁচা

মারতে লাগল। সাপ সব কিছু সহ্য করে সে স্থির হয়ে পড়ে রইল। ছেলেরা দেখল, সাপটা মরেনি, অথচ তাদের দিকে তেড়ে আসছে না। তাই তাদের সাহস বেড়ে গেল। তখন কেউ তাকে খোঁচা মারতে থাকে, কেউ ঢ্যালা ছুড়ে মারে, কেউ বা তার ল্যাজ ধরে ঘুরপাক দিয়ে মাটিতে আছাড় দেয়। ছেলেদের এইসব অত্যাচারে সাপ ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ল। তখন বাঁচবার কোনো উপায় নাই দেখে অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে সে বনের আড়ালে চলে গেল।

বহুদিন পর নারদ একদিন সেখানে ফিরে এলেন। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে সাপ আবার রাস্তার ধারে চলে এল। নারদ কাছে এসে সাপের এই দুরবস্থা দেখে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত রোগা হয়ে গেলি কী করে?' সাপ বলল, 'তুমি তো আমাকে কারুর উপর ক্রোধ না করতে বলেছ, কাউকে কামড়াতে মানা করেছ। সেইজন্য ছেলের দল আমার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করেছে, তাই আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি।' সাপের কথা শুনে নারদ বললেন, 'তুই কী বোকা রে, আমি তোকে ক্রোধ করতে নিষেধ করেছি, কাউকে কামড়াতে বারণ করেছি, কিন্তু ভয় দেখাবার জন্য ফোঁস করতে তো বারণ করিনি। যা হোক, যা হবার তো হয়েছে, এখন থেকে তোর কাছে কেউ এলেই তুঁই ফোঁস করে উঠবি। তাতেই কেউ তোর কাছে আসতে সাহস করবে না।' এই কথা বলে নারদ চলে গেলেন। এরপর সাপকে দেখে ছেলেরা যেই জ্বালাতন করতে এল, সাপ তখন ফোঁস করে গর্জে উঠল, তখন ছেলেরা সব ভয়ে পালিয়ে গেল। ছেলেরা দেখল, সাপকে নিয়ে তাদের আর খেলা চলবে না, তখন তারা প্রাণের ভয়ে সাপের দিকে আসাই ছেড়ে দিল। এরপর সাপও নিশ্চিন্ত হয়ে একমনে ভগবানের নাম করতে লাগল।

দেখো ভাই হরিপদ এই গল্প থেকে কী নিশ্চয় হল। নিশ্চয় হল যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কারোর কোনো অনিষ্ট বা ক্ষতি কোরো না। কিন্তু নিজের কাজ চালিয়ে নেবার জন্য কপট ক্রোধ করতে হবে অর্থাৎ সাপের মতো একটু ফোঁস করতে হবে। ক্রোধের ভান করতে হবে, তা না হলে সংসারে চলা যায় না, লোকের কাছে মানও থাকে না। অতএব আমার উপদেশ হল সাপের মতো ফোঁস করবে কিন্তু কাউকে কামড়াবে না। এতে কী হবে? তোমার কার্য সিদ্ধি হবে, কোনো পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। বোঝার পক্ষে সুবিধা বলে দৃষ্টান্তমূলক গল্পটি তোমাকে বললাম। তাতে তোমার প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া হল।

কাম, ক্রোধ, লোভ – এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। এই তিন শত্রু থেকে

নিজেকে, বাঁচিয়ে চলবে। দেখো ভাই হরিপদ, ক্রোধের এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে বললাম। এখন লোভের এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি।

লোভী হাড়ের গল্প

এক রাজার কাছে এক সাধু ভিক্ষে করতে এসেছেন। সাধুর জ্যোতির্ময় রূপ দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে এসে বললেন, 'আপনি কী ভিক্ষে চান বলুন। আমি ভিক্ষে হিসাবে আপনাকে সমগ্র রাজত্ব দিতেও প্রস্তুত আছি।' সাধু বললেন, 'আমি সাধু, রাজত্বের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কাছে এই সামান্য একখানা হাড় রয়েছে, এর সমান ওজনের কিছু পেলেই আমি খুশি হব।' রাজা হাড়খানি দেখে হাসতে লাগলেন। তিনি বললেন, 'এর সমান ওজনের কী জিনিস হবে? আপনি বরং আমার কাছ থেকে বেশি করে কিছু নিয়ে যান।' সাধু তাতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'এই হাড়ের সমান ওজনের কিছু আমাকে দিন, তার বেশি আমি আর কিছু নেব না।'

দাঁড়িপাল্লার এক দিকে হাড়খানা রেখে অন্যদিকে রাজা তার রাজকোষের ধন রত্ন চাপাতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল, তবু ওজনে তা হাড়ের সমান হল না। হাড়খানা যেমন ছিল তেমনি নিচেই পড়ে রইল। পাত্র-মিত্র সবাইকে নিয়ে রাজা তখন দাঁড়িপাল্লায় উঠে বসলেন, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। রাজা তখন হাতজোড় করে সাধুকে বললেন, 'সাধুজী, আমি বুঝতে পারছি, আপনি কোনো সাধারণ সাধু নন। নিশ্চয় আপনি কোনো সিদ্ধপুরুষ। আমি আপনার কাছে হার স্বীকার করছি। দয়া করে আপনি বলুন কিসে আমার সংকল্প পূর্ণ হবে, কোন্ জিনিস দাঁড়িপাল্লায় চাপালে তা হাড়ের ওজনের সমান হবে।' সাধু একটু হেসে বললেন, 'হে রাজা, আপনি একটা কাজ করলেই কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আপনি কাউকে বলুন রান্নাঘরে গিয়ে খানিকটা ছাই নিয়ে আসতে।' রাজার হুকুমে একজন লোক দৌড়ে গিয়ে ছাই নিয়ে এল। খানিকটা ছাই নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে সাধু তা হাড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে লাগলেন আর দেখতে দেখতে হাড়ের দিকে পাল্লাটা উঠে গেল। তা দেখে সকল সভাসদ্‌সহ রাজা আবাক হয়ে গেলেন।

রাজা তখন সাধুকে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু এই অলৌকিক ব্যাপারের কী তাৎপর্য আপনি তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।' সাধু বললেন, 'রাজা এই যে হাড় দেখছ, এ হল লোভী হাড়, লোভ জিনিসটা অত্যন্ত খারাপ, তাকে তুমি যত জিনিসই দাও

না কেন, কিছুতেই তার পেট ভরাতে পারবে না। সে যত পাবে, ততই তার লোভ আরও বেড়ে যাবে। লোভকে শান্ত করার একমাত্র উপায় হল তার মুখে ছাই দেওয়া। সেজন্যই আমি এই লোভী হাড়ের মুখে ছাই দিয়ে দিলাম। দেখলে তো, তাতেই সে কেমন জব্দ হয়ে গেল, নইলে হাজার জিনিস দিয়েও তুমি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারতে না। দেখো রাজা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে নিতে আসিনি, এসেছি তোমাকে উপদেশ দিতে। লোভ যে কী ভয়ানক জিনিস এখন তো তা দেখলে, তাই বলছি লোভকে কখনও প্রশ্রয় দিও না। আমার এখানকার কাজ শেষ হল, এবার আমি আসি। এই বলে সাধু চলে গেলেন।

দেখো ভাই হরিপদ – কাম, ক্রোধ ও লোভ – এই তিনটি হল নরকের দ্বার। এই তিনটি বিষয়ে সাবধানে থাকবে। দেখো ভাই, এক জায়গায় লোভ পরাস্ত হয়ে যায়। ভোজনের ব্যাপারে তুমি যতই লোভী হও, তাকে পরাস্ত করে দিতে পারবে। পেটে যতটা ধরে ততটা উদরপূরণ হয়ে গেলে বলবে – না বাবা, আমার আর কিছুর দরকার নেই। জোর করে দিলে আমি তাহলে ফেলে দেব। বেশি খেলে খুব কষ্ট হয়। বেশি খেতে মানুষ পারে না। এ সম্পর্কে একটা কথা আছে।

অন্ন'র রোদনের গল্প ঃ

একবার অন্ন কাঁদতে কাঁদতে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলল, 'আমাকে সব মানুষ খেয়ে নিচ্ছে কিন্তু আমার খাবার কোনো বস্তু নেই।' ব্রহ্মা অন্নকে বললেন, 'আরে বাছা, তুমি কেঁদো না। আমি তোমাকে ভোজনের বস্তু বলে দিচ্ছি। যে ব্যক্তি তোমাকে বেশি করে খাবে, তুমি তাকে খেয়ে নেবে।'

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এই কারণে অন্ন বেশি করে খাওয়ার উপায় নেই। লোভ খাবার জায়গায় পরাস্ত হয়ে যায়। পেট ভরে গেলে মানুষ বলে দেয়, আমার পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আর চাই না।

হরি ঃ মহারাজ, কাম ক্রোধ লোভ – এই তিনটি নরকের দ্বার তা বুঝে গেলাম। কিন্তু এর থেকে বাঁচার উপায় কি তা বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, এর উপায় হল – 'ত্যাগ'। কাম, ক্রোধ, লোভ ত্যাগীর কাছে যেতে পারে না। ত্যাগীর এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

ত্যাগী সাধুর গল্প ঃ

এক রাজা সাধু সজ্জনদের খাওয়াতে খুব ভালবাসেন। খাওয়া শেষ হলে প্রত্যেককে তিনি দক্ষিণাসহ বিদায় দেন। একবার রাজার ইচ্ছে হল একদিন দেশ

বিদেশের সাধু সজ্জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের তিনি পেট ভরে লাড্ডু খাওয়াবেন এবং প্রতি লাড্ডুর জন্য একটি করে টাকা দক্ষিণা দেবেন। রাজার এই সংকল্পের কথা দেশ দেশান্তরে ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হল। সাধু সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা দলে দলে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হল। রাজা তখন এই সব অতিথিদের জন্য তাদের ইচ্ছেমতো লাড্ডু সরবরাহের আদেশ দিলেন।

প্রতিটি লাড্ডুর জন্য এক টাকা করে দক্ষিণা, এমন সৌভাগ্য তো কখনো হয় না। তাই লোভে পড়ে যে যত পারে একটার পর একটা লাড্ডু খেয়ে চলল, পেটে আর ধরে না, তবু খাওয়ার শেষ নেই।

এদের মধ্যে এক সাধু যৎসামান্য আহারের পর আচমন করে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। অনেক সাধ্য সাধনাতেও আর একটি লাড্ডুও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। রাজা নিজে এসে হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন, 'সাধুজী, আপনি দু চারটি লাড্ডু খান, প্রতি লাড্ডুর জন্য আপনার এক টাকা করে দক্ষিণা মিলবে।' সাধু বললেন, 'রাজামশাই, আমার আচমন হয়ে গেছে, আর তো আমার খাওয়া চলবে না।' রাজা বললেন, 'লাড্ডু প্রতি দশ টাকা আমি দক্ষিণা দিচ্ছি, আপনি আরও কটা লাড্ডু খান। 'সাধু বললেন, 'দশ টাকা কী বলছেন, আমার আচমন হয়ে গেছে, লাখ টাকা দিলেও আমি আর লাড্ডু খাব না।' রাজা তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, 'আপনি অন্ততঃ একটি লাড্ডু খান, আমি অর্ধেক রাজত্ব আপনাকে দক্ষিণা দেব।' সাধু এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন মিছে জ্বালাতন করছ, আমি বলেছি তো, আমার আচমন হয়ে গেছে, তোমার সারা রাজত্ব দিলেও লাড্ডুর একটা দানাও আর আমি মুখে দেব না।' রাজা তখন রেগে গিয়ে সাধুকে বললেন, 'দেখো সাধু, আমার মতো এমন দাতা তুমি কোথায় পাবে?' এবার সাধু হেসে ফেলে বললেন, 'রাজা, আমার মতো ত্যাগীও তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। তুমি দাতা হতে পারো, কিন্তু আমি হলাম ত্যাগী। তুমি নিজেকে দাতা বলে বড়াই করছ, কিন্তু এ বড়াই করা চলে কার কাছে? যে গ্রহণ করে তার কাছে। ত্যাগীর কাছে এ সব অহংকার শোভা পায় না।' এই বলে সাধু সেখান থেকে চলে গেলেন।

দেখো বাছা হরিপদ, এই গল্প থেকে শিক্ষা হল যে, ত্যাগের কাছে লোভ পরাস্ত হয়ে গেল। এইভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি বস্তু ত্যাগীর কাছে পরাস্ত হয়ে যায়, এই তিনটি বস্তু ত্যাগীর কাছে ঘেঁষতে পারে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য – ষড়রিপু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ঋষি ঃ মহারাজ, এই ছটি প্রবল শত্রুর সাথে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে। এক প্রবল শত্রুকেই জয় করতে পারি না, ছয় শত্রুকে কীভাবে পরাজিত করব? আপনি বলেছেন – ত্যাগীর কাছে এই ষড়রিপু ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু আমরা তো আর ত্যাগী নই। তাহলে আমাদের কী গতি হবে? এক ধারে রয়েছে ষড়রিপু আবার অন্যদিকে রয়েছে দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ যারা বিষয়ের দিকে মনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এদের হাত থেকে কী করে বাঁচব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এসবের থেকে নিজেকে বাঁচাবার কৌশল করতে হবে। এইজন্যে বলা হয়েছে – 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। (গীতা)'

পরমাত্মার সঙ্গে মিলে যাবার উপায় হল যোগ। এই যোগ-বিঘ্নকারী ষড়রিপু আর ইন্দ্রিয়গণকে কৌশলপূর্বক বশীভূত করতে হবে। এইসব শত্রুদের বল প্রয়োগ করলে তোমার কল্যাণ হবে না। এই সম্পর্কে একটি গল্প আমার মনে পড়েছে, গল্পটি তোমাকে শোনাচ্ছি। এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুনে তোমার দৃশ্য পদার্থের ভাব সহজবোধ্য হয়ে যাবে –

দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে কৌশলপূর্বক বশীভূত করার গল্প

এক ব্রাহ্মণ বনের পথ ধরে চলতে চলতে দেখতে পেল এক বিরাট সিংহ খাঁচায় বন্দী হয়ে রয়েছে। সিংহ ব্রাহ্মণকে দেখে কাতর স্বরে বলল, "হে ব্রাহ্মণ, দয়া করে আমাকে প্রাণে বাঁচাও, চিরকাল আমি তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।" প্রাণের ভয়ে ব্রাহ্মণ কাছে না গিয়ে দূর থেকেই সিংহকে বলল, "আমি খাঁচা খুলে তোমাকে বের করে দিলেই তো তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে। তাই আমি খাঁচা খুলতে পারব না," সিংহ বলল, "হে ব্রাহ্মণ, এ কখনো হতে পারে না। তুমি আমার ভালো করবে, প্রাণ বাঁচাবে আর আমি তোমার মন্দ করব?" আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না।"

নিরীহ ব্রাহ্মণ ভাবল, সিংহ যখন প্রতিজ্ঞা করছে তখন নিশ্চয় সে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে না এবং আমার কোনো ক্ষতি করবে না এই ভেবে সে কাছে গিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিল। জাতের স্বভাব যাবে কোথায়? খাঁচা থেকে বেরিয়েই সিংহ ভীষণ গর্জন করে ব্রাহ্মণকে বলল, "আমি অনেকদিন অনাহারে রয়েছি, আমি ক্ষুধার্ত। আহারের সন্ধানে এখন আমি কোথায় ঘুরে মরব, তার চেয়ে তুমি যখন সামনেই রয়েছ, আর তোমার সঙ্গে আমার যখন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, তখন তোমাকে খেয়েই আমার পেট ভরানো যাক্।" ব্রাহ্মণ তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহকে বলল,

"সিংহ ভাই, আমি তোমার উপকার করলাম আর তুমি আমার অনিষ্ট করবে?" সিংহ বলল, "এটাই তো সংসারের রীতি। সংসারের কেউ কারুর ভালো করলে উল্টে সে তার অপকারই করে।" ব্রাহ্মণ বলল, "তোমার এ কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি তিনজনকে সাক্ষী মানতে চাই। সাক্ষীরা যদি বলে, তোমার কথাই ঠিক, তখন না হয় তুমি আমাকে খেয়ো।"

ব্রাহ্মণ আর সিংহ দুজনে একটা গাছের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ গাছকে জিজ্ঞাসা করল, "ওহে গাছ, তুমি বল দেখি কেউ যদি কারুর উপকার করে তাহলে সে কি কখনো তার অনিষ্ট করতে পারে? গাছ হেসে বলল, "হ্যাঁ ভাই, সংসারের নিয়মই তো তাই। এই আমাকে দেখো না, মানুষের কত উপকার আমি করছি। তাদের আমি ফুল দিই, ছায়া দিয়ে, রোদের তাপ থেকে তাদের বাঁচাই, আর তার বদলে বেইমান মানুষ আমার সঙ্গে কি নিষ্ঠুর ব্যবহারই না করে। তারা আমার ডাল ভাঙে, নির্মমভাবে কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে আমায় কত কষ্ট দেয়, তা আর কী বলব। তাহলে বুঝে দেখো, সংসারে কারুর ভালো করতে গেলে মন্দটাই পেতে হয়।" গাছের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিংহ বলে উঠল, "দেখলে তো ঠাকুর আমার কথা ঠিক কিনা, এবার তাহলে তোমাকে খেতে পারি?" ব্রাহ্মণ বলল, "এখনো দুজনের সাক্ষী বাকি আছে। তুমি আর একটু অপেক্ষা করো"।

এবার তারা গেল এক সরোবরের কাছে। ব্রাহ্মণ সরোবরকে সেই একই প্রশ্ন করলে সরোবর বলল, "দেখো, আমার জলে স্নান করে মানুষ আরাম পায়, শরীর ঠাণ্ডা রাখে, আমার জল খেয়ে প্রাণে বাঁচে অথচ সেই আমারই জলে যত আবর্জনা ফেলে মল-মূত্র ধুয়ে আমার জলকে নোংরা করে তুলছে।" সিংহ বলল, "ঠাকুর এখন আমার কথা বিশ্বাস হল তো?" ব্রাহ্মণ বলল, "এখনও একজন সাক্ষী বাকি রয়েছে, সে তোমার কথায় সায় দিলেই তুমি আমাকে খেতে পারবে।"

এবার তারা এক শেয়ালের কাছে গেল। ব্রাহ্মণ আর সিংহের থেকে সব ব্যাপারটা শুনে শেয়াল ব্রাহ্মণকে বলল, "ঠাকুর মশাই, আপনার প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেব, কিন্তু আপনি সামান্য মানুষ হয়ে পশুরাজ সিংহকে উদ্ধার করেছেন, এটাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি যদি আমায় দেখিয়ে দিতে পারেন সিংহ কীভাবে বন্দী হয়ে খাঁচার মধ্যে ছিল, কীভাবেই বা আপনি তাকে উদ্ধার করলেন, তবেই আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করতে পারি, নইলে নয়।"

শেয়ালের কথা শুনে তিনজনেই তখন খাঁচার কাছে গেল। দেখে শেয়াল বলল,

"এ যে অসম্ভব ব্যাপার দেখছি। এতটুকু খাঁচায় পশুরাজের অতবড়ো দেহখানা ঢুকতে পারে, সেটাই তো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।" শেয়ালের বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে সিংহ খাঁচার মধ্যে ঢুকে শেয়ালকে বলল, "এই দেখো, এইভাবে আমি বন্দী ছিলাম।" শেয়াল বলল, খাঁচার দরজা তো বন্ধ হয় না দেখছি, তবে বন্দী ছিলে বলছ কী করে? সিংহ তখন ব্রাহ্মণকে বলল, "তুমি একবার দরজাটা বন্ধ করে শেয়ালকে দেখিয়ে দাও তো যে সত্যিই আমি বন্দী ছিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল। শেয়াল তখন ব্রাহ্মণকে বলল, "ঠাকুর মশাই, আপনি এত বোকা! আপনার জানা উচিত ছিল যে সিংহ আপনার যজমান নয় যে আপনি তাকে যা বলবেন সে তাই শুনবে। আপনি খুব জোর বেঁচে গেলেন। যান, এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যান।"

দেখো ভাই হরিপদ, সিংহ এত বলশালী হয়েও ক্ষুদ্র শৃগালের কাছে পরাজিত হয়ে গেল। সিংহরূপী দুর্দান্ত ইন্দ্রিয় মানুষের সৎবৃত্তিরূপী ব্রাহ্মণকে খেয়ে নিচ্ছে এমন সময় মন বুদ্ধিরূপী শৃগাল কৌশলপূর্বক দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়রূপী সিংহকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে দিল, সৎবৃত্তিরূপ ব্রাহ্মণকে আত্মানন্দরূপ ঘরে পৌঁছে দিল। দেখো ভাই হরিপদ, ইন্দ্রিয়গুলি দুর্দান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের কৌশল করে জয় করতে হবে। তার মানে এই নয় যে ইন্দ্রিয়দের নষ্ট করে ফেলতে হবে। নষ্ট না করে তাদের নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হয়। দেখো বাছা হরিপদ, জ্ঞানী বিচারের দ্বারা বিষয়ের মধ্যে দোষ দেখিয়ে ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে, যোগী যোগের পথে ইন্দ্রিয়দের বশীভূত করে তাদের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে, কর্মী নিষ্কাম ক্রিয়াকাণ্ডের সহায়তায় ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে। ভক্ত প্রেমিক ভগবানের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করেই ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে।

হরি ঃ মহারাজ, আপনার মুখরাবিন্দ থেকে অমৃতস্বরূপ উপদেশসমূহে নিঃসরণ হচ্ছে। চার প্রকার ব্যক্তি চার প্রকার পন্থা অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয়দের নিয়মাবদ্ধ করে রাখে। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ বাছা, শ্রোতার উৎসাহ দেখে বক্তার বলবার উৎসাহ হচ্ছে। 'জ্ঞানী' কীভাবে বিষয়ের দোষ দেখায়? মন তো সব সময় বিষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। রসনা ইন্দ্রিয়টি তো সর্বদাই সুমিষ্ট আহারের দিকে মনকে টানছে। জ্ঞানী ব্যক্তি তখন মনকে বোঝাতে থাকে, তুমি জিভকে ভোগ্যবস্তু দিয়ে তৃপ্তি দিতে পারবে না। কতক্ষণ তৃপ্তি দেবে তাকে? ভালো ভালো খাদ্যবস্তু তাকে খাওয়াতে

পারো, কিন্তু তার স্বাদ থাকে কতক্ষণ? ওই গলা পর্যন্তই যা স্বাদ, গলা থেকে নেমে গেলেই তো স্বাদ ফুরিয়ে গেল, তখন পেটের মধ্যে গিয়ে সেই সুখাদ্য দুর্গন্ধ বিষ্ঠার সৃষ্টি করবে। এই হল প্রথম বিচার।

দ্বিতীয় কথা, 'ভোগে রোগ ভয়ম্'ভোগে রোগের ভয়। ভোগ বেশি মাত্রায় হলে রোগের সৃষ্টি করে। দেখো, একটি গাছের পাতা তুমি শুকিয়ে রেখে দাও, তা বহুদিন থাকবে, কিন্তু রসশুদ্ধ রাখতে পারবে না। অল্প সময়েই তা পচে যাবে। তেমনি এই শরীরের ইন্দ্রিয়দেরও বিষয়রস থেকে বাঁচিয়ে শুকনো পাতার মতো রেখে দিতে হয়, তাতে তারা অনেকদিন সুস্থ থাকবে। আর তাদের যদি বিষয়রসের মধ্যে ফেলে রাখো, তাহলে তারা পচে উঠবে ও দ্রুত মরণের দিকে তারা তোমায় তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অপরূপ সুন্দরী কোনো নারীকে দেখেছে কি অমনি চক্ষু ইন্দ্রিয় মনকে সেদিকে টানতে থাকবে। জ্ঞানী তখন মনকে বোঝাতে থাকবে, সুন্দরী নারীকে দেখে অত মুগ্ধ হচ্ছ কেন? যে এত সুন্দরী তারও দেহ একদিন চিতাভস্মে বিলীন হয়ে যাবে। সুন্দরী নারীর মধ্যে আছেই বা কী? রক্ত, মাংস, হাড়, চামড়া– এগুলোকে তুমি আলাদা আলাদা করে দেখো তো? দেখলে তোমার মনে ঘৃণা জাগবে। প্রতিটি ইন্দ্রিয়দ্বার থেকে এভাবে বিচার করে জ্ঞানী মনকে বিষয় থেকে ঘুরিয়ে আনে। যোগী চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে মনকে দাবিয়ে তাকে নিজের আয়ত্তে নিয়মাবদ্ধ করে রাখে। কর্মী নিজের নিষ্কাম কর্মকাণ্ডের মধ্যে মনকে একদম ডুবিয়ে রেখে দেয়, মনের আর ইন্দ্রিয়ের দিকে যাবার ফুরসতই মেলে না। প্রেমিক ভক্ত ভগবানের সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করে মনকে ইন্দ্রিয়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। দেখো, এর এক ইতিহাস তোমাদের পুরাণে আছে, ওই গল্প আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি।

শ্রী ভগবান এবং বিদুর পত্নী

একদা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বিদুরের ঘরে গেলেন। বিদুর ঘরে ছিলেন না। কিছু কাজের জন্য বাইরে গেছেন। ভক্তিমতী বিদুর পত্নী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের চরণ কমলে প্রণাম নিবেদন করে প্রেম ভক্তি জ্ঞাপন করল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ঘরে অসায় বিদুর পত্নী তাঁর সেবা পূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বিদুর ছিল খুবই গরীব। তার ঘরে এমন কিছু মূল্যবান জিনিস নেই, যা দিয়ে ভগবানের সেবা ও পূজা করা যাবে। ঘরে শুধু একটা কলার কাঁদি ছিল। বিদুর পত্নী সেই কলাই ভগবানের কাছে নিয়ে এসে সেগুলি ছাড়িয়ে কলাগুলি ফেলে দিয়ে কলার খোসাগুলি ভগবানের মুখে পরম ভক্তিসহ দিতে লাগল আর ভগবানও অম্লানবদনে তা খেতে লাগলেন। এমন সময় বাইরে

থেকে বিদুর এসে পড়ল। ভগবান আর আপন পত্নীর প্রেমভাব দেখে বিদুর মুগ্ধ হয়ে গেল। বিদুর তার পত্নীকে বলল, আরে, আরে, তুমি এ কী করছ? কলাগুলি ফেলে দিয়ে কলার খোসাগুলি ভগবানকে খাওয়াচ্ছো? ভগবান হেসে বললেন, না না সখা, আমি কলার খোসা খাই নি। আমি তো আমার সখীর দেওয়া প্রীতি (ভালবাসা) ভক্ষণ করছি। আমি প্রেমকে খাচ্ছি। যে প্রেম প্রীতি ইন্দ্রিয় রহিত হয়ে থাকে, সেই প্রেম আমার অতি প্রিয়। যে প্রেম ইন্দ্রিয়যুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়ে থাকে তা আমি ভালবাসি না। দেখো সখা, আমার সখীর ভাব লক্ষ্য কর। কর্মেন্দ্রিয় হাত কী কাজ করছে তা সে জানে না। কোন্‌টা কলা, কোন্‌টা কলার খোসা চক্ষু জ্ঞানেন্দ্রিয়– সে-ও তা জানে না।। ভগবানকে কলা না খাইয়ে কলার খোসা খাওয়ানোর সময় তাহলে সখীর ইন্দ্রিয়সমূহ কোথায় গিয়েছিল? ইন্দ্রিয়সমূহ সেখানেই ছিল কিন্তু তারা সখীর প্রীতি প্রেমে একদম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই তারা বুঝতে পারেনি কোন্‌টা কলা আর কোন্‌টা কলার খোসা।

বিদুর বলল, হে সখা, তুমি কলার খোসা খেয়ে নিলে কেন, তোমার সখীকে কেন মনে করিয়ে দিলে না। ভগবান বললেন, সখী প্রেমে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল, তার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মন– এই একাদশ ইন্দ্রিয়সমূহ একদম প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সখীর ইন্দ্রিয় রহিত প্রেম দেখে আমিও মুগ্ধ হয়ে কলার খোসাই খেয়ে নিলাম। সখীকে আর মনে করালাম না।

দেখো ভাই হরিপদ, দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ প্রেমের কাছে কীভাবে পরাজিত হয়ে গেল। তোমাদের পুরাণের বিদুর পত্নীর উপাখ্যান থেকে বোঝা গেল যে পরমাত্মাদেব অনেক বুঝেসুজেই সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। দেখো, তিনি যেমন অগুনের সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাকে দমন করবার জন্য জলেরও সৃষ্টি করেছেন। প্রাণীর পেটে যেমন ক্ষুধার সৃষ্টি করছেন, তেমনি সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য নানারকম সুস্বাদু খাদ্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষের রোগ যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি ওষুধেরও ব্যবস্থা করেছেন।

দুর্দান্ত ইন্দ্রিয়গণ মদমত্ত হাতির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের প্রতিহত করবার মতো অঙ্কুশও তো ভগবান সৃষ্টি করেছেন। ওই অঙ্কুশের ব্যবহার মানুষ জানে না। ইন্দ্রিয় দমনের কথা শুনলেই তারা ভেবে নেয় ইন্দ্রিয়দের বুঝি উচ্ছেদ করে ফেলতে হবে। না না না তার কোন দরকার নেই। ইন্দ্রিয়দের পরমাত্মাদেবের সেবা কার্যে নিযুক্ত করে দাও। ভগবানের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হলেই সেই প্রেমে ইন্দ্রিয়রা আনন্দের সঙ্গে পরাজয় মেনে নেবে। দেখো ভাই হরিপদ, সবচেয়ে সুগম পন্থা

তোমাকে বলে দিলাম, এখন তুমি সেই পন্থা অবলম্বন করে এগিয়ে চল।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন নিবিষ্ট চিত্তে এই সকল উপদেশগুলি শুনেছিলেন তখন দুর্ভাগ্যক্রমে তার এক বিষম অন্তরায় এসে উপস্থিত হল। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের ম্যানেজার এলেন। মহারাজ উক্ত ম্যানেজারের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। প্রায় দু'ঘন্টা ধরে আলাপের পর ম্যানেজার মশাই চলে গেলেন। এতক্ষণ ধরে হরিপদ মশাই মলিন মুখে গুরু মহারাজের সৌমমূর্ত্তির পানে চেয়ে নিমেষশূন্য হয়ে বসে আছেন। সর্বজীবের সুহৃদ গুরু মহারাজ শিষ্য হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোব্যথা বুঝতে পেরে তাকে বললেন–

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আচ্ছা হরিপদ, তোমার মনে কিছু দুঃখ হয়েছে। তোমার মুখ কেন মলিন হয়ে গেছে?

হরি ঃ মহারাজ, আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি। ধনী ব্যক্তিকে নিয়ে আপনি এতক্ষণ ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এইজন্যে আমি মলিন হয়ে গিয়েছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, তোমাকে একটা ইতিহাস শোনাচ্ছি। তুমি ললিতার ইতিহাস জান কি?

হরি ঃ না মহারাজ, আমি ললিতার ইতিহাস জানি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তুমি জান না। আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। ওই ইতিহাস শ্রবণ করলে তোমার মনে যে দুঃখ হয়েছে তা চলে যাবে, দুঃখ আর থাকবে না।

ললিতা দেবীর উপাখ্যান

একদা বৃষভানু সুতা শ্রীমতী রাধা দরিদ্র গোপকন্যা শ্রমতী ললিতাদেবীকে বলল, 'সখী, তুমি কী জান শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কাকে বেশি ভালবাসেন?' তখন মলিন বদনে শুষ্ক কণ্ঠে ললিতা দেবী উত্তর দিল 'হ্যাঁ, সখী, আমি জানি বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধা দেবীকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।'

ললিতা দেবীর এই কথা শুনে শ্রীরাধাদেবীর খুব অহঙ্কার হল। অহঙ্কারপূর্বক শ্রীমতী রাধাদেবী সখীকে রেখে চলে গেলেন।

সর্ব অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বুঝতে পারলেন যে, রাধাদেবী ললিতাকে দুঃখ দিয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে গোপকন্যার কাছে এসে বললেন, 'তোমায় এত মলিন বদন দেখছি কেন? আমাকে বলতে হবে।' ললিতা বলল, 'হে ভগবান, আমার হৃদয় এখন পর্যন্ত নিঃস্বার্থ প্রীতি অর্থাৎ ভালবাসার উপযুক্ত হয়নি। রাধা দেবী আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সবচেয়ে কাকে বেশি ভালবাসেন?

আমি সত্য কথা বলে দিয়েছি। বলেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ [illegible] ধনীকে বেশি ভালবাসেন। এতে আমার দুঃখ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার অন্তঃকরণে স্বার্থ গন্ধ আছে। তাই আমার সত্য কথা বলার জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বললেন, 'ললিতা, তুমি সত্য কথা বলনি, তুমি রাধাকে মিথ্যে কথা বলেছ, তুমি কী জান না, 'ললিতা দেবী গুপ্ত রাধা' গুপ্তভাবেই ললিতা দেবীকে আমি অধিক ভালবাসি। শ্রীমতী রাধাদেবী বৃথা অহংকার পোষণ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাকে বেশি ভালবাসে। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু কারুর অহংকার সহ্য করতে পারি না।' দীন হীনা দরিদ্র গোপকন্যা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মুখারবিন্দ থেকে এই কথা শুনে বলল, 'হে ভগবান, আপনার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। আজি আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনিই রাধানাথ, আপনিই গোপীনাথ, আপনিই দীননাথ, আপনিই 'জগন্নাথ'। হে সখা, আজ আমার প্রাণ-মন সুস্থ হয়ে গেল। আপনি জগন্নাথ, আমি তো জগতের বাইরে নেই। আমার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। আপনার কথা শুনে আমার পরম শান্তি হল।

দেখো ভাই হরিপদ, ধনী ব্যক্তি অহংকার করে যে মহারাজ আমাকে বেশি ভালবাসেন। কিন্তু তুমি হচ্ছ আমার গুপ্ত ভক্ত, গুপ্তভাবেই আমি তোমাকে বেশি ভালবাসি। আমি অনেক মানুষের কাছে তোমার ভাব প্রকাশ করি না। এইজন্যে আমি তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কোন কথা বলিনি। কথা বললেই ভিতরের ভাব বোঝা হয়ে যায়।

হরি ঃ মহারাজ, ললিতা দেবীর মতো আমার মনও সুস্থ হয়ে গেল। আপনি জীবন্ত শংকর, আপনার কথা মিথ্যা হয় না। অবশ্যই আপনি আমাকে গুপ্তভাবে বেশি প্রীতি করে থাকেন। অহংকারী ধনী ব্যক্তিকে বাইরে থেকে বেশি প্রীতি করে থাকেন। মহারাজ, আমাকে ধনহীন বলার দরুণ আমার আর কিছু দুঃখ রইল না, আমাদের বাংলায় কবি রজনীকান্তের একটি গীত আছে

আমায় সকল প্রকারে
কাঙ্গাল করেছ
গর্ব করিতে চুর।

মহারাজ, আমার ধনসম্পদ নেই। ধন থাকলে কিছু না কিছু গর্ব এসে যায়। গর্বশূন্য না হলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে না, মহারাজ, ঈশ্বর প্রাপ্তির প্রধান উপায় কি তা আমাকে বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, ঈশ্বরকে পাবার প্রধান উপায় হল 'বিশ্বাস'।

হরি ঃ মহারাজ, এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলুন। বিশ্বাস কাকে করব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বিশ্বাস এই হওয়া চাই যে ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর মানুষের কাছে আসেন।

হরি ঃ ঈশ্বর বিশ্বাসের কোন তুলাদণ্ড আছে, যাতে বোঝা যাবে যে এত পরিমাণ বিশ্বাস হলে তবেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আছে বাছা, তার জন্যে তুলাদণ্ড আছে। এ সম্পর্কে তোমাকে একটা গল্প বলছি। গল্পটি শুনে এর ভাবটি শীঘ্রই গ্রহণ করতে পারবে।

বিশ্বাসী ভক্তের গল্প

এক দেশের রাজা রাণীর বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। তাই তারা খুব দুঃখের মধ্যে ছিল। বৃদ্ধ রাজা-রাণী সন্তান হওয়ার জন্য অনেক দৈব ক্রিয়াদি করালেন। অবশেষে তাঁদের একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে হল। রাজা-রাণী দেশের বড়ো বড়ো দৈবজ্ঞদের ডেকে মেয়ের জন্ম কুণ্ডলী করালেন। কিন্তু জন্ম কুণ্ডলী দেখে তাঁদের বড়ো দুঃখ হল। দৈবজ্ঞরা বললেন, মেয়ের কপালে অকালে বৈধব্যর যোগ আছে।

রাজা স্থির করলেন যে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। তিনি শ্বেতপাথরের এক মন্দির তৈরি করিয়ে সেখানে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর কষ্টি পাথরের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়ে যখন একটু বড়ো হল তখন রাজা তাকে বললেন "মা, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তোমার স্বামী। তুমি মনপ্রাণ দিয়ে এঁর সেবা করবে।" এই বলে তিনি তাকে পুজো পদ্ধতি ও পূজার কৃষ্ণমন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। মন্ত্রটি হল– "নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ক্লীং শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র স্বামী দেবতায় নমঃ।"

ছোটবেলা থেকেই রাজকুমারী এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সেবা ও পূজা শুরু করে দিল। এইভাবে দিন যায়। রাজকুমারী এবার যৌবনে পদার্পণ করল। দুচার জন সঙ্গিনী জুটেছে তার। সঙ্গিনীদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ বলে – আমার স্বামী আমাকে কত ভালোবাসে। কেউ বলে, আমার স্বামী তো আমার সঙ্গে কত কথা বলে ইত্যাদি। তাদের সেইসব কথা শুনে রাজকুমারী ভাবতে থাকে, ওদের স্বামীরা ওদের কত ভালোবাসে, কত কথা বলে আর আমার স্বামী তো আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেন না, ওদের স্বামীদের মতো আমাকে আদরও করেন না। রাজকুমারীর সরল অন্তঃকরণ দুঃখে ভরে গেল। একদিন সে ফুলের মালা বিগ্রহের

গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে সজল চক্ষে বলল, 'ঠাকুর, তুমি আমার স্বামী, তবে কেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো না, কেন তুমি আমাকে আদর করো না। আমার সেবায় কি কোনো ত্রুটি হয়েছে? তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? আমাকে বলে দাও কী করলে তুমি সুখী হবে? আমি সেভাবেই তোমার সেবা করব। ঠাকুর তুমি চুপ করে থেকো না, কথা কও কথা কও।'

পাষাণ বিগ্রহ পাষাণের মতোই নীরব হয়ে রইল। কোন কথাই শোনা গেল না বিগ্রহের মুখ থেকে। চোখের জলে রাজকুমারী পূজা করে ভোগ ধরে দিল বিগ্রহের সামনে। অভিমানে দেবতার পায়ের কাছে পড়ে রইল। এইভাবে সাতটি রাত কেটে গেল। দুঃখে রাজকুমারীর বুক ফেটে যাচ্ছে, ঠাকুর এত নির্মম! ঠাকুরের এই নীরবতা সে আর সহ্য করতে পারল না। সে স্থির করল আর পুজো নয়, যেমন করেই হোক ওকে আমি জব্দ করবই, দেখি কেমন করে উনি আমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারেন।

এবার বাজার থেকে কিছুটা তুলো আনিয়ে রাজকুমারী নিজের কাছে রেখে দিল, তারপর পুজো সেরে ভোগ নিবেদন করে মিনতি করে বলল, 'এখনও তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না? তবে শোনো, যদি কথা না বলো, তবে তোমার এমন অবস্থা করব যে তখন চুপ থাকার ফল তুমি বুঝতে পারবে?' পাষাণ দেবতা তখনও নিরুত্তর। তাই দেখে রাজকুমারী বলল, 'তবু তুমি চুপ করে রইলে? বেশ, তবে তুমি আমার অপরাধ নিও না, শুধু দেখে যাও আমি কী করি।' এই বলে খানিকটা তুলো নিয়ে রাজকুমারী ইষ্টদেবের বিগ্রহের নাকে গুঁজে দিতে গেল। তার ইচ্ছেটা হল, নাক বন্ধ করলেই দম নেবার জন্যে ইষ্টদেবকে বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হবে। যেই না সে নাকের কাছে তুলো নিয়ে গেছে, অমনি পাষাণ দেবতা সজীব হয়ে রাজকুমারীর দু'হাত ধরে বললেন, 'সখী, এ কী করছ তুমি? দম বন্ধ হয়ে যে মরে যাব।'

এই কথা শোনামাত্র রাজকুমারী ঠাকুরের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বলল, 'হে নিষ্ঠুর, হে স্বামী, এতদিন তুমি আমার সঙ্গে কেন কথা বলনি ঠাকুর?' ভগবান বললেন, 'হে সখী, এতদিন তোমার বিশ্বাসে ত্রুটি ছিল, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। পাষাণ বিগ্রহ হলেও আমি যে সজীব, আমারও যে প্রাণ আছে, একথা এতদিন তো তুমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারো নি।' আজ তোমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে বলেই তুমি বুঝতে পেরেছ যে, পাষাণ হলেও আমি চিন্ময়। তাই তো তুমি আমার দম বন্ধ করে আমাকে কথা বলাতে চেয়েছিলে। তোমার এই

অন্যায় বিশ্বাসের জন্যই আমি কথা না বলে থাকতে পারলাম না। সখী, কেন আমাকে নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দিচ্ছ? আজ তোমার হৃদয়ের মধ্যে তুমি আমাকে সজীব করে তুলেছ। তাইতো আমি তোমার কাছে সজীব হয়ে উঠলাম। এই বলে ভগবান দুহাত দিয়ে রাজকুমারীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিশ্বাস অদ্য ধন্য হল
ভক্ত ভগবান ধন্য হল
সাধ্য সাধক ধন্য হল
পূজ্য পূজক ধন্য হল।

দেখো বাছা হরিপদ, এই গল্প শুনে তোমার বোঝা হয়ে গেল যে, বিশ্বাসের ওজন বা পরিমাণ কতটা হওয়া দরকার। পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেলে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণ বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্ধান মেলে না। এইজন্য এক চলিত কথা আছে, 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' তর্কে, অবিশ্বাসে বস্তু মেলেনা। আমার প্রিয়-শিষ্য রামবাবুর (রামচরণ বসু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) কাছে এই সম্পর্কে এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প শুনেছি, আমি তা তোমাকে শোনাচ্ছি।

একবার যীশুর কাছে তাঁর এক শিষ্য এসে বলল, 'হে প্রভু, ঈশ্বরকে কী করে পাওয়া যাবে?' তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের জন্য যখন তুমি ব্যাকুল হবে, ব্যগ্র হবে, তখনই তুমি ঈশ্বরকে পাবে।' শিষ্য বলল, 'ব্যাকুল তো হয়েছিই, আর কত হব?' যীশু শিষ্যকে বললেন, 'এরকম ব্যাকুলতা হলে হবে না, আরও ব্যাকুল হতে হবে।' শিষ্য বলল, 'হে প্রভু, ব্যাকুলতা কি পরিমাপ করা যায়? কীভাবে ব্যাকুলতার পরিমাণ করা যায় তা আমাকে বলুন' যীশু বললেন, 'হ্যাঁ পরিমাপ করা যায়, তোমাকে তা বলছি, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

যীশু সমুদ্রে স্নান করবার জন্য গেলেন।

সমুদ্রে গিয়ে তিনি শিষ্যকে জলের মধ্যে চেপে ধরলেন। লোনা জল পান করে শিষ্যের প্রাণ চলে যাবার উপক্রম হল। তখন তাকে জল থেকে তুলে যীশু বললেন, 'এখন বুঝতে পারলে তো, কী রকম ব্যাকুলতা হলে তবে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? ব্যাকুলতার পরিমাণ বুঝতে পেরেছ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ এতটাই ব্যাকুল হওয়া দরকার, যেমন জলের মধ্যে তোমার প্রাণ আকুপাকু করছিল। জল থেকে না উঠলে প্রাণ চলে যাবে, আর বাঁচবো না – এরকম অবস্থা হয়েছিল। এখন বল – ঈশ্বরকে পাবার জন্য এরকম ব্যাকুলতা তোমার কী হয়েছে?' শিষ্য বলল, 'না প্রভু, ঈশ্বর

প্রাপ্তির জন্য এরকম ব্যাকুলতা আমার কখনও হয়নি।' যীশু শিষ্যকে বললেন, 'ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য কী পরিমাণ ব্যাকুলতা দরকার তা তুমি বুঝতে পেরেছো তো?' শিষ্য বলল, 'হ্যাঁ প্রভু, এখন আমি ভালো করে বুঝতে পেরেছি।'

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শ্রীমুখ নিঃসৃত এইসব সুমধুর উপদেশাবলী শুনে পরম প্রীত হয়ে গুরুপাদপদ্মে মস্তক রেখে প্রণাম করলেন এবং বিদায় নিতে উদ্যত হলেন। ইত্যবসরে পাগলার মতন এক পণ্ডিত এসে গুরু মহারাজকে প্রণাম করে বলল, 'স্বামীজী, আমি আপনার শ্রীশ্রীবালানন্দ নামের একটু অর্থ করব, আপনি শুনুন।'

প্রথম – অতি বাল্যকালে আপনি ঈশ্বর পথের পথিক হয়ে বাল্যকালেই অনেক আনন্দ লাভ করেছিলেন, এইজন্য আপনার উপযুক্ত নাম বাল্যে আনন্দ অর্থাৎ বালানন্দ।

দ্বিতীয় – বাল শব্দের অর্থ লোম। প্রতি লোমকূপে যিনি আনন্দ অনুভব করেন তিনি বালানন্দ।

তৃতীয় – 'বালানন্দ' বাংলা শব্দের অর্থ স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীজাতি বুঝায়। পুরুষের নাম স্ত্রী জাতীয় হল কেন? তার তাৎপর্য হল – আপনি স্ত্রীজাতিকে অর্থাৎ মাতৃশক্তিকে বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকেন। তাই আপনার উপযুক্ত নাম বালানন্দ।

হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সুগায়ক ছিলেন, সন্ধ্যা সমাগত দেখে শ্রীগুরু মহারাজকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একটি ভজন গীত শোনালেন।

গীত

হরি হে তুমি আমার সকল হবে কবে
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে
মালিক হয়ে রবে।
সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।
কিনবো যাহা ভবের হাটে
আনবো তোমার চরণ বাটে

তোমার কাছে হে মহাজন!
সবই বাঁধা রবে।
স্বার্থ প্রাচীর করে খাড়া
গড়বো যখন আপন কারা
বজ্র হয়ে তুমি তাহা
ভাঙবে ভীষণ রবে।
পায়ে যখন ঠেলবে সবাই
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই
জগতের সকল আপন
হতেও আপন হবে।
ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা
সাঙ্গ করে ভবের খেলা
জননী হয়ে তুমি আমায়
কোল বাড়ায়ে লবে।

এই ভজন গানটি শুনে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময় তাঁকে ধ্যান নিমগ্ন শঙ্কর মনে হচ্ছিল। এরপর ভক্ত ও শিষ্যগণ তাঁর পদধূলি মাথায় ধারণ করে স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন।

ষষ্ঠ পর্ব

স্থান —ধ্যানকুঠী সময় — সকাল

শ্রীসুরেন বর্মণ উকিল মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী অনিলা বালা দাসী

ও

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্টি, পালন ও সংহারের গূঢ় রহস্য ঃ ঈশ্বর ভরা ঘরকে সহজে ভাঙ্গেন না, এই প্রসঙ্গে যমরাজ ও বুড়ির গল্প ঃ মায়ী, তুমি ঝি হয়ে যাও, গৃহিনী (মনিব) হয়ো না, মনিব হলেন পরমাত্মাদেব ঃ সন্তানের মৃত্যু হলে দুঃখ না করে বরং আনন্দ কর, এ সম্পর্কে দৃষ্টান্তসহ আলোচনা ঃ পণ্ডিত, স্ত্রীলোক আর লতা — এই তিনের আশ্রয় দরকার, আশ্রয় ছাড়া এই তিনের শোভা হয় না ঃ ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে মেয়েরাই, এ সম্পর্কে আলোচনা ঃ শনি প্রমুখ গ্রহের হাত থেকে কারুর এমনকি দেবতাদেরও রেহাই নেই, এই প্রসঙ্গে শনি গ্রহের গল্প ও কুষ্ঠ ব্যাধির গল্প ঃ গ্রহ শান্তির উপায় ঃ সাধনার স্তর — দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য ঃ জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে বিশেষ কিছু ফারাক নেই, তবে সাধন পথে কিছুটা ফারাক আছে ঃ গুরুদেবের ফি ঃ ধর্মের ভান বা নকলও ভালো, তা থেকেই আসলে পৌঁছানো যায়, এ প্রসঙ্গে জেলের সাধু হওয়ার গল্প ঃ নকল সাধু আর আসল সাধু কী করে চেনা যায়, এ প্রসঙ্গে জহুরী ও দাগী মণির গল্প। আমাদের জহুরীর সঙ্গ করতে হবে অর্থাৎ সাধু জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ করতে হবে ঃ সাধু দর্শনের সুফল ঃ ভগবান কী পক্ষপাত দোষে দোষী? এ প্রসঙ্গে জমিদার ও ঘড়ার গল্প ঃ ভগবানের কৃপা লাভ করতে হলে নিজেকে পাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ঃ গুরুমহারাজ সকল শিষ্যকেই প্রীতি করে থাকেন, তবে অধিকার অনুযায়ী প্রীতি করতে হয়।]

বর্মণ মশাই-এর দুটি সন্তান মারা যাওয়ায় তার পত্নী অনিলা শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে গুরুমহারাজকে প্রণাম করে অশ্রুজল মোচন করতে করতে প্রশ্ন করলেন —

অনিলা ঃ আমি তো পুত্র চাইনি, ভগবান পুত্র দিলেনই বা কেন আর নিলেন বা কেন — এর মর্ম আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাচ্ছা, সৃষ্টি রহস্য আমাদের বোঝার অগম্য। যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই ঈশ্বর আমাদের পালন করছেন আবার সেই ঈশ্বরই আমাদের সংহার করছেন। ঈশ্বর কেন সৃষ্টি করলেন, কেন পালন করছেন, কেনই বা লয় করে দিচ্ছেন, এর ভাব বা কারণ তিনি অব্যক্ত বা গোপন রেখেছেন। তুমি তোমার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সৃষ্টি রহস্যের দ্বার খুলে দেখে নাও। সৃষ্টি হল কিন্তু সংহার যদি না হয় তাহলে মানুষের পৃথিবীতে থাকবার স্থান পাওয়া যাবে না, খাবারও মিলবে

না। একবার এর ভাব হৃদয়ঙ্গম করে দেখো তো! মানুষ, পশু, পাখী কীট পতঙ্গ স্থানাভাবে পিসে যাচ্ছে, খাদ্যের অভাবে জঠরাগ্নি পুড়ে জ্বলে যাচ্ছে। এই ঘটনা থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রাণীরা আপনা থেকেই মৃত্যুবাঞ্ছা অর্থাৎ মৃত্যুর আকাঙ্খা করবে। এইজন্যই মৃত্যু সৃষ্টি রচনার অঙ্গ।

অনিলা ঃ মহারাজ, মেনে নিলাম, সৃষ্টি রচনার অঙ্গ হল মৃত্যু কিন্তু আমারই দুটি সন্তান চলে গেল কেন? আমার একটি সন্তান চলে যাবার পর, যার মোটেই যায় নি এমন ব্যক্তির একটি সন্তান চলে গেলে তো হোত।

অনিলা বালা দাসীর এই কথা শুনে সরল বালকের ন্যায় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ হো হো করে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই সরল শিশুর ন্যায় হাসিটুকু উপস্থিত সকল ভক্ত শিষ্যগণের প্রাণে একটা নির্মল শান্তি এনে দিল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাচ্ছা অনিলা, ঈশ্বর কেন তোমার দুটি সন্তানই নিয়ে নিলেন। একটি তোমার সন্তান নিয়ে আর একটি অন্য ব্যক্তির (যার অনেক সন্তান আছে) সন্তান নিলেন না কেন — এটাই তোমার ক্ষোভ আর এটাই তোমার প্রশ্ন। বেশ বাছা, একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মধ্য দিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

যমরাজ ও বুড়ির গল্প

এক বুড়ির সাত ছেলে ছিল। কিন্তু একে একে তার সাত ছেলেই মরে গেল। শোকসন্তপ্ত হয়ে বুড়ি ঠিক করল যে সে যমরাজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে কেন তিনি তাঁর সাতটা ছেলেকেই নিয়ে নিলেন। তার নিজের দু'একটিকে নিয়ে যাদের ঘরে বেশি ছেলে রয়েছে তাদের মধ্যে থেকে দু একটি করে নিলেও তো পারতেন। এই ভেবে বুড়ি যমরাজের কাছে হাজির হয়ে বলল, "ধর্মরাজ, এ কেমন তোমার বিচার, আমার সাতটা ছেলেকেই তুমি নিয়ে নিলে। কেন, আর কি কারুর ছেলে ছিল না? আমার দু'একটিকে নিয়ে অন্য ঘর থেকেও না হয় দু-একটি করে নিতে। কেন আমার উপর এত অবিচার করলে তার জবাব দাও, নইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" যমরাজ বুড়িকে বললেন, "বুড়িমা একটু স্থির হও। তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, একটু বিশ্রাম করে সামনের ওই পুকুরটাতে তুমি স্নান করে এসো। পাশে ওই যে ঘরটা দেখছ, ওখানে অনেক মিষ্টি রয়েছে। পুকুরে স্নান করে ইচ্ছেমতো মিষ্টি খেয়ে তুমি আবার আমার কাছে এসো, তখন তোমাকে আমি সব কথা বুঝিয়ে বলব।"

যমরাজের কথামতো পুকুরে স্নান করে বুড়ি খাবার ঘরে ঢুকে দেখল সেখানে থরে থরে মিষ্টির হাঁড়ি সাজানো রয়েছে। সবকটা হাঁড়িই মিষ্টিতে ভরতি, শুধু একটা হাড়ি প্রায় খালি, তাতে কয়েকটা মাত্র মিষ্টি পড়ে রয়েছে। বুড়ি ভাবল, ভরা হাঁড়ি আর ভাঙি কেন? এই হাঁড়িতে যা মিষ্টি রয়েছে তাতেই আমার পেট ভরে যাবে। এই ভেবে ভরা হাঁড়ি না ভেঙে খোলা হাঁড়িতে যে কটা মিষ্টি ছিল বুড়ি তা খেয়ে নিল আর তাতেই তার পেট ভরে গেল।

স্নান, খাওয়া হয়ে গেলে বুড়ি আবার যমরাজের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল — কেন তিনি তার সাতটি ছেলেকে গ্রাস করেছেন। যমরাজ বললেন, "বুড়িমা, পরে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, আগে তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ঘরে তো মিষ্টি ভরতি অতগুলো হাঁড়ি ছিল, তা সত্ত্বেও সেসব হাঁড়ি থেকে মিষ্টি না নিয়ে তুমি খোলা হাঁড়ি থেকেই মিষ্টি খেলে কেন?" বুড়ি বলল, "ভরা হাঁড়ি আমি ভাঙতে যাব কেন? খোলা হাঁড়িতে যে কটা মিষ্টি ছিল তাতেই আমার পেট ভরে গেল, তাই আর ভরা হাঁড়ি ভাঙিনি।" যমরাজ বললেন, "দেখো তোমার প্রশ্নের জবাব তুমি নিজেই কিন্তু বলে দিলে। তুমি যেমন ভরা হাঁড়ি ভাঙোনি আমিও তেমনি ভরা ঘর ভাঙিনে। ভাঙা ঘরকেই আমি ভেঙে দিই।"

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আচ্ছা অনিলা, তোমাকে যে গল্প আমি বললাম, ওই গল্পের ভাব তুমি বুজেছ?

অনিলা ঃ হ্যাঁ মহারাজ, গল্পের তাৎপর্য বুঝলাম যে, ব্যবহার ক্ষেত্রে আমরা যেমন ভাঙ্গা জিনিসটাই খরচ করে থাকি, আস্ত জিনিসটা ভাঙ্গি না। যমরাজও তেমনি যার ঘর ভেঙ্গে পুত্র নেন, তারই পুত্র নিতে থাকেন? ভরা ঘরকে সহজে ভাঙ্গেন না। এই উপদেশ পেয়ে আমি কিছুটা শান্তি পেলাম।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, কিছু শান্তি কেন? পরিপূর্ণ শান্তি হওয়া চাই। তোমার প্রতি আমার উপদেশ হল — মায়ী, তুমি ঝি হয়ে যাও, গৃহিণী হয়ো না। ঝি যেমন মনিবের পুত্র কন্যা পালন করে থাকে এবং গৃহ কর্মও সব কিছু করতে হয়, কিন্তু যা কিছু সে করে মমত্বশূন্য হয়েই সে করে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বলবে — আমি এ বাড়ির ঝি। আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বাড়ি — এসব কথা বললেও মনে মনে জানবে যা কিছু আছে এসবই আমার মনিবের। বাছা অনিলা, তোমার

পরমাত্মাদেবই হলেন মনিব। তোমার পুত্র কন্যা ঘর বাড়ি — সব কিছু পরমাত্মাদেবের। তুমি হলে ঝি, ঝি-এর মতো তুমি পুত্র কন্যা পালন করবে। গৃহকর্ম সব কিছু করবে কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিজেকে বোঝাবে যে আমার বলে কিছু নেই, সব বস্তুই আমার মনিব পরমাত্মাদেবের। ওনার পুত্র উনি নিয়ে নিয়েছেন, তুমি কেন দুঃখ পাচ্ছ?

দেখো বাছা, এ সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। যেমন মুটে মোট বা মাল বহন করে থাকে। তেমনি তুমিও পরমাত্মাদেবের মোট বহন করছ। যার পাঁচটা সন্তান তার মাথার উপর পাঁচমণ বোঝা। যার দুটো সন্তান তার মাথার উপর দুমণ বোঝা রয়েছে, যার দশটা সন্তান তার মাথার উপর দশমণ বোঝা রয়েছে অর্থাৎ যার যেমন জিনিস তাকে মাথার উপর সেই পরিমাণ বোঝা বহন করতে হয়। পরমাত্মাদেব তোমার বোঝার ভার হাল্কা করে দিয়েছেন। তোমার মাথার উপর থেকে দুমণের ভার পরমাত্মাদেব লাঘব করে দিয়েছেন। তোমার তো আরাম বোধ হওয়া উচিত। তোমার দু'পুত্রকে পরমাত্মাদেব নিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ দুমণ বোঝা তিনি তোমার মাথার উপর থেকে ফেলে দিয়ে হাল্কা করে দিয়েছেন। তোমার দুই পুত্রকে পালন করবার জন্যে কত খাটনি, কত চিন্তা ছিল। তা থেকে পরমাত্মাদেব তোমাকে ছুটি করে দিয়েছেন। দেখো বাছা, তোমার দু মণের বোঝা লাঘব হয়ে গেছে। এখন তুমি দুঃখ পাচ্ছ কেন?

এ সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্তের কথা বলছি। দেখো কোন এক ব্যক্তির পুত্র দার্জিলিং গেল। এরজন্যে মায়ের কোন দুঃখই হল না। মা বললেন, আমার পুত্র দার্জিলিং গেছে, সেখানে গিয়ে আমার পুত্র ভালোই আছে। আমার পুত্র উত্তম দেশে গেছে, তাই আমার মনে খুবই শান্তি বিরাজ করছে। দেখো অনিলা, তোমার পুত্র স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে গেছে অর্থাৎ ইহকাল ছেড়ে পরকালে গেছে, পুত্রের দার্জিলিং যাওয়ার মতো, দেশান্তরে গেছে মাত্র। দৃষ্টান্ত অনুযায়ী দার্জিলিং গেলে মায়ের কোন দুঃখ নেই, ভালো দেশে গেছে বলে মায়ের আনন্দ হচ্ছে। সেরকম তোমার পুত্র ইহলোক ছেড়ে পরলোকে গেছে, স্থূল শরীর ছেড়ে সূক্ষ্ম শরীরে যাওয়ায় তোমার কেন দুঃখ হচ্ছে? পুত্র ভালো দেশেই গেছে — এই চিন্তা করে কেন তুমি আনন্দ পাচ্ছ না। পুত্র ভালো দেশেই আছে — এই মনে করে তোমাকে আনন্দ করতে হবে।

অনিলা ঃ মহারাজ, আপনার উপদেশ শুনে আমার মনে শান্তি ফিরে এসেছে। পুত্রশোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শুনে আমার হৃদয় শীতল হল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা অনিলা, এখন তুমি বাড়ি চলে যাও, বেলা অনেক হল, স্নান ভোজনের সময় হয়ে গেছে। মায়ী, একদিনেই জ্ঞান হয়ে যাবে তা হবে না। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসবে। দশদিন আমার উপদেশ শুনবে, তবেই তা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বসে যাবে। বাছা অনিলা, তুমি কার সঙ্গে এখানে এসেছ? তোমার সঙ্গে কি কেউ আসেনি?

অনিলা ঃ না, বাবা, আমার সঙ্গে কোন লোক আসেনি, আমি একলাই চলে এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, আশ্রমে একলা আসা ঠিক নয়। দেখো বাছা, এ সম্পর্কে একটি শ্লোক আছে —

"যদ্যপি শুদ্ধং লোক বিরুদ্ধম্।

না চরণীয়ম্, না চরণীয়ম্, না চরণীয়ম্,"।।

শ্লোকের অর্থ ঃ কার্য যদি শুদ্ধ হয়, কিন্তু লোকমত যদি বিরুদ্ধ হয়, তবে সেই কাজ করবে না, করবে না, করবে না।

দেখো বাছা অনিলা, কার্য যদি শুভ হয় আর লোক সকল তার বিরুদ্ধ হয়, তাহলে ওই কার্য কখনো করবে না, করবে না, করবে না। স্ত্রীলোক একলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে — এটা ভাল কাজ হয়নি। লোকঅপবাদকে সদা সর্বদা বাঁচিয়ে চলা উচিত। এ সম্পর্কে আর একটি শ্লোক আছে।

"বিনা আশ্রয়ে ন তিষ্ঠন্তি।

পণ্ডিতাঃ বনিতাঃ লতাঃ।।"

শ্লোকের অর্থ ঃ পণ্ডিতেরা রাজার আশ্রয়ে থাকলে তার শোভা হয় ও সে সুখে স্থিতি লাভ করে। স্ত্রীলোক তার স্বামী শ্বশুর, পুত্র পিতা যে কোন আশ্রয় সদা সর্বদা অবলম্বন করে থাকবে। তবেই তার শোভা ও তার সুখে স্থিতি লাভ হবে। লতা বৃক্ষ

পাদপ অথবা যে কোন কাঠের উচ্চ পদার্থকে আশ্রয় করে থাকলে তবে তার শোভা হয় এবং সে সুখে স্থিতি লাভ করতে পারে।

দেখো বাছা অনিলা, স্ত্রীলোক, পণ্ডিত, লতা — এই তিনের অবস্থা একই প্রকার হয়ে থাকে। কোন আশ্রয় ছাড়া এই তিনের শোভা হয় না। মায়ী, তুমি একলা আশ্রমে আর আসবে না বাছা।

অনিলা ঃ বাবা, আপনি আমাদের ধর্ম পিতা। আপনার পবিত্র আশ্রমে আমাকে একলা আসতে কেউ বারণ করেন না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না মায়ী, এই ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বহু বালক ব্রহ্মচারী বাস করছে। একলা মায়ীর পক্ষে আসা যাওয়া করা ঠিক নয়। তুমি সুরেনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তুমি হলে একজন ধর্মপত্নী। তুমি ধর্মের পথে অগ্রসর হবে। স্বামীকেও এই পথে অগ্রসর করাবে। তার আসার ইচ্ছে না থাকলে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। এতে তোমার কল্যাণ যেমন হবে, সেই সঙ্গে তারও কল্যাণ হবে। দেখো বাছা, আমি সব পুরুষের মুখের উপর বলে দিয়ে থাকি — "ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে মেয়েরাই।"

ওই স্থানে এক ভদ্রলোক সৎসঙ্গ শ্রবণ করছিলেন। তিনি বললেন —

ভদ্রলোক ঃ স্বামীজী, আপনি বলছেন — ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে মেয়েরা। এই কথায় আপনার পক্ষপাতিত্ব দোষ এসে গেছে। স্ত্রীলোক ধর্মকর্ম করছে, পুরুষ করছে না, আপনার এই কথা মানতে পারলাম না।

শ্রীশ্রী গুরু ঃ না না বাবা, আমি পক্ষপাতের কথা বলিনি। ধর্মকর্মে মেয়েদের যেমন মতি দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে ততটা দেখা যায় না। সকলের মুখের উপরেই আমি বলে দিই — মায়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দেখো বাবু, আমি তোমাকে আমার স্বপক্ষে একটা যুক্তি দিচ্ছি। কোথাও ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা হোক বা ভাগবত পাঠ, কি কীর্তন হোক, তুমি দেখতে পাবে ওই সভাতে তিন ভাগ শ্রোতা মেয়েরা আর এক ভাগ পুরুষ, এর কারণ কী? ম্যাজিক সার্কাস, ফুটবল অথবা টপ্পা গানের আসরে দেখবে তিন ভাগ পুরুষ, এক ভাগ মেয়ে।

এর কারণ হল, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে পুরুষদের ভালো লাগে না। সরলমতি

মায়েরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সহজেই তাড়াতাড়ি আগ্রহী হয়ে ওঠে, ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে পুরুষদের চেয়ে তারা অনেক এগিয়ে যায়। আচার-বিচারের ব্যাপারটাও দেখো। পুরুষ বাইরে থেকে ঘরে এসে কাপড় ছাড়ল না মায়েরা বললেন - কাপড় না ছাড়লে তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেব না। নিজের ইচ্ছে না থাকলেও গঞ্জনার ভয়ে এবং অশান্তি এড়াতে পুরুষকে অগত্যা কাপড় ছেড়ে ঘরে ঢুকতে হয়। এইভাবে মায়েদের জন্যই এখনো আচার-বিচার টিকে আছে। সাধারণতঃ পুরুষ দীক্ষা নিতে চায় না, ঈশ্বরকে ডাকবার দিকেও তাদের মন নেই, কিন্তু স্ত্রী যখন বলে আমার জন্য তোমায় দীক্ষা নিতে হবে তখন বাধ্য হয়ে তাকেও দীক্ষা নিতে হয়। শাস্ত্রকার সস্ত্রীক দীক্ষা নেবার বিধান দিয়েছেন, তাই স্ত্রীলোক আগ বাড়িয়ে তো দীক্ষা নিতে পারে না, কাজেই পুরুষকে পাকড়াও করে দীক্ষার জন্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। দেখো ভাই, নিজের ইচ্ছে তো ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর জন্যই স্বামীকে দীক্ষা নিতে হল। কানে ব্রহ্মমন্ত্র পড়ল, ঈশ্বরকে ডাকবার পথ তৈরি হয়ে গেল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে দীক্ষা নিল। কিন্তু দীক্ষা নেবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ঈশ্বরকে ডাকতে শুরু করে দিল, কিন্তু পুরুষ এত সহজে ঈশ্বরকে ডাকতে পারে না। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, স্ত্রী ঈশ্বরকে ডাকে, পুরুষ ডাকে না কেন? এর কারণ কী? এর কারণ হল, মায়েদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস খুব সহজেই স্থায়ী হয়ে যায়। গুরু বলে দেন — মা, এই রাম ভগবান অথবা শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, তোমার ইষ্ট মূর্তি —

"শ্রীরাম-রঘুনাথায় নমঃ,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র - বাসুদেবায় নমঃ।"

এই তোমার ইষ্টমন্ত্র। এই মন্ত্র জপ করলে তুমি ঈশ্বরকে লাভ করবে।

গুরুদেবের কথা মায়েদের মনে একেবারে ছাপ পড়ে যায়। সে ছাপ আর কখনো ওঠে না। পুরুষকেও তো গুরুদেব ওই একই কথা বলেন, কিন্তু পুরুষের হৃদয় মায়েদের চেয়ে কিছুটা কঠিন, গুরুর কথার ছাপ সেখানে পড়তে দেরি হয়। মায়েদের মতো ঈশ্বরের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস পুরুষদের হয় না। মায়েরা ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকেন, বাইরের লোকের সঙ্গ তারা বিশেষ পান না। কিন্তু পুরুষদের অনেক রকম লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। নাস্তিকদের সঙ্গে থেকে থেকে নাস্তিক ভাব আসে, খৃষ্টানদের সঙ্গে মিশে খৃষ্টান ভাব আসে। এই সবের জন্য পুরুষদের মধ্যে গুরুদত্ত ধন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে; লাখে একজন হয়তো গুরুদত্ত ধন রক্ষা করতে পারে।

পুরুষ দু-চার পাতা ইংরাজী বই পড়ে সনাতন হিন্দু ধর্মে আস্থা হারায় আর বলতে থাকে যে ধর্ম-কর্ম বলো, দীক্ষা আদি বলো, ওসবে কোনো লাভ নেই, ওসব হল মনের দুর্বলতা, কুসংস্কার। অতএব ধর্মকর্ম বাদ দাও। মায়েরা কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মকে আজও আগলে ধরে বসে আছেন। তাই আমি সব সময় বলে থাকি — মায়েরাই ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ আমার কারুর প্রতি পক্ষপাত নয়। যেমন দেখছি তেমন বলছি।

ভদ্রলোকঃ বাবা, আপনি সনাতনী হিন্দুধর্মের এক 'সূর্যদেব'। ধর্ম সম্বন্ধে আপনি যে মতামত প্রকাশ করবেন তা তো আমরা বিনা বিচারে মেনে নেব। বাবা, আমি আপনার কাছে এসেছি — আমার এক সমস্যা হয়েছে — এক গনৎকার আমার হাত দেখে বলেছে, তোমার শনিগ্রহ আসছে, এই গ্রহ তোমাকে খুব দুঃখ দেবে, এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

শ্রীশ্রী গুরুঃ না না বাবু, তোমার হাত দেখানো ঠিক হয়নি। এতে আগে থেকে বৃথা হর্ষ শোক হয়ে যায়। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী তোমাকে শোনাচ্ছি।

শনি গ্রহের গল্প

একদিন নারদ ঋষি বৈকুণ্ঠে গমন করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু শুয়ে রয়েছেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী তাঁর পদসেবা করছেন। নারদ ব্যস্ত হয়ে বিষ্ণুকে বললেন। "প্রভু, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে রয়েছেন, এদিকে যে আপনার ঘোর বিপদ উপস্থিত, শনি গ্রহ এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। শনির কোপ তো আপনি জানেন, বারো বছর না ভুগিয়ে সে ছাড়ে না।" নারদের কথা শুনে বিষ্ণু বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক ভেবে একটা উপায় স্থির করে তিনি নারদকে বললেন, "দেখো নারদ, শনির কোপ এড়াতে আমি এক কাজ করি। বারো বছর আমি পাথর হয়ে বসে থাকব, তাহলেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বারো বছর কেটে যাবার পর আমি আবার বিষ্ণু মূর্তি ধারণ করব।"

বিষ্ণু বারো বছর পাথর হয়ে রইলেন। গ্রহের ফের কেটে যাবার পর তিনি শনিগ্রহকে ডেকে বললেন। "কিগো শনি ঠাকুর, তুমি তো আমার কোন ক্ষতিই করতে পারলে না।" শনি তখন হেসে বললেন, "প্রভু, আপনি স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান হয়ে আমার ভয়ে যে বারো বছর পাথর হয়ে রইলেন, তাতেই তো আমার কাজ

সিদ্ধ হল। আপনি আগে থাকতেই তো বারো বছর পাথর হয়ে থেকে আমার কোপের সময়টা স্থির করে দিলেন।" বিষ্ণু তখন হাসতে হাসতে বললেন, "হ্যাঁ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমি গোলোকপতি হয়ে তোমার ভয়ে পাথর হয়ে রইলাম। পাথর হবার বুদ্ধিটা আমাকে যোগাল কে? এখন বেশ বুঝতে পারছি যে প্রথমেই তুমি আমার বুদ্ধিটাকে নষ্ট করে দিয়েছিলে। তাই তোমার কোপের কাল নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম।"

দেখো বাবু, শনিগ্রহের কী রকম মাহাত্ম্য। গ্রহের প্রভাব কেউ এড়াতে পারে না। তার প্রভাব ভগবানকেও ভোগ করতে হয়। মানুষের কথা কী আর বলব। তবে গ্রহশান্তির জন্য মহাজনরা তাই গ্রহদেবতার পুজো, শান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। তাতে রুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হন। এই কারণে শাস্ত্রকার ঋষিগণ, গ্রহ দেবতার পূজার বিধি লিখে গেছেন। বিধিপূর্বক গ্রহদেবতার পূজা, স্তব, স্তুতি করতে হবে। তবেই গ্রহশান্তি হবে।

ভদ্রলোক ঃ বাবা, গ্রহ বৈগুণ্য হওয়ার কারণ কি?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাবু, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ পুণ্যের প্রভাব থেকেই গ্রহ তুষ্ট রুষ্ট হয়ে থাকে। নিজকৃত শুভাশুভ কর্মই মানুষের সুখ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। নচেৎ গ্রহদেবতা তুষ্ট রুষ্ট হয়ে মানুষকে সুখ দুঃখ দিতে সমর্থ হয় না। এইজন্যে মানুষের সদা সর্বদা শুভ কর্ম করা, শুভ চিন্তা করা উচিত। পাপের ফল জ্ঞানী অজ্ঞানী সব মানুষকেই ভোগ করতে হয়।

দেখো বাবু, তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্প শোনাচ্ছি, তা থেকে মানুষের তাড়াতাড়ি ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়, এতে কোন সংশয় নেই।

কুষ্ঠ ব্যাধির গল্প

এক পরম তপস্বী মহাজ্ঞানী পুরুষ বহু শিষ্যমণ্ডলী নিয়ে দিন কাটায়। শিষ্যগণ-জ্ঞানী গুরুর সেবা করে আর গুরুদেবের মুখারবিন্দ থেকে তারা নানাবিধ সৎ উপদেশ শ্রবণ করে। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী তারা সাধন ভজন করে খুব আনন্দে দিন কাটায়। সাধু মহাত্মা অধিকাংশ সময় ধ্যানে মনকে নিমগ্ন রাখেন।

একদিন ধ্যানে বসে গুরুদেব দেখলেন এক বিভীষিকাময় ছায়ামূর্তি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি, ছায়ামূর্তিরূপে কেন এখানে ঘোরাফেরা করছ?"

ছায়ামূর্তি বলল, "আমি কুষ্ঠব্যাধি, বারো বছরের জন্যে আপনার শরীরে অধিষ্ঠান করব, কিন্তু আপনার পুণ্যময় শরীরে প্রবেশ করতে সাহস পাচ্ছিনে।" সাধু মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তুমি এখন কী করবে?" ছায়ামূর্তি বলল, "অপেক্ষা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। আপনার মতো তপস্বীর দেহে আমি প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু আমার হাত থেকে আপনি নিস্তার পাবেন না, কুষ্ঠরোগ ভোগ করবার জন্যে দেহান্তে আবার আপনাকে জন্ম নিতে হবে।" সাধু মহাত্মা তখন বললেন, "তুমি যখন আমাকে ছাড়বেই না, তখন আর পরের জন্মের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ কী। তুমি আমার দেহটাকেই আক্রমণ করো। আমি সাধন ভজন সব ত্যাগ করছি। তাতেই আমার যা কিছু তেজ, যা কিছু পুণ্য সব নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তুমি অনায়াসে আমার দেহটাকে আক্রমণ করতে পারবে। আমি এখন কাশীধামে চললাম। মণি-কর্ণিকার ঘাটে এক কুটীর বানিয়ে সেখানেই থাকব, তুমি সেখানে গিয়ে আমার দেহে ভর কোরো।"

এত কথা বলে সাধুজী শিষ্যদের ডেকে বললেন, "আমি আজই কাশী চলে যাব। তোমরা এখানেই থাকো।" গুরুর কথা শুনে শিষ্যরা বলল, "হে গুরুদেব, এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আপনি কেন বলছেন? আমাদের কী কোন অপরাধ হয়েছে? না গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না। আপনি যেখানেই যান না কেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।" সাধুজী অনেক নিষেধ করলেন, কিন্তু শিষ্যরা নিষেধ মানল না। শিষ্যরা গুরুর সঙ্গে সঙ্গে কাশীধামে এসে পৌঁছল।

সাধু মহাত্মা মণিকর্ণিকার ঘাটে কুটীর নির্মাণ করে সেখানে বাস করতে লাগলেন। স্নান দান, সন্ধ্যা বন্দনা, সাধন ভজন কিছুই তিনি করেন না। তাই দেখে শিষ্যরা মনে করল গুরুদেব বুঝি আচার-ভ্রষ্ট হয়ে গেলেন। তারা গুরুদেবকে ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল, দু-চারজন মাত্র রয়ে গেল তাঁর কাছে। এইভাবে নিজের ইচ্ছায় ভ্রষ্টাচার হওয়ার দরুণ সাধু মহাত্মার সাধনলব্ধ তেজ ক্ষয় হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে কুষ্ঠব্যাধি তখন তাঁর শরীরে প্রবেশ করল। গুরুদেবকে গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হতে দেখে দু-চারজন শিষ্য যারা তখনো তাঁর কাছে ছিল, তারাও একে একে সরে পড়ল, শুধু একজন মাত্র শিষ্য গুরুকে ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হল না। মহাত্মা তাকে অনেক করে বুঝিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু শিষ্য গুরুর কথা শুনল না। সে প্রাণপণ যত্নে গুরুদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করল। এদিকে গুরুর ব্যাধির

প্রকোপ ভয়ানক বেড়ে গেল, কিন্তু গুরুর প্রতি শিষ্যের নিষ্ঠা তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। ঘৃণা ভয় সব ত্যাগ করে সে আগেকার মতোই গুরুর সেবা করে যেতে লাগল।

শিষ্যের এই আন্তরিক পরিচর্যায় গুরুদেব সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু একদিন পরীক্ষাচ্ছলে শিষ্যকে পদাঘাত করে তিনি কপট ক্রোধ দেখিয়ে বললেন, "তোমার সেবা আমি আর গ্রহণ করব না, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও।" শিষ্য তখন হাত জোড় করে বলল, "গুরুদেব, আপনার কাছে যে আর কেউ নেই, আমি চলে গেলে কে আপনার সেবা করবে? এমন নিষ্ঠুর আদেশ আপনি করবেন না। আপনাকে এমন অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কিছুতেই চলে যেতে পারব না।" শিষ্যের এমন গুরুভক্তি দেখে গুরুদেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর সেই কপট ক্রোধের মূর্তি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

একদিন গুরুদেবের সেবা পরিচর্যার পর শিষ্য গঙ্গায় স্নান করতে গেছে। অদূরে ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হর আর পার্বতী। শিষ্যকে দেখে পার্বতী মহাদেবকে বললেন, "দেবাদিদেব, গুরুগত প্রাণ এই শিষ্যকে তোমার বর দেওয়া উচিত।" মহাদেব হেসে বললেন, "তুমিই ওকে বর দাও না পার্বতী?" ছদ্মবেশী পার্বতী শিষ্যকে কাছে ডেকে বললেন, "কুষ্ঠরোগী গুরুকে নিয়ে দিন-রাত পড়ে রয়েছ কেন? তোমার কি প্রাণের ভয় নেই। যা ছোঁয়াচে রোগ, তোমারও তো ওই রোগ হতে পারে। নিজের ভালো চাও তো পালিয়ে যাও।" পার্বতীর কথা শুনে শিষ্য রেগে গিয়ে বলল, "কে তুমি? কেন তুমি আমাকে এমন অধর্মের কথা শোনাচ্ছ?" পার্বতী তখন বললেন, "রাগ করছ কেন? আমি তোমার ভালোর জন্যই বলছি।" শিষ্য বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমাকে আমার ভালো করতে হবে না, এমন বাজে কথা আর মুখে এনো না।"

এইরূপে বহুভাবে দেবী পার্বতী শিষ্যকে পরীক্ষা করে দেখলেন, কিন্তু গুরুভক্তিপরায়ণ শিষ্য অচল অটল। তখন তিনি নিজমূর্তি ধারণ করে শিষ্যকে বললেন, "বৎস, তোমার গুরুভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার কাছ থেকে তুমি ইচ্ছে মতো বর চাও।" শিষ্য বলল, "মা, তুমি যদি আমার উপর প্রসন্ন হয়ে থাকো তাহলে আমার গুরুদেবকে রোগমুক্ত করে দাও।" দেবী বললেন, "তথাস্তু, আজই তোমার গুরু রোগমুক্ত হয়ে দিব্যকান্তি ধারণ করবেন। বৎস, তোমার মতো গুরুনিষ্ঠা জগতে

দুর্লভ। তুমি কি চাও। স্বর্গ হোক, মোক্ষ হোক — যা তুমি চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব।" শিষ্য বলল, "মা, স্বর্গ মোক্ষ কিছুই আমি চাইনে। শুধু আমাকে এই বর দাও যেন চিরকাল গুরুদেবের চরণসেবায় আমি নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারি। আমার আর অন্য কামনা নেই।"

দেবীর বরে সাধু মহাত্মা রোগমুক্ত হলেন। সেই সঙ্গে বারো বছরও পূর্ণ হয়ে গেল। দেবীর আশীর্বাদে সদ্‌গুরু ও তাঁর আশীর্বাদে তাঁর নিষ্কাম শিষ্য পরম শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দেহান্তে কৈলাসধামে গমন করলেন।

দেখো বাবু, এরকম একজন জ্ঞানী তপস্বী সাধুকেও কুষ্ঠ ব্যাধি ভোগ করতে হল।

ভদ্রলোক ঃ আপনার সব উপদেশ শ্রবণ করে বুঝলাম, পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলাফল মনুষ্য শরীর ধারণ করলেই তাকে ভোগ করতে হবে।

এই সকল সৎসঙ্গ যখন হচ্ছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ উকিল মশাই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলেন।

সুরেন ঃ মহারাজ, এত সৎসঙ্গ আমি আপনার কাছ থেকে শুনে আসছি। এতে আমার কী কল্যাণ হচ্ছে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দশ দফায় শ্রবণ করলে, তবেই একদফে হৃদয়ে ছাপ পড়ে যায়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরীয় কথা কখনও শোনেনি, তার কি কখনো ঈশ্বর দর্শনের ইচ্ছে জাগবে? এইজন্যে শাস্ত্র বলেছেন 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' প্রথমে বলা হয়েছে আত্মদর্শন করা উচিৎ, তারজন্যে সদ্‌গুরুর কাছে আত্মা সম্পর্কে শোনা প্রয়োজন, তারপর সেই শোনা বিষয় মনন করতে হবে। সবশেষে নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান করতে হবে। ধ্যান প্রগাঢ় হলেই তবেই সমাধিতে পৌঁছান যাবে।

'দ্রষ্টব্যঃ' 'শ্রোতব্যঃ' 'মন্তব্যঃ' 'নিদিধ্যাসিতব্যঃ'

শাস্ত্র এই চারটি বাক্য বলেছেন, এর জন্যে সাধনা করতে হবে। বলা তো সহজ কিন্তু করা খুবই মুস্‌কিল। এইজন্যে একটা কথা আছে ঃ

'গুরু মিলে লাখে লাখ
শিষ্য মিলে নেহি এক।'

অর্থাৎ বলায় পারদর্শী গুরু লাখ লাখ মিলে যাবে কিন্তু করায় পারদর্শী শিষ্য একটাও মিলবে না। তাহলে প্রথমে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ কর, শ্রবণ করতে করতে তবেই ঈশ্বর প্রাপ্তির ইচ্ছে জাগবে।

সুরেন ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমাদের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ প্রথমে শ্রবণ করতে হবে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে লেখা আছে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন কিন্তু প্রথম দিকে ছিলেন না। সখীদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের রূপ গুণ শ্রবণ করে তাঁকে পাবার জন্যে শ্রীরাধা, উন্মাদ হয়ে গেলেন। আমাদের বাংলাদেশে 'চণ্ডীদাস' নামে এক কবি ছিলেন। ওই কবি শ্রীরাধার এই ভাবকে অবলম্বন করে একটি গীত রচনা করে গেছেন। ওই গীতের একটি চরণ আমি বলছি —

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ, বলো সখী
কেমনে তারে পাই"

এই গীতের তাৎপর্য হল কানের ভিতর দিয়া অর্থাৎ 'শ্রোতব্য' মরমে পশিল গো অর্থাৎ — 'মন্তব্যঃ' আকুল করিল মোর প্রাণ অর্থাৎ 'নিধিধ্যাসিতব্যঃ' বলো সখী কেমনে তারে পাই।

একদম শ্রীভগবানের রূপ গুণ ধ্যানে একেবারে বসে গেছে। তাঁকে প্রাপ্তির জন্যে উন্মাদনা জাগ্রত হয়ে গেছে। মহারাজ, এই গীতের কথা এখানে বলার উদ্দেশ্যে হল — ভক্ত আর জ্ঞানীর প্রভেদ কী? জ্ঞানীর জন্যে শাস্ত্রকার 'দ্রষ্টব্যঃ' 'শ্রোতব্যঃ", 'মন্তব্যঃ' 'নিধিধ্যাসিতব্যঃ' ইত্যাদি বাক্য বলেছেন। ভক্ত বলেছে —

'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ
বলো সখী কেমনে তারে পাই।'

শ্রীশ্রীগুরু ঃ জ্ঞানী আর ভক্তের মধ্যে কিছু ফারাক নেই। জ্ঞানী যা জিনিস চায়, ভক্তও সেই বস্তুই চায়। তবে সাধন পথে কিছু কিছু ফারাক আছে। তা-ও মিলিয়ে দিলে মিলে যাবে। যেমন রেলওয়ে লাইন, মেন লাইন, কর্ড লাইন, লুপ লাইন

স্থানে স্থানে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে লাইন একেবারে মিলে গেছে। এখন লুপ লাইন দিয়ে কাশীধাম যাও অথবা কর্ড লাইন দিয়ে যাও —উদ্দেশ্য উভয় যাত্রীরই এক — কাশীধাম গিয়ে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করবে। দেখো ভাই সুরেন, আমি তোমার কল্যাণের জন্য এত কথা বলে যাচ্ছি। এরকম তুমি যখন কাছারিতে বকবক করো, তুমি কত টাকা ফি বাবদ পেয়ে যাও। আমার জন্যে তোমার ফি হল — তুমি এইসব উপদেশ গ্রহণ করবে আর কিছু কিছু উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করবে।

ঝুটী ঝুটী খেলে
সাচ্চি সাচ্চি হোয়

ভালো কথার ভান বা নকলও ভালো, নকল থেকেই একদিন আসল ফুটে ওঠে। এই ভাবের একটি গল্প মনে পড়েছে, তোমাকে শোনাচ্ছি।

জেলের সাধু হওয়ার গল্প

এক জেলে মাছ ধরছে। এমন সময় সে শুনতে পেল রাজার একদল সেপাই হইহই করে ছুটে আসছে। এই সেপাইরা যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে বেগার খাটায়, পয়সা কড়ি কিছু দেয় না। জেলের ভয় হল — আমাকে দেখতে পেলেই ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাবে আর আমাকে বেগার খাটিয়ে নেবে। এখন আমি ওদের হাত থেকে কী করে বাঁচি? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তাড়াতাড়ি সে জাল গুটিয়ে নিয়ে রাস্তা থেকে খানিকটা ধুলো নিয়ে বেশ করে গায়ে মেখে নিল। তারপর রাস্তার ধারে আসন পেতে সাধুর ভান করে বসে রইল।

সেপাইরা পাকড়াও করতে করতে সেখানে এসে দেখে এক সাধু বসে আছে। সাধুকে দেখে সেপাইরা প্রত্যেকে একটা করে টাকা তার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে চলে গেল। সবাই যখন চলে গেল এবং স্থানটি নিস্তব্ধ হয়ে গেল, তখন জেলে আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল তার সামনে পায়ের কাছে একগাদা টাকা পড়ে রয়েছে। গরীব জেলের তখন মনে হতে লাগল, আমি সাধুর ভান করে বসেছিলাম তাতেই আমার এত সম্মান আর পায়ের কাছে এতগুলো টাকা পাওয়া গেল। যদি সত্যিকারের সাধু হয়ে যেতে পারতাম তাহলে না জানি কী অপার্থিব বস্তু আমার লাভ হত। এইভাবে বিচার করতে করতে জেলের মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। সে

আসল সাধু হয়ে আমন ভজনে মন দেখে বলে সংসার ত্যাগ করে চলে গেল।

দেখো সুরেন, এই গল্পের তাৎপর্য কী হল? তাৎপর্য হল — ভাল বস্তুর নকলও ভাল ফল দিয়ে থাকে।

সুরেন ঃ মহারাজ, নকল সাধু আর আসল সাধু কী করে চেনা যাবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ জহুরি জহর চেনে। সাধারণ মানুষ চিনতে পারে না। কিন্তু তুমি জহুরী হয়ে যাও, তাহলে জহর চিনে নেবে। এই ভাব নিয়ে খুব সুন্দর এক দৃষ্টান্তের গল্প মনে পড়েছে, তা তোমাকে শোনাচ্ছি। এই গল্পের ভাব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি হয়ে যাবে।

জহুরী ও দাগী মণির গল্প

এক জহুরী ছিল, একেবারে পাকা জহুরী। এই কাজ করেই জহুরী ঘরবাড়ি, ধনদৌলত সব কিছু করে ফেলল। কিছুকাল পর ওই জহুরী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। এমনই তার রোগ যে চিকিৎসার কোন ফল পাওয়া গেল না। ওষুধপত্র আর কবিরাজের খরচ মেটাতে ঘর থেকে শুধু রাশীকৃত টাকা বেরিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে একদিন নিঃস্ব অবস্থায় একমাত্র নাবালক পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে জহুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জহুরীর মৃত্যুতে তার পুত্র ও পত্নীর খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধা হতে লাগল। কোনোদিন খাওয়া জোটে, কোনোদিন জোটে না। একদিন ঘরে কিছু নেই দেখে মা একটা মণি ছেলের হাতে দিয়ে বলল, "তোমার বাবার এক পুরনো কর্মচারী এখন জহুরীর ব্যবসা করে। তুমি তার দোকানে গিয়ে মণিটা তার কাছে বিক্রি করে এসো। সে তোমার বাবার বড়ো বিশ্বাসী লোক ছিল। সে তোমাকে ঠকাবে না, তার কাছ থেকে ন্যায্য দামই পাওয়া যাবে।"

মণিটা নিয়ে ছেলে গেল জহুরীর কাছে। জুহুরী দেখল মণিটা দাগী, এরকম মণি ঘরে রাখতে নেই। এতে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, গৃহস্থকে ধনে প্রাণে মারা পড়তে হয়। তাই এসব মণি ফেলে দেওয়াই মঙ্গল। জহুরী বুঝল এই মণি ঘরে থাকার দরুণই তার আগেকার মনিবের সংসারে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। কিন্তু সেকথা ছেলেটিকে বা তার মাকে সে বোঝাবে কেমন করে? তারা কেউই তো এসব জিনিস

চেনে না। হয়তো তারা তাকে ভুল বুঝে বসবে। এসব ভেবে জহুরী ছেলেটিকে বলল, "ভাই, এ মণি তুমি এখন বেচো না, এখন ওটা তোমাদের কাছেই রেখে দাও। তুমি বরং এখন থেকে রোজ আমার দোকানে কাজ করতে থাকো। আমি তোমাকে মাসে কুড়ি টাকা করে দেব। তাতে তোমার কাজ শেখাও হবে, তোমাদের খাওয়া পরাও চলে যাবে।"

জহুরীর কথা মতো মণিটা ঘরে রেখে ছেলেটি তার দোকানে কাজ করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে সে-ও একজন পাকা জহুরী হয়ে উঠল। একদিন এক রাজা একটা দাগী মণি নিয়ে জহুরীর দোকানে বিক্রি করবেন বলে এসেছেন। জহুরী জেনেশুনেও অনেক টাকা দিয়ে সেই মণি কিনবে বলে কথাবার্তা বলতে লাগল। তাই দেখে ছেলেটি বলে উঠল, "ও মণি কিনবেন না, ওটা দাগী, ও মণি ঘরে রাখলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।" জহুরী দেখল তার মনিবের ছেলে নিজেই এখন পাকা জহুরী হয়ে উঠেছে। এবার সে ছেলেটিকে বলল, "যাও তো ভাই, সেদিন যে মণিটা আমার কাছে বেচবে বলে নিয়ে এসেছিলে, সেই মণিটা একবার বাড়ি থেকে নিয়ে এসো তো।" ছেলেটি বাড়ি থেকে মণি নিয়ে এলে জহুরী রাজার মণিটা দেখিয়ে তাকে বলল, "এবার এ মণিটার সঙ্গে তোমার ওই মণিটা কবার মিলিয়ে দেখো তো?" মেলাতে গিয়ে তার তো চক্ষুস্থির, সে দেখল তার মণিটাও যে দাগী! এতদিনে সে বুঝতে পারল যে এই মণি ঘরে ছিল বলে তাদের এত দুরবস্থায় পড়তে হয়েছে। সে তখনই মণিটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দেখো ভাই সুরেন, তোমারও যখন জ্ঞান হবে তখন তুমি আপনা থেকেই অনিত্য বস্তু ত্যাগ করবে। আর সেই সঙ্গে নিত্যবস্তুর সন্ধান করবে। তোমার নিজের যখন জ্ঞান হবে তখন তুমি নিজে থেকেই সাধু অসাধু চিনে নেবে। নিত্য অনিত্য বুঝে নিতে পারবে। দেখো ভাই সুরেন, তুমি তো 'সাধুসঙ্গরূপ' জহুরীর দোকানে বসে আছ। সেখানে কিছু দিন কাজ করার পর তুমি পাকা জহুরী হয়ে যাবে। আমাকে কিছু বলতে হবে না। এখন আমি যদি বলি সুরেন, সংসার আছে, তুমি ওই সংসারে আসক্তি ত্যাগ কর, তুমি কি তাহলে আমার কথা মানবে? এ হল নিজের বোধগম্য বিষয় অর্থাৎ নিজেকেই বোধ করতে হবে, বুঝতে হবে। এছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। জ্ঞান হবার জন্য জহুরীর সঙ্গ করতে হবে। অর্থাৎ সাধু, জ্ঞানী পুরুষের সঙ্গ করতে হবে। তাহলে কিছুদিন পর জ্ঞানীর জ্ঞান তোমার অন্তঃকরণে স্থায়ী আসন

পেতে নেবে। আর নিত্যানিত্য বোধ এসে যাবে।

সুরেন ঃ মহারাজ, আমাদের পাত্র ফুটো। এত জিনিস আপনি আমাদের দিচ্ছেন, জলের মতো পান করিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু কিছু লাভ হচ্ছে না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদের 'অন্তঃকরণরূপী পাত্র' ফুটো আছে। যা কিছু বস্তু আমাদের কল্যাণের জন্য আপনি দিচ্ছেন ফুটো পাত্রের জন্য তা সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, ফুটো পাত্রও হোক কোনো ক্ষতি নেই। এর ভাব নিয়ে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একটা ফুটো পাত্রে ঘি রাখা হয়েছে। সূর্যের উত্তাপে সেই ঘি গলে গেল। ফুটো পাত্রের জন্যে ঐ ঘি বাইরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তবু পাত্রটার গায়ে ঘিয়ের একটা চেকনাই বা উজ্জ্বলতার একটা ছাপ রয়েই গেল। সেটুকু তো আর মুছে যাবে না। একটু না একটু থেকে যাবেই। অর্থাৎ একজন সাধু মহাত্মার কাছে আসলে তাতে কিছু না কিছু লাভ তার হবেই। অন্য কিছু লাভ না হলেও তাঁদের আশীর্বাদ সে তো পাবেই। সাধু মহাপুরুষের কাছে গেলে মানুষের কত কল্যাণ হয়ে থাকে, মানুষ তা ধারণা করতে পারে না। এই ভাবের একটি গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি —

সাধু দর্শনের ফল

এক রাজা সাত মহল্লা প্রাসাদে বাস করতেন। একদিন তিনি বারান্দা থেকে দেখতে পেলেন মাঠের মধ্যে এক জায়গায় ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। রাজা আগুন দেখে বুঝে গেলেন ওখানে কোনো সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। রাজার ইচ্ছে হল, একবার ছদ্মবেশে ওখানে গিয়ে সাধুদর্শন করে আসবেন। কেউ যাতে তাঁকে চিনতে না পারে সেইজন্যে রাত্রিবেলা সঙ্গে কোনো লোকজন না নিয়ে সাধারণ বেশে তিনি প্রাসাদ থেকে রওনা হলেন। রাজার এক ভয়ংকর শত্রু ছিল। সে ঠিক করেছিল যে সেই রাতেই সে রাজপ্রাসাদে যাবে এবং রাজা যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন সেই ঘরে ঢুকে রাজার গলায় ছুরি বসিয়ে তাঁকে খুন করবে। রাজা চলেছেন সাধুদর্শনে আর তাঁর শত্রু আসছে রাজপ্রাসাদের দিকে। পথে দুজনের দেখা হল, কিন্তু রাজার দেহে রাজবেশ নেই, সঙ্গে সেপাই-শান্ত্রী কেউ নেই, তিনি একলা চলেছেন, তাই তাঁর শত্রু তাকে রাজা বলে চিনতে পারল না, সে রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

সাধু দর্শন করতে হলে প্রয়োজন মত একলাই চলে যাওয়া ভাল। কারুর জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এবিষয়ে দোঁহা আছে — 'সন্ত মিলনকো যাইয়ে

সন্ত মে না লিজিয়ে কোই। পিছু পাও নেহি দিজিয়ে যো হোনেকা হ্যায় সো হোই।'

এদিকে রাজবাড়িতে তখন আর এক কাণ্ড চলেছে। রাজার চাকর বিছানা করতে এসে দেখে ধারে কাছে কেউ নেই। রাজাও রাত্রিবেলা বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। সে ভাবল এই সুযোগে রাজার গদিমোড়া বিছানায় শুয়ে একবার মনের সাধ মিটিয়ে নিই। এইভেবে রাজার চাদরখানা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সে সেই বিছানাতে শুয়ে পড়ল আর অমন নরম গদিতে শোবার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে ঘুম নেমে এল। চাকর মাথার থেকে পা পর্যন্ত চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে, তাই রাণী যখন সে ঘরে শুতে এলেন তখন ভাবলেন রাজাই বুঝি বিছানাতে শুয়ে আছেন। তাঁর মনে কোনো রকম সন্দেহ হল না, তিনি বিছানায় উঠে চাকরের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় রাজার শত্রু সেই ঘরে ঢুকল। সে মনে করল রাজারাণী দুজনে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাই সুযোগ বুঝে সে তখনই রাজা শুয়ে আছে মনে করে চাকরের মাথাটা কেটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

যে মুহূর্তে চাকরের মাথা কাটা গেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার পায়ে একটা কাঁটা ফুটল। অসহ্য যন্ত্রণায় রাজা অস্থির হয়ে পড়লেন, কিন্তু তবু সেই অবস্থাতেই অতি কষ্টে সাধুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। সাধুদর্শন করতে এসে এরকম বিপত্তি ঘটায় রাজা একটু মনক্ষুন্ন হয়ে সাধুকে বললেন, "বাবা, পরম ভক্তিভরে আপনাকে দর্শন করে পুণ্য সঞ্চয় করব বলে এসেছি, তা সত্ত্বেও আমার কপালে এমন অঘটন ঘটল, পায়ে এমন কাঁটা ফুটল যে তার দরুণ রক্তপাত পর্যন্ত ঘটে গেল। এই যদি সাধু দর্শন করতে আসার পরিণাম হয় তাহলে সাধুদর্শনের ইচ্ছা আর আমি করবো না।

রাজার কথা শুনে সাধু হাসতে লাগলেন। ঐ সাধু ছিলেন একজন সিদ্ধ পুরুষ। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি জানতে পেরেছেন। তিনি রাজাকে বললেন, "রাজা, আজ যে তোমার মাথা কাটা যেত। তোমার ভাগ্য যে আজ তুমি সাধু দর্শন করতে বেরিয়েছিলে, তাই তোমার গর্দান বেঁচে গেল। মাথা কাটার পরিবর্তে কাঁটা ফুটে পায়ের উপর দিয়েই তোমার ফাঁড়াটা কেটে গেল।" সাধু তখন রাজাকে তার শত্রুর কথা। রাজবাড়িতে কী ঘটেছে — সমস্ত সবিস্তারে শুনিয়ে বললেন, "দেখো রাজা, সাধু দর্শনের ফল কখনো বৃথা যায় না। আজ তুমি আমার কাছে এসেছ বলেই এমন আশ্চর্যভাবে তোমার প্রাণটা বেঁচে গেল।"

রাজবাড়িতে ফিরে এলে রাজা সবকিছু দেখলেন, শুনলেন। এবার তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে সাধু ঠিক কথাই বলেছেন, সাধুদর্শনের পুণ্যফলেই আজ তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছে।

দেখো ভাই সুরেন, ক্ষুদ্র গল্পের দৃষ্টান্ত থেকে সাধু দর্শনের ফল কীরূপ হয় তা বুঝিয়ে দিল।

সুরেন ঃ হ্যাঁ, মহারাজ, আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র। এই জন্যে কাঁটাফোটার দুঃখটা খুব বুঝি। কিন্তু প্রাণ বেঁচে গেল — এই ভাব যখন বুঝতে পারি তখন কাঁটা ফোটার দুঃখটা আর কিছুই মনে হয় না, বরং আনন্দই হয়।

মহারাজ, আপনার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হল — আপনার তো বহু ভক্ত শিষ্য আছে —আপনি কী তাদের সবাইকে সমানভাবে প্রীতি করে থাকেন? মহারাজ আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমি জানি — আমার মনে কোন প্রশ্ন জাগলে আপনি তা সহজে সমাধান করে দেবেন। কোন দ্বেষ বুদ্ধির বশবর্তী হয়ে আপনাকে এই প্রশ্ন করছি না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ সুরেন, তুমি ভাল কথা উত্থাপন করেছ। এ কথাবার্তা থেকে অনেক কথাবার্তা এসে যাবে। ভগবানকেও কোন কোন মানুষ পক্ষপাত দোষ দিয়ে থাকে। ভগবান কোন ব্যক্তিকে সুখ আবার কাউকে দুঃখ দিচ্ছেন, কেন? এখানে কর্মফলের কথা বলা হয়েছে — যে ব্যক্তির যেমন কর্ম হয়ে থাকে, ভগবান সেরকমই ফল দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে ভগবানের কোনো পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না। এইভাব সহজে বোধগম্য করানোর জন্যে একটা দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি। এই গল্প থেকে তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

জমিদার ও ঘড়ার গল্প

এক জমিদারের অনেক কর্মচারী। যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি কর্মচারীদের মাইনে দেন। কর্মচারীরা এতে কিন্তু সন্তুষ্ট নন। একদিন এক গোমস্তা এসে জমিদারকে বলল, "হুজুর, নায়েবমশাইকে আপনি একশো টাকা মাইনে দেন আর আমাকে দেন মাত্র কুড়ি টাকা। তিনিও আপনার চাকর, আমিও আপনার চাকর। তবে আমিই বা কম মাইনে পাব কেন?" গোমস্তার কথা শুনে জমিদার হেসে বললেন, "তোমার প্রশ্নের জবাব আমি পরে দেব, আপাতত তুমি আমার একটা কাজ করে দাও।" এই বলে জমিদার তাকে একটা নতুন মাটির ঘড়া দিয়ে বললেন, "এই ঘড়াটা তুমি বাজারে

নিয়ে যাও। দোকানদারদের কাছে গিয়ে ঘড়ার ভিতরটা তুমি ঘি মাখিয়ে নিয়ে এসো। তবে এর জন্যে আমি একটা পয়সাও খরচ করতে পারব না।"

ঘড়াটা নিয়ে গোমস্তা বাজারে গিয়ে দোকানদারকে বলল, "ভাই, ঘড়ার ভিতরটা তুমি ঘি মাখিয়ে দাও, তবে তারজন্য আমি কিন্তু পয়সা দিতে পারব না।" দোকানদার তাকে বলল, "পাগলামি করার আর জায়গা পেলে না? নতুন মাটির ঘড়াতে ঘি মাখাতে কত ঘি লাগে জান? এত ঘি বিনা মূল্যে কী করে দেব?" সারা বাজারে ঘুরে গোমস্তা হায়রান হয়ে গেল। কোনো দোকানদার বিনা পয়সায় তাকে এক ফোটা ঘিও দিল না। গোমস্তা তখন ঘড়া নিয়ে জমিদারের কাছে ফিরে এসে বলল, "হুজুর, পয়সা ছাড়া কোনো দোকানদার ঘি দিতে রাজী হল না।"

জমিদার এবার নায়েবকে ডেকে সেই একই কাজের ফরমান করলেন। নায়েব বললেন, "যথা আজ্ঞা হজুর। আমি ঘড়াতে ঘি মাখিয়ে নিয়ে আসছি।" জমিদার তখন গোমস্তাকে বললেন, "তুমিও যাও নায়েবের সঙ্গে। দেখে এসো, নায়েব বাজারে গিয়ে কী করে।"

বাজারে যে জায়গায় ঘি বিক্রি হয় নায়েব সেখানে গিয়ে এক দোকানদারকে বলল, "ওহে, ভালো ঘি থাকলে আমাকে এই ঘড়ায় দশ সের ঘি দিয়ে দাও।" নায়েবের কথা শুনে চারদিক থেকে দোকানদাররা তাকে ডাকতে লাগল। এ বলে আমার ঘি ভালো, ও বলে আমার কাছে আসুন, আমার ঘিয়ের মতো ঘি কোথাও মিলবে না। নায়েব এক দোকানদারের কাছ থেকে দশ সের ঘি ঘড়ায় ভরে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বলল, "আরে তোমার ঘি যে কেমন তাই তো এখনও দেখা হয়নি।" এই বলে ঘড়া থেকে খানিকটা ঘি হাতে তুলে নিয়ে নায়েব তা শুঁকে বলল, "আরে ছ্যা ছ্যা, এই তুমি ভালো ঘি বলে চালাচ্ছ? এমন দুর্গন্ধ জানলে কে তোমার কাছে ঘি নিত? এই ঘি নিয়ে গেলে মনিব কী আমার মুখ দেখবেন? আমার চাকরিটাই তুমি খাবে দেখছি। এখনই আমার ঘড়া খালি করে দাও। এ ঘি আমার চাইনা।" দোকানদার আর কী করে? প্রথমে সে ঘড়া থেকে ঘি ঢেলে নিল, তারপর হাত দিয়ে যতটা সম্ভব চেঁচে ঘি বের করতে লাগল। একে মাটির ঘড়া, তার উপর নতুন, এতক্ষণ কথাবার্তার ফাঁকে অনেকটা ঘি ঘড়া শুষে নিয়েছে। নায়েব সেই ঘড়া নিয়ে জমিদারের কাছে এসে বলল, "এই দেখুন, এক পয়সা খরচ না করে ঘড়ার ভিতরটা কেমন ঘি মাখিয়ে এনেছি।"

জমিদার অবাক হয়ে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ তুমি কী করে করলে?" নায়েব তখন হাসতে হাসতে জমিদারকে সব ঘটনা খুলে বলল। জমিদার তখন গোমস্তাকে বললেন, "দেখলে তো, তুমি যে কাজ করতে পারোনি, নায়েব কেমন বুদ্ধি খাটিয়ে সেই কাজ করে এল। তুমিও আমার কাজ করো, নায়েবও আমার কাজ করে। তবে তোমাদের বুদ্ধির তফাতটা তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে। আমি কারুর প্রতি পক্ষপাত করিনা, যার যেমন যোগ্যতা, তাকে সেইভাবেই মাইনে দিই। তাইতে কেউ বেশি পায়, আবার কেউ কম পায়।"

দেখো বাছা সুরেন, পাত্র হতে হবে। বৃষ্টির জল পড়ছে সমস্ত জায়গায় যেখানে পাত্র আছে সেখানে সেই জল ধরে রাখা যায়। যেখানে পাত্র নেই সেখানে জল গড়িয়ে বেরিয়ে যায়। এতে বৃষ্টির কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

পরমাত্মা হলেন এই দুনিয়ার রাজা। তাঁর কাছে সমস্ত বস্তু আছে। পরমাত্মা আমাদের দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন, কিন্তু আমরা যেরকম পাত্র নিয়ে তাঁর কাছে যাই, সেই পাত্র অনুযায়ী বস্তু পাই। কোন ব্যক্তি চটের থলি নিয়ে গিয়ে বলে — হে পরমাত্মাদেব , এই থলিতে দুধ দিন।

— না, তা হবে না। ওই থলিতে চাল, ডাল, গম ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওই থলিতে দুধ নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কেউ ডালা, ধামা নিয়ে গিয়ে বলছে — হে ঈশ্বর, আমাকে এতে তেল দাও।

— না, তা হবে না। ওতে করে আটা চিনি ইত্যাদি নিয়ে যাওয়া যাবে কিন্তু দুধ বা তেল নিয়ে যাবার জন্যে গামলা, বালতি ইত্যাদি পাত্র নিয়ে আসতে হবে। পরম দয়াল তাকে দুধ তেল ইত্যাদি দিতে প্রস্তুত কিন্তু থলে বা ডালা নিয়ে গিয়ে দুধ, তেল চাইলে ওসব জিনিস পাওয়া যাবে না। এইজন্যে প্রথমে পাত্র হতে হবে। পরমাত্মাদেব পক্ষপাতশূন্য, তবে পাত্র অনুযায়ী তিনি বস্তু দিয়ে থাকেন। আর একটা দৃষ্টান্ত আছে। এক মাতার চারটি সন্তান। এই চার সন্তানকে তিনি চার রকম খাবার দিলেন। একজনকে দিলেন পোলাও অন্ন, কাউকে দিলেন পোরর ভাত, কাউকে দিলেন বার্লি, চতুর্থ সন্তানকে দিলেন ডাল ভাত। কেন তিনি এভাবে দিলেন। যদি মাতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে তিনি বলবেন — ভালবাসা আমার সব সন্তানের জন্য সমান আছে, কিন্তু যার যেমন হজম হবে, সেই অনুসারে তাদের খাদ্য দিয়ে থাকি।

দেখো ভাই সুরেন — এক্ষেত্রে মাতার কোনো পক্ষপাতিত্ব দোষ নেই। দেখো ভাই, তোমার প্রশ্নের উত্তর মিলে গেছে তো? তোমার প্রশ্ন ছিল — আমি আমার সব শিষ্যকে সমান প্রীতি করে থাকি, না কম বেশি প্রীতি করে থাকি। এর উত্তর হল — যেমন অধিকারী, তদনুযায়ী প্রীতি করতে হয়। দেখো, এই কথায় তোমার কি কোন সংশয় আছে?

সুরেন ঃ মহারাজ, আমার যা সংশয় ছিল, তার সব সমাধান হয়ে গেছে। এখন আমার চিত্ত সুস্থ হয়েছে, মনে শান্তি এসেছে।

সুরেন বর্মন উকিল মশাই-এর সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের যেদিন এই সৎসঙ্গ হয়েছিল, সেদিন আমি (লেখিকা) উপস্থিত ছিলাম। উপদেশগুলি যেমন শুনেছিলাম যথাসাধ্য তা লিপিবদ্ধ করলাম।

সপ্তম পর্ব

স্থান ঃ ধ্যানকুঠী

১৩৪০ সাল ঃ অগ্রহায়ণ মাস ঃ সময়- সকাল

ভাগলপুরের কমিশনার চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ ঃ ম্যানেজার বন্ যাইয়ে ঃ কৃপন কে আর দাতাই বা কে ঃ মর্ত্যলোক হল কর্মভূমি আর স্বর্গ আদি লোক হল ভোগভূমি ঃ পরজন্মের জন্যে এ জন্মে শুভ কাজ করে যাও ঃ শ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী কথিত নিজ জীবনের কাহিনি -- প্রসঙ্গ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর]

ভূমিকা - চারু বাবু অতি অমায়িক ব্যক্তি, একাধারে ধন ও বিদ্যা দুই তাঁর আছে, অন্যদিকে স্বভাবে তিনি একেবারে নিরভিমানী। কমিশনার সাহেব চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এসে গুরুমহারাজকে প্রণাম করে বললেন --

চারু ঃ মহারাজ বহুদিন আমার ইচ্ছে হয়েছে একবার স্বামীজীর (শ্রীবালানন্দ মহারাজ) কাছে যাব, কিন্তু কার্যে পরিণত করতে পারিনি। আমার এক নাতি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তখন অমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম - এই বালক কিছুটা আরোগ্য হয়ে গেলে আমি স্বামীজীর কাছে যাব। মহারাজ, আমার নাতি কিছুটা সুস্থ হয়েছে, তাই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে আজ আমি আপনার কাছে এসেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বেশ বাছা, তুমি এসেছ, তোমার নাতির জন্যে এই বিভূতি মরিচ নিয়ে যাও। এই বিভূতি মরিচ এক দৈব বস্তু। বহু উৎকট উৎকট রোগী আমার কাছে এসে থাকে; আর বলে, বাবা, ওষুধ দাও। আমি তখন করি কি, আমার ঝোলা থেকে কিছু বিভূতি আর মরিচ দিয়ে দিই। কিন্তু পরমাত্মাদেবের কীরকম কৃপা যে তাতেই রোগী অরোগ্য হয়ে যায়। কীভাবে অরোগ্য হয়ে যায় তাতে আমিই আশ্চর্য হয়ে যাই। মানুষের ভক্তির প্রভাবেই রোগ ভাল হয়ে যায়।

'সংকল্প শুদ্ধ তো সংকল্প সিদ্ধ' -- মনের সংকল্প যখন শুদ্ধ হয়ে যায়, দৃঢ়ভূত হয়ে যায় তখন ওই সংকল্প সিদ্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। রোগীর মনে বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মহাপুরুষ ঝুলি থেকে ওষুধ (সিদ্ধ মরিচ ও বিভূতি) দিয়েছেন তাতে আমি অবশ্যই ভালো হয়ে যাব, এতেই ফল মিলবে। তুমি তোমার

নাতির জন্যে এই বিভূতি ও মরিচ নিয়ে যাবে।

চারু ঃ বাবা, আপনার হাত থেকে যখন বিভূতি ও মরিচ পাওয়া যায় তখন সেই সঙ্গে আপনার আশীর্বাদও পাওয়া যায়, এতে অবশ্যই ফল মিলবে। মহারাজ, আপনার কাছে আমি এসেছি, আমাদের কিছু উপদেশ দান করুন--

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাছা, তুমি একজন উত্তম অধিকারী। তোমার জন্যে বেশি কিছু বলবার দরকার হয় না। উত্তম অধিকারী ইঙ্গিত মাত্রেই বিষয় বস্তু বুঝে যায়। তোমাকে একটা কথা বলছি -- কথাটি হল, আপ্ ম্যানেজার বন্ যাইয়ে অর্থাৎ আপনি ম্যানেজার হয়ে যান। পরমাত্মাদেব হলেন তোমার মালিক, তুমি হলে ওনার ম্যানেজার। মালিক তোমার হাতে এস্টেট দিয়েছেন। তুমি ওই এস্টেটকে যত্নপূর্বক চালাবে। এস্টেট অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র ধনদৌলত যা কিছু আছে, এমনকি আপনার নিজের শরীর পর্যন্ত সবকিছু পরমাত্মাদেবের। একদম ভিতর থেকে বুঝে রাখবে, যা কিছু বস্তু আমি পেয়েছি -- এসব আমার নয়, এ সমস্ত জিনিস মালিকের। আমি ওনার ম্যানেজার মাত্র, আমার বেতন - পোয়া ভর্ত্তি অন্ন, সাড়ে তিন হাত জমি, গাত্রে আচ্ছাদিত বস্ত্র, এর বেশি তোমাকে দিলেও তুমি নিতে পারবে না। এখন চারুবাবু আপনি বলুন, আপনি ম্যানেজার হবেন, না মালিক হবেন।

চারুবাবু ঃ না না বাবা, আমি মালিক নই ম্যানেজারও নই, আমি চাপরাশী মাত্র। ম্যানেজার পদবি অনেক বড়ো পদ হয়ে থাকে, আমি তার চেয়েও আরো ছোট, আমি একটা সামান্য চাপরাশী মাত্র। লোকেরা আমার অনেক টাকার বেতন দেখে আমাকে বড়োলোক বলে জেনে গেছে। কিন্তু আমার কাছে একটা কড়িও থাকে না। আমার যখন দু' টাকার দরকার হয়ে তখন তা আমার চাপরাশীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কাজ চালাতে হয়। আমার কাছে দু' টাকারও অভাব। আমি তাহলে কী করে বড়োলোক হব। আমি একজন গরীব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ চারুবাবু, তুমি তো বড়োই কৃপণ। তুমি তো তোমার টাকাকড়ি বড়ো ব্যাঙ্কে পুঁজি করে রাখছ।

চারু ঃ স্বামাজী, এ কী রকম কথা হল, আমি বুঝতে পারছি না। আমি তো সব টাকা শুভ কাজে খরচ করে দিচ্ছি, তাহলে আমি কৃপণ হলাম কী করে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর তাৎপর্য হল, 'জো হাতে সো সাথে' অর্থাৎ নিজ হাতে সৎকাজে যা ব্যয় করে যাবে তা সব তোমার সঙ্গে যাবে আর এখানকার যা কিছু টাকাকড়ি সব

এখানেই পড়ে থাকবে। তুমি মরে গেলে পর তার থেকে এক কানাকড়িও তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। পরের জন্যে তা পড়ে থাকবে। এখন নিজের হাতেই যা কিছু খরচ করছ ওই ধন তোমার সঙ্গে যাবে, বড়ো ব্যাঙ্কে অর্থাৎ ভগবানের কাছে জমা পড়বে। পরের জন্মে তুমি সেটা পাবে। এবার আমার কথাটা বুঝলে তো? তুমি সৎকাজে তোমার টাকাকড়ি খরচ করে দিচ্ছ, তার মানে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবার যোগাড় করছ। এখন বলো ভাই, তুমি কৃপণ, না কৃপণ নও?

এইজন্যেই একটা কথা আছে 'যো হি দাতা সো হি কৃপণ, যোহি কৃপণ সো হি দাতা' অর্থাৎ দাতা যে দিচ্ছে, সেটা সে নিজের জন্যে কৃপণের মতো জমাচ্ছে, পরের জন্মের পুঁজি করছে, আর যে এখানে সব নিজের জন্যে জমিয়ে রাখছে কৃপণের মতো, সে-ই সব খুইয়ে বসে থাকছে, যেন দাতা হয়ে সব পুঁজি ফেলে রেখে যাচ্ছে পরের জন্যে এখানেই। একবার আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। আমার প্রিয় শিষ্য শরৎ চন্দ্র সিংহ আমাকে তার অফিসে নিয়ে গিয়েছিল। অফিসে সবাই আমাকে প্রণাম করার পর এক চৌবেজী আমাকে বলল, "বাবা, এই বৈশ্য বড়ো কৃপণ, আপনি একে কিছু উপদেশ দিন।" আমি বললাম, ভাই, একে কেন তোমরা কৃপণ বলছ, এ তো পরম দাতা। ও তো সমস্ত ধন পুঁজি করে রাখছে। মরবার পর যাকে দেবে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে যাবে। মরবার সময় ওতো সঙ্গে করে কিছুই নিয়ে যাবে না, তবে ও কৃপণ হল কী করে? ও তো পরম দাতা। 'যো হাতে সো হি সাথে' ও তো নিজের হাতে দান-ধ্যান কিছুই করেনি, ও কী জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাবে? ও তো পরের জন্যে সমস্ত পুঁজি করে এখানেই রেখে যাচ্ছে, মরবার সময় সেই পুঁজি পরকে দিয়ে চলে যেতে হবে। বড়ো ব্যাঙ্কে (ঈশ্বরের কাছে) ওর কোন পুঁজি জমবে না, নিজের জন্যে ওর কিছুই থাকবে না। আর এখন দেখো ভাই চারবাবু, তুমি কৃপণ, না কৃপণ নও।

চারুবাবু গুরুমহারাজের এই কথা শুনে খুব হাসলেন এবং অতিশয় প্রীত হয়ে বললেন –

চারু ঃ স্বামীজী, এখন আমি বুঝে গেলাম আপনি কেন আমাকে কৃপণ বলেছেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ ভাই তোমাকে বোঝাবার জন্য আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্তের গল্প শুনিয়ে দিচ্ছি। দৃষ্টান্তের অতি ক্ষুদ্র গল্পের মধ্যে বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তের ভাব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি হোয়ে যায়–

রাজাকে দ্বীপে নামিয়ে দেবার গল্প

এক রাজ্যে এমন এক নিয়ম ছিল যে, যে ওই রাজ্যে রাজা হবে সে এক বছর রাজত্ব করবে। এক বছর মেয়াদ শেষ হলে সেই রাজাকে একটা দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হোত। এক বছর সুখে রাজত্ব করার পর জনমানবশূণ্য সেই দ্বীপে গিয়ে রাজাকে দারুণ দুরবস্থায় দিন কাটাতে হোত। সেখানে না ছিল ঘরবাড়ি, না ছিল খাওয়া-দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা। বনের ফলমূল খেয়ে আর রোদবৃষ্টি সহ্য করে সেই দ্বীপে অকালে তারা মারা পড়ত।

একবার সেই রাজ্যে একজন নতুন রাজার রাজত্ব শুরু হয়েছে। এই রাজা বড়ো চতুর ও বুদ্ধিমান। সিংহাসনে বসেই তিনি মন্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,"আমি তো এখানকার রাজা, এখন আমি যা যা হুকুম করব, তা ঠিক মতো পালন করবে তো?" মন্ত্রী বলল, "হুজুর, আপনি যা যা হুকুম করবেন তা সব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।" নতুন রাজা তখন মন্ত্রীকে বললেন, "মেয়াদ শেষ হবার পর রাজাদের যে দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে এই রাজধানীর মতো একটা নগর বানিয়ে দাও। ঘর-বাড়ি, দোকান-বাজার, লোকজন এখানে যেমন রয়েছে, সেখানেও সব ঠিক তেমন হওয়া চাই।" রাজার হুকুমে সেই দ্বীপে রাজধানীর মতো আর এক শহর দেখতে দেখতে গড়ে উঠল। এবার এই রাজার এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পাঠানো হল সেই দ্বীপে। সেখানে গিয়ে তাঁর কোন কষ্ট হল না, কেননা তিনি তো আগে থেকেই ওই দ্বীপকে নগরে রূপান্তর করেছেন। মনের আনন্দে তাঁর দিন কেটে যেতে লাগল।

দেখো ভাই চারুবাবু, এই মনুষ্য জীবনই আমাদের রাজত্ব, আমরাই এখানকার রাজা। জীবন শেষ হলেই আমাদের যেতে হবে দ্বীপান্তরে অর্থাৎ পরলোকে। তাই এই জীবনেই পরলোকের জন্যে কিছু সম্বল আমাদের সংগ্রহ করে রাখা দরকার। পাপ-পুণ্য যা কিছু আমরা এই জীবনে অর্জন করি,তারই ভোগ হয় পরলোকে। তাই এই মর্ত্যলোককে বলা হয় কর্মভূমি আর স্বর্গ আদি লোক হল ভোগভূমি। শুভকাজ বা সৎকাজের দ্বারা এই জীবনে পুণ্য সঞ্চয় করতে না পারলে পরলোকে আমাদের রিক্ত হাতেই যেতে হবে। আগে থাকতে সেখানকার জন্যে কোনো ব্যবস্থা করে না রাখায় আমাদের দুর্ভোগের আর শেষ থাকবে না।

চারু ঃ মহারাজ, মর্ত্যলোক কর্মভূমি আর স্বর্গ আদি ভোগভূমি – এই কথার তাৎপর্য আমি বুঝলাম না এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ এর তাৎপর্য হল, মর্ত্যলোকে মানুষ যা যা কাজ করে থাকে, স্বর্গ আদিতে গিয়ে মানুষ তার ফল ভোগ করে। এই কারণে মর্ত্যলোক উপার্জনের স্থান, পাপ-পুণ্য এখানেই মানুষের উপার্জন হয়ে থাকে। এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন পেয়ে মানুষ যা কিছু উপার্জন তা করে নেয়। দেখো ভাই চারুবাবু, যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমাকে দ্বীপে (পরলোকে) নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো ভালো অর্থাৎ শুভকাজ করে নাও। দ্বীপে তুমি সুসজ্জিত নগর নির্মাণ করে দাও, কিছু বছর পর আর তোমার মনুষ্য জীবনের রাজত্ব থাকবে না। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আমি এই দ্বীপের দৃষ্টান্তের গল্পটি একদিন শুনিয়েছিলাম। কলকাতা বরানগরের জয় মিত্রের কালীবাড়িতে কিছুদিন আমি বসবাস করছিলাম। ওই সময় একদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার কাছে এলেন। তখন সেখানে অনেক ভদ্রলোক বসেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বললেন, "স্বামীজী, আমি আপনার একান্ত দর্শন পেতে চাইছি।" এই কথা শুনে তখন সেখানে যতজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন তারা সবাই আপনা থেকেই উঠে চলে গেলেন।

যতীন্দ্র ঃ স্বামীজী, এখন আমি একান্তভাবে আপনার দর্শন পেয়েছি। আমার মতো মানুষের কর্ত্তব্য কী, তা আপনি বলে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আপনি হলেন রাজা। লাটসাহেবের বাড়ির ছাদে যেমন ঝাণ্ডা ওড়ে, আপনার বাড়ির ছাদেও তেমনি ঝাণ্ডা ওড়ে। সবাই আপনাকে বলে, "মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর"। আমি আপনাকে এই উপদেশ দিচ্ছি – আপনি রাজা হবেন না। "ম্যানেজার হয়ে যান"। রাজা, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন তো?

যতীন্দ্র ঃ স্বামীজী, আপনি এককথায় যা বললেন তা একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ রাজা, আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন তো আপনি কার রাজা। আপনার জন্মের আগে থেকেই এই রাজ-এষ্টেট ছিল। আপনার মৃত্যুর পরেও এই এষ্টেট থাকবে। শুধু দু' দিনের জন্যে আপনি রাজা হয়েছেন। আমি রাজা - এই আভিমান আপনি ছেড়ে দিন। বিচারই সার বস্তু, সর্বদা বিচার করতে থাকুন, তাহলে

এই অভিমান চলে যাবে, আপনিও নির্মল শান্তি পাবেন। একটা প্রচলিত কথা আছে– "বিনা বিচারে কুতো শান্তি, বিনা শান্তি কুতো সুখম্" অর্থাৎ বিনা বিচারে কখনো শান্তি হবে না, আর শান্তি বিনা সুখ হবে না। রাজা, যদি সুখ শান্তি চাও, তাহলে বিচার করতে হবে। তাই আমি বলি, রাজা না হয়ে আপনি ম্যানেজার হয়ে যান। ম্যানেজার যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে জমিদারির দেখাশুনা করে, কিন্তু মনে মনে সে ঠিক জানে এ সম্পত্তি তার নয়, জমিদারের। আপনি তেমনি কাজকর্ম যেমন করছেন করে যান, কিন্তু আসক্তিশূন্য হয়ে সব কাজ করুন। 'আমার আমার' করেই মানুষ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। এই জন্যেই বলছি, আপনি নিজেকে রাজা ভাববেন না, আপনি ম্যানেজার হয়ে যান। তাহলেই আর আপনাকে বন্ধনে জড়িয়ে পড়তে হবে না।

আবার দেখুন, আপনি হয়তো নিজেকে বড়োলোক বলে মনে করেন। কিসের বড়ো লোক আপনি? সাড়ে তিন হাতের চেয়ে তো বড়ো নন। একেবারে দশ-বিশ সেরের ভাত যদি খেতে পারেন, একসঙ্গে দশ-বিশখানা কাপড় যদি পরতে পারেন, দশ-বিশ হাত জমিতে নিজেকে ছড়িয়ে শুতে পারেন, তবে তো বুঝি আপনি বড়লোক। তা যখন সম্ভব নয় তখন আপনি বড়ো লোক হলেন কেমন করে?

আপনার সঙ্গে গরীব মানুষের তফাতটা কোথায়? আপনি যা করেন গরীব মানুষেও তাই করে। গরীব মানুষ শাক আর ছাতু খায়। আপনি না হয় পোলাও কালিয়া খান। কিন্তু উদ্দেশ্য সেই একই, পেট ভরানো। আপনি শাল-দোশালা গায়ে জড়ান, গরীব মানুষ কম্বল গায়ে জড়ায়। আপনার শাল-দোশালা দামের দিক দিয়ে ভারী (অর্থাৎ দামে বেশি)। ওদের কম্বল ওজনে ভারী। কিন্তু দোশালাই বলুন আর কম্বলই বলুন, দুয়ের কাজ একই অর্থাৎ শীত নিবারণ। তবে আপনার দোশালার চেয়ে গরীবের কম্বল বেশি কাজে লাগে, কারণ কম্বল প্রয়োজনে গায়ে চাদর হিসাবে ব্যবহার করা যায় আবার মেঝেতে বিছিয়ে শোয়া যায়। আপনার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা রয়েছে, গরীবদেরও তাই আছে। তাহলে আপনি গরীবদের চেয়ে বেশি কী করলেন?

একই সূর্যদেব আপনাকে আর গরীবদের একই প্রকার আলো দিয়ে থাকেন। একই বায়ু আর জল গরীব আমীরকে সমান তৃপ্তি দেয়। আপনি রাজা হয়ে কোন্ জিনিসটা বেশি করে ভোগ করতে পারেন তা আমাকে বলুন দেখি। আপনি হয়তো বলবেন আমি চার ঘোড়ার গাড়িতে যাতায়াত করি। কিন্তু দেখুন, আপনার কোচম্যান আপনার চেয়ে উঁচু জায়গাতে বসে থাকে। আপনি কিন্তু রয়েছেন ওর হাতের মুঠোর

মধ্যে। ও ইচ্ছে করলেই আপনার গাড়িগুলো আপনাকে খানায় ডোবায় ফেলে দিতে পারে। ওতো আপনার অধীন নয় বরং আপনিই রাজা হয়ে গরীব কোচম্যানের অধীন হয়ে রয়েছেন।

আপনার মোসাহেব যখন আপনার পাশে একই গদিতে বসে থাকে, তখন রাজা বলে আপনি কি গদির আরামটা তার চেয়ে বেশি উপভোগ করেন? তা তো হয় না, গদির আরাম আপনার যেমন, তারও তেমনি। আপনার প্রজারা আপনাকে মহারাজা বলে, কিন্তু যারা আপনাকে চেনে না, তারা তো আপনাকে মহারাজা বলবে না, কোনো রাজসম্মানও দেবে না আপনাকে।

আপনার শরীর আছে, কিন্তু নিজের শরীরের উপরই কি আপনার কোনো অধিকার আছে? সে অধিকার যদি থাকত তাহলে শরীরে জরা আসতে দেন কেন? রোগ হতে দেন কেন?কোন জিনিসটার উপর আপনার অধিকার আছে? আপনি কার মহারাজা? রাজা সাহেব, আপনি একবার ভালো করে বিচার করে দেখুন, তাহলেই সবকিছু বুঝতে পারবেন আর তখনই 'আমি মহারাজা', 'আমার রাজত্ব' এইসব অভিমান দূর হয়ে যাবে।

এইসব কথাবার্তার পর রাজা যতীন্দ্রমোহনকে হঠাৎ আমি প্রশ্নকে করলাম, আচ্ছা রাজাসাহেব, আপনার আয় কত?

যতীন্দ্র ঃ স্বামীজী, "আমার যত্র আয় তত্র ব্যয়"।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না রাজাসাহেব, আপনার ব্যয় অতি অল্প। আমি তো শুনেছি এক পয়সার সাবুদানা আপনার দু' দিনের খাওয়ার পক্ষেও বেশি হয়ে যায়, অথচ দেড় সের চালের ভাত না হলে গরীবদের পেট ভরে না। তা হলে দেখুন, আপনার খরচের চেয়ে গরীবদের খরচ কত বেশি।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যাওয়ার সময় কয়েকটা গিনি রেখে আমাকে প্রণাম করলেন, আমি জেনেশুনে বললাম, "রাজাসাহেব, এ কোন জিনিস, আপনি আমার জন্যে নিয়ে এসেছেন?"

যতীন্দ্র ঃ স্বামীজী, শুধু হাতে দর্শন করতে নেই। তাই প্রণামী হিসেবে খানকয়েক গিনি সঙ্গে করে এনেছি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ রাজাসাহেব, এ গিনি নিয়ে আমি কী করব? যদি খেতে যাই, তাহলে আমার দাঁত ভেঙে যাবে। তবু কোনোরকমে যদি পেটে ঢোকাতে পারি তাহলেও মহা অনর্থ ঘটবে। না রাজা, এ গিনি আপনি নিয়ে যান। পূর্বজন্মে এসব জিনিস আপনি অনেক দান করেছেন, তাই এ জন্মে অনেক ধনদৌলতের মালিক হয়েছেন। তবে অন্নদান আপনি করেননি, তাই আপনার কপালে অন্ন জুটছে না, সাবুদানা খেয়ে আপনাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। আর আপনার চাকরদের দেখুন, তারা রাশি রাশি ভাত খাচ্ছে। এরা আগের জন্মে অনেক অন্নদান করে এসেছে পূর্ব জন্মের কর্ম এ জন্মে প্রারব্ধ হয়ে দেখা দেয়। রাজাসাহেব, এই গিনি আপনি উঠিয়ে নিন, এর বদলে কিছু অন্নদান করুন। কোনো উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখে অন্ন রোপণ করে দিন অর্থাৎ উপযুক্ত স্থানে অন্নদান করুন। পরের জন্মে আপনার জন্যে প্রচুর অন্ন মজুত থাকবে। এতে কোনো সংশয় নেই।

দেখো ভাই চারুবাবু, আপনাকে যে দৃষ্টান্তের কথা বলেছি, ওই বার্তা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে আমি বলেছিলাম। মহারাজা আমার কথা শুনে খুবই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই বছরেই তিনি কাশীধামে এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করে দেন। উত্তম অধিকারীর কাছে একটি কথাই অনেক হয়ে যায়। উত্তম অধিকারী তো ইঙ্গিত মাত্রেই বিষয়বস্তু বুঝে নেয়। 'ম্যানেজার বন যাইয়ে' - এই একটি কথা তাঁর হৃদয়ে একেবারে বসে গিয়েছিল। মহারাজা একেবারে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি বললেন, "স্বামীজী, আপনাকে দয়া করে একবার আমার বাসভবনে পায়ের ধুলো দিতে হবে।" আমি হাসতে লাগলাম। তাঁকে বললাম, "আরে ভাই, তোমার দেহই তো তোমার বাসভবন। সেখানে অন্য কেউ ঢুকবে কেমন করে? আর ইঁট কাঠের তৈরী যে বাড়ির কথা বলছ, সে তোমার বাড়ি হতে যাবে কেন? সে তো ধর্মশালা, কত লোকজন সেখানে বাস করছে।"

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে সেদিন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে সৎসঙ্গ হয়। একদিন গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। দেখো ভাই, তোমার প্রতি উপদেশ হল "ম্যানেজার বন্ যাও"। ঈশ্বরকে মালিক বানাও সুখ-দুঃখ, লাভ ক্ষতি সবই ঈশ্বরের। তুমি কর্মচারী মাত্র, কর্ম করে যাও। এইভাবে যদি তুমি অবস্থান কর তাহলে তুমি যতই কর্ম কর না কেন, তাতে তোমার কোন বন্ধন হবে না, তুমি নির্লিপ্ত থাকবে।

চারু ঃ স্বামীজী, আপনার জ্ঞানগর্ভ মধুর উপদেশ শুনে আমার খুবই আনন্দ হল। আপনার আশ্রম দেখেও আমার খুব আনন্দ লাভ হল। এই আশ্রমে দেব-সেবা, গো-সেবা, বিদ্যাদান, ঔষধিদান, অন্নদান, বস্ত্রদান অর্থাৎ হিন্দুদের যা কিছু শুভ কর্ম আছে, সব কিছু হয়ে থাকে। মহারাজ, আমার চিত্ত আজ খুবই প্রসন্ন হয়েছে।

চারুবাবু একটু সামান্য প্রসাদ খেয়ে জলযোগ করে শ্রীগুরুমহারাজকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে চলে গেলেন।

অষ্টম পর্ব

দেওঘর যুগলমন্দির নির্মাতা শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় ও শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের সৎসঙ্গ

[জ্ঞান মার্গের সাধনায় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান — এই ষট্ সম্পত্তির পরিচয় ঃ জ্ঞানের চারটি সাধন — নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ, শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি ঃ ও মুমুক্ষুত্বানি ঃ গুরু হওয়া সহজ কিন্তু শিষ্য হওয়া বড়োই কঠিন, এ সম্পর্কে শিষ্য পরীক্ষার গল্প ঃ ভোগ বলি, ভোক্তা বলি ঃ ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ করলে তিনিই ভক্তের যোগ ও ক্ষেম বহন করেন, এ প্রসঙ্গে গল্প 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' ঃ সাধুর পক্ষে তীর্থাদি পরিব্রাজন শ্রেয় ঃ সাধু পায়ে হেঁটে পরিব্রাজন করলে তার 'তিতিক্ষা' আপনা থেকেই হয়ে যায়, এ সম্পর্কে শ্রীগুরুমহারাজের নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। গেরুয়া রঙের কাপড় পরলেই সাধু হওয়া যায় না। মনকে রাঙাতে হবে, মনকে জয় করতে হবে, এ প্রসঙ্গে সর্বজিতের গল্প ঃ কাউকে দেখলে অনেক সময় তার প্রতি অকারণে বিরূপভাব বা শত্রুভাব দেখা দেয়। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারবশত এরকম হয়ে থাকে, এ প্রসঙ্গে রাজা ও চন্দন কাঠের গল্প।]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কালিদাস, তুমি তো ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের আশ্রমের জন্য একটা সিঁড়ি তৈরি করে দিতে হবে। সিঁড়িটা সত্যি খুব দরকার।

কালীবাবু ঃ মহরাজ, আপনার আদেশ পেলেই আমি সিঁড়ি তৈরি করে দেব।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই। তুমি রাজি আছো যে, তুমি সিঁড়ি তৈরী করে দেবে।

কালীবাবু ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আমার সাধ্যমতো আপনার সিঁড়ি তৈরী করবার জন্য যথেষ্ঠ পরিশ্রম করবো।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই কালিদাস, অনেক লোক স্বর্গে যেতে চায়। কিন্তু যাবে কী করে, স্বর্গে যাবার তো সিঁড়ি নেই। তুমি তো ইঞ্জিনিয়ারবাবু, তুমি স্বর্গে যাবার একটা সিঁড়ি তৈরী করে দাও।

কালীদাস বাবু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। তিনি স্বামীজী মহারাজের রহস্যপূর্ণ উপদেশমূলক কথাগুলি বুঝতে পেরে অতিশয় বিনীত হয়ে করজোড়ে বললেন।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, স্বর্গে যাবারা সিঁড়ি নির্মাণের জন্য যা যা মালমশলা লাগে, সে সব মশলা তো আপনার কাছেই আছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আমার কাছে আছে, বেশ ভালো। আমি ওইসব মশলা তোমাকে

দিচ্ছি। তুমি ওই মালমশলা নিয়ে একটা স্বর্গে যাবার সিঁড়ি বানিয়ে দাও। স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণের মালমশলার নাম বলে দিচ্ছি। সেগুলি হল ১) শম, ২) দম, ৩) উপরতি, ৪) তিতিক্ষা ৫) শ্রদ্ধা ও ৬) সমাধান। এই ষড় (ছয়টি) সম্পত্তি নিয়ে যাও ভাই কালীদাস। এই ষট্ সম্পত্তি আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এই সম্পত্তি দিয়ে তুমি স্বর্গে যাবার সিঁড়ি বানাও। সিঁড়ি তৈরী হয়ে গেলে তোমারও কল্যাণ হবে। জনসাধারণেরও কল্যাণ হবে।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, এই ষট্ সম্পত্তির সাধনা করে যে সিঁড়ি আমি নির্মাণ করব তাতে আমারই কল্যাণ সম্ভবপর হবে, আমারই স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত হবে, কিন্তু সর্বসাধারণের কী করে কল্যাণ হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি খেলে আমারই পেট ভরবে, এতে জনসাধারণের কী হবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো জনসাধারণের কী করে কল্যাণ হবে আমি তোমাকে বলছি।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। (গীতা ৩/২১ শ্লোক)

অনুবাদ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যা যা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাই অনুসরণ করে, তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলে অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাই অনুসরণ করে।

দেখো বাছা কালিদাস, গীতা শাস্ত্রে ভগবান কি বলেছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে কর্ম করে থাকে, জনসাধারণ বিনা বিচারে ওই কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। কিছু প্রমাণ তারা চায় না। দেখো বাছা, তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান, বহু ব্যক্তির থেকে শ্রেষ্ঠ তুমি। তুমি যদি ষট্ সম্পত্তির সাধন কর, তাহলে তোমাকে দেখে জনসাধারণ সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে। এতে তোমারও কল্যাণ হবে, সেইসঙ্গে জনসাধারণেরও কল্যাণ হবে।

কালিবাবু ঃ মহারাজা, ষট্ সম্পত্তির বিষয় সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছে করছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বেশ বাচ্ছা, আমি তো প্রথমেই স্বীকার করেছি যে, ষট্ সম্পত্তিরূপ মশলা আমি তোমাকে দেব। কিন্তু ওই মশলা নিয়ে তুমি খেটে খুটে সিঁড়ি বানিয়ে দেবে।

প্রথম হল 'শম' শমের কার্য হল অন্তর ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মনের নিগ্রহ। মন নিগ্রহীত হলে বাইরের ইন্দ্রিয় সংযম আপনা থেকে হয়।

দ্বিতীয় 'দম' – দম হল বাইরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সাধন অনুকূল বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় থেকে গুটিয়ে আনা। এক কথায় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে দমন

করাই হল দম।

তৃতীয় উপরতি ঃ উপরতি হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করা অর্থাৎ যে চিন্তা বা মনোবৃত্তি বিশেষের দ্বারা বিষয়চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয় তাকেই উপরতি বলে।

চতুর্থ 'তিতিক্ষা' – সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা বা সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। এক কথায় সহন শক্তির সহায়তায় শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব (যুগল) সমজ্ঞান করাই তিতিক্ষা।

পঞ্চম 'শ্রদ্ধা'– গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।

ষষ্ঠ 'সমাধান'– হল চিত্তের একাগ্রতা, ধ্যেয় বস্তুতে মনবৃত্তি নিলয় অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুতে একদম তদাকার বৃত্তি হয়ে যাওয়া, সমাধিস্থ হয়ে যাওয়া।

দেখো বাছা কালিদাস, উপরি উক্ত যে সব কথা আমি বললাম, এদের বলা হয় ষট্ সম্পত্তি। এটি জ্ঞান সাধনার এক অঙ্গ ভেদ।

জ্ঞানের চার প্রকার সাধন হয়ে থাকে। এই সাধন চতুষ্টয় হল (১) নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক ঃ অর্থাৎ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তা ভিন্ন অন্য সকল কিছুই অনিত্য, এরূপ স্থির করা। (২) ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ ঃ অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার কর্মজন্য সুখ ভোগ কামনারহিত হয়ে করে যেতে হবে, কারণ এ সবই অনিত্য। (৩) শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি ঃ (উপরিলিখিত) (৪) মুমুক্ষুত্ব-অর্থাৎ মুক্ত হওয়ার জন্য তীব্র ব্যাকুল হওয়া।

ভাই কালিদাস, আমি তোমাকে সমস্ত মাল মশলা দিয়ে দিলাম। এইসবের সাধনা করলে স্বর্গ তো তুচ্ছ, তোমার ব্রহ্ম প্রাপ্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হবে, তোমাকে দেখে সাধারণ মানুষও সাধনার ক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে।

কালীদাসবাবু অতিশয় ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি মহারাজের নিকট থেকে ওইরূপ উপদেশ পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং ভক্তি গদগদস্বরে হাত জোড় করে মহারাজকে বলতে লাগলেন।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আপনার উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। আমার এতটা শক্তি সামর্থ নেই যে আমি আপনার উপদেশ পালন করতে পারব। আপনি মহাপুরুষ, আপনার আশীর্বাদে আমার সব কিছু হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনি আমাকে প্রকারন্তরে উপদেশ দিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে আপনি আমার গুরুদেব, আমি আপনার শিষ্য হয়ে গেছি। আমাকে

দীক্ষা দিতে হবে, আমি আর আপনার চরণ ছাড়ব না!

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, তুমি তো আমাকে গুরু বানিয়ে নিয়েছ। গুরু হওয়া সহজ কিন্তু শিষ্য হওয়া বড়োই কঠিন। দেখো শিষ্যের এক দৃষ্টান্তের গল্প মনে পড়েছে, তোমাকে শোনাচ্ছি–

শিষ্য পরীক্ষার গল্প

সংসারে বড়ো পরিশ্রম করতে হয় দেখে এক ব্যক্তি মনে মনে স্থির করল, সে সংসার ত্যাগ করবে এবং কোনো সাধুর শিষ্য হয়ে তাঁর কাছেই থেকে যাবে। তাহলে তাকে আর এত বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। এইসব ভাবনা চিন্তা করে সে এক সাধুর কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ, আমি আপনার শিষ্য হব।' সাধু তাকে পরীক্ষা করবার জন্য নানারকম শক্ত কাজ করতে দিয়ে বললেন, 'যদি তুমি এই কাজগুলি ঠিকমতো করতে পারো তবেই তোমাকে আমি দীক্ষা দিতে পারি। নইলে নয়।' লোকটি ভাবল, এখানে এসেও যদি এত পরিশ্রমই করতে হয়, তাহলে লাভটা হল কী? এর চাইতে আমার সংসারই ভালো ছিল। এই ভেবে সে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আর এক সাধুর কাছে গিয়ে শিষ্য হবার প্রার্থনা জানাল। এই সাধু ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। লোকটির মনের ভাব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হাসতে হাসতে তিনি তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি ঘরে ফিরে যাও, এখনো তুমি শিষ্য হবার উপযুক্ত হওনি।' লোকটি তখন পীড়াপীড়ি করে বলল, 'না মহারাজ, আর আমি সংসারে ফিরে যাব না। সংসার করা, আমার ভালো লাগে না। আমি আপনার আশ্রয়েই থাকতে চাই।' সাধু তখন তাকে নিজের কাছে রাখলেন বটে কিন্তু পরীক্ষা করবার জন্য দিনরাত তাকে এমন খাটাতে লাগলেন যে দুদিনেই সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সাধু তাকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন, কাজেই পালিয়ে সে নিস্তার পাবে সে উপায়ও তার রইল না।

একদিন সাধু তাকে প্রকাণ্ড এক ঘড়া দিয়ে নদী থেকে জল আনতে পাঠালেন। নদীর ঘাটে এসে সে ভাবতে লাগল, জল ভর্তি এতো বড়ো ঘড়াটা আমি তুলব কেমন করে? আমার শক্তিতে তো কুলোবে না। তার চেয়ে বরং এই সুযোগে ঘড়া ফেলে এখান থেকে পালাই। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ঘড়াটা সেখানেই ফেলে রেখে সে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। দু চার পা যেতেই সে শুনতে পেল পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। লোকটি পিছন ফিরে কাউকে দেখতে পেল না। আবার যেই সে চলতে শুরু করেছে অমনি শুনতে পেল আগের মতোই কে যেন

তাকে ডাকছে আর বলছে, 'ওহে মূর্খ, পালাচ্ছ কোথায়? আমার কথাটা একবার শুনে যাও।' বার বার এমনি ডাক শুনে লোকটি ঘড়ার কাছে ফিরে এসে দেখল কেউ কোথাও নেই, শুধু সেই ফাঁকা ঘড়াটার ভিতর থেকেই জলদগম্ভীর স্বর যেন বেরিয়ে আসছে। সেই স্বর তাকে বলছে, 'বোকার মতো পালাচ্ছ কেন? পালাবেই যদি, তবে কেন সাধুর কাছে এসেছিলে?'

ঘড়া কথা বলছে দেখে লোকটি তো অবাক। সে ঘড়াকে বলল, 'হ্যাঁ, আমি শিষ্য হব বলে সাধুর কাছে এসেছিলাম।' ঘড়ার ভিতর থেকে তখন উত্তর এল, 'শিষ্য হওয়া অত সহজ নয়, শিষ্য হতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। শিষ্য উপাধি যে সহজে মিলে যাবে তা মনে কোরো না। এই আমাকেই দেখো না। আজ আমি ঘড়া উপাধি লাভ করেছি, কিন্তু তার জন্য আমাকে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে শোনো তাহলে বুঝবে কত পরীক্ষা দিয়ে তবে শিষ্য উপাধি অর্জন করতে হয়। এই বলে ঘড়া তার নিজের কাহিনী বলতে শুরু করল।'

ঘড়া বলল, 'গোড়ায় ছিলাম আমি শুধু মাটি। আমার প্রথম পরীক্ষা হল, গুরু আমাকে কোদাল দিয়ে কেটে ঝুড়িতে করে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষা, ঝুড়ি থেকে আছাড় দিয়ে গুরু আমাকে ফেললেন মাটিতে। তৃতীয় পরীক্ষা, গুরু আমাকে জলে ভিজিয়ে রাখলেন, আমার মধ্যে কাঁকর পাথর আর যত কিছু দোষ ছিল, সব তিনি আলাদা করে দূরে ফেলে দিলেন। তারপর আমাকে ফেলে রাখলেন প্রখর রোদের মধ্যে। রোদে পুড়ে পুড়ে আমার সব রস যখন শুকিয়ে গেল তখন আবার জল ঢেলে পা দিয়ে আমাকে ময়দার মতো চটকাতে লাগলেন। চতুর্থ পরীক্ষা এবার আমাকে তাল পাকিয়ে তিনি তুলে দিলেন কুমোরের চাকে। সেখানে আমি বনবন করে ঘুরতে লাগলাম আর তখন গুরু আমাকে নিজের হাতে ঘড়ার আকারে গড়ে তুললেন। কিন্তু আবার আমাকে রোদে ফেলে রাখা হল। তাতে আমার শরীর একটু শক্ত হল বটে, কিন্তু তাতেও পরীক্ষা শেষ হল না। পঞ্চম পরীক্ষা – এবার আমাকে আগুনের মধ্যে ফেলে পুড়িয়ে একেবারে লাল করে ফেলা হল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। আগুন থেকে নামাবার পর যখন আমি একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেলাম, তখন গুরু আমাকে ঠুকেঠুকে দেখতে লাগলেন আমার কোথাও কাঁচা রয়ে গেল কিনা। যখন তিনি দেখলেন কোথাও আর কাঁচা নেই, তখন তিনি আমাকে ঘড়া উপাধি দিলেন। এখন বুঝে দেখো, কতরকম পরীক্ষা দিয়ে তবে আমাকে ঘড়া উপাধি অর্জন করতে হয়েছে এবং তার ফলে আর আমি কত সুন্দর সুন্দর জিনিস

ধারণ করবার যোগ্য হয়ে উঠেছি। সুশীতল জল, অমৃতময় দুধ, তেল, ঘি প্রভৃতি যা কিছু উপাদেয় তরল পদার্থ সব আমি আজ ধারণ করতে সক্ষম। আর তুমি মূর্খ, তুমি কিনা বিনা পরীক্ষায় শিষ্য উপাধি লাভ করতে চাও। তা কি কখনো হতে পারে? এখনই তুমি গুরুগৃহে ফিরে যাও। গুরুর তাড়না সহ্য করে, সব রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিষ্য উপাধি অর্জন করোগে।'

ঘড়াকে উপলক্ষ্য করে সিদ্ধপুরুষ গুরুদেবই তাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করেছিলেন।

'দেখো ভাই কালিদাস, তুমিও শিষ্য হতে চাইছ। তার জন্য পরীক্ষা দিতে হবে, তুমি যেন পালিয়ে যেও না। তুমি এখন ব্যবহারিক জগতে ইঞ্জিনিয়ার উপাধি লাভ করেছ। বিচার করে দেখো, এই উপাধি লাভ করার জন্য তোমাকে কত পরীক্ষা দিতে হয়েছে, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরমার্থিক জগতে উপাধি লাভ করার জন্যও পরীক্ষা দিতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। বিনা প্রচেষ্টায় 'শিষ্য' উপাধি লাভ হয়ে যাবে, তা হবে না।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কালিদাসবাবু ইঞ্জিনিয়ার মশাই পরবর্তী সময়ে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর অনুমতিক্রমে পাথুরিয়া ঘাটার জমিদার অক্ষয় কুমার ঘোষের পত্নী শ্রীমতী চারুশীলা দেবীর 'শ্রীশ্রীযুগল মন্দির' নির্মাণ করে দিয়ে আর কারুর না হোক শ্রীমতী চারু মাতার স্বর্গের সিঁড়ি করে দিয়েছেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এই কালিদাসবাবুর সহায়তায় তিনি শ্রীশ্রীযুগল মন্দির নির্মাণ করিয়ে একদিকে শ্রীশ্রীগুরুমূর্তি স্থাপন ও আর একদিকে শ্রীশ্রীগোপালমূর্তি স্থাপন করে অমর কীর্তি রেখে গেছেন। এই কর্মের ফলে তিনি অক্ষয় স্বর্গলাভ করবেন তাতে আর সন্দেহ করবার কিছু নেই।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ অতঃপর নিজ হাতে রাজভোগ রসগোল্লা আনিয়ে কালিদাসবাবুকে খেতে দিলেন, প্রসাদ পেয়ে কালিদাসবাবু আনন্দ চিত্তে গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, এই রসগোল্লা মিষ্টান্ন এখানে কীভাবে পাওয়া গেল। এ মিষ্টান্ন তো কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাছা, তোমার কথা শুনে আমার বহুদিন আগেকার এক ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদিন চন্দ্রমাধব ঘোষ তপোবনে আমার কাছে এল। আমি কিছু ভালো ভালো ফল বাবুর খাবার জন্য দিলাম। চন্দ্রমাধব বাবু প্রশ্ন করলেন,

মহারাজ এই জঙ্গলের মধ্যে এরকম ভালো ভালো ফল কোথা থেকে পাওয়া গেল? আমি উত্তর দিলাম, যা যা ফল আপনি খেলেন, আপনিই এইসব ফলের প্রকৃত ভোক্তা, আপনার পেটে এইসব ফল যাবেই, এইজন্য আপনার এখানে আসার আগেই এইসব ফল এখানে মজুত রাখা হয়েছে।

দেখো বাবু, এইজন্য বলা হয় 'ভোগ বলি, ভোক্তা বলি।' যে বস্তু ভোগ প্রধান হয়ে থাকে তা ভোক্তাকে টেনে নেয় আর যে বস্তু ভোক্তা প্রধান হয়ে থাকে তা ভোগকে টেনে নেয়। দেখো বাবু, কোথায় কাবুল দেশ আর কোথায় তপোবন। কাবুলে মেওয়া ফল পাকলে সেই ফল কত হাত ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছয়। আপনিও এখানে এসে পৌঁছে গেছেন। যে লোক এই ফল দিয়ে গেছে তার তো একান্ত ইচ্ছা যে গুরুমহারাজ এই ফল খাবেন, কিন্তু আমি এই ফলের প্রকৃত ভোক্তা নই। এইজন্য আমার পেটে ওই ফল না গিয়ে আপনার পেটে গেছে। এক্ষেত্রে যা হল, তা ভোক্তাপ্রধান। যা ভোগ প্রধান হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভোক্তাকে ভোগস্থানে যেতে হয়।

এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, 'আমি তীর্থযাত্রা করব, এরূপ মনস্থ করেছি। আমার মনোস্কামনা পূর্ণ হবে কি হবে না আপনি বলুন।' আমি হাসতে হাসতে তাকে বললাম, 'বাচ্ছা, তোমার অন্নোদক অর্থাৎ তীর্থের অন্নজল যখন তোমার ভোগের ইচ্ছে হয়েছে, তখন তো ওই অন্নজলভোক্তাকে আপনা থেকেই টেনে নেবে।' এক্ষেত্রে যা হল তা ভোগ প্রধান। যেখানে ভোগই প্রধান হয়ে থাকে, সেখানে ভোক্তাকেই যেতে হয়।

মানুষের কথা তো হল, পশুদের ক্ষেত্রেও এই ভোগ আর ভোক্তা সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়। কোন এক ব্যক্তি খাওয়াদাওয়া করল, কিন্তু হজম করতে পারল না, বমি হয়ে গেল। একটা কুকুর এসে ওই বমি খেয়ে নিল। এখানে কুকুরটাই প্রকৃত ভোক্তা। তুমি ভোজনের জন্য থালা নিয়ে বসেছ, তোমার পাচক বামুন যত্নপূর্বক রান্না করে থালাতে সব কিছু দিল, তারপর তুমি খেতে শুরু করলে। মুখে গ্রাস তোলবার সময় একটি অন্নদানা তোমার মুখ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। একটা পিঁপড়ে ওই অন্নদানা তুলে নিয়ে চলে গেল। ওই একদানা অন্ন পিঁপড়ের ভাগ্যে ছিল। তোমার মুখ থেকে ওই একদানা অন্ন পড়ে গেল। তা পিঁপড়ে খেয়ে নিল। এখানে পিঁপড়েই প্রকৃত ভোক্তা, তোমাকে চেষ্টা করে রান্না করাতে হয়েছে, কিন্তু পিঁপড়ের ভোগ এমনিতেই হয়ে গেল। চন্দ্রমাধববাবু, আপনি এই ফলের ভোক্তা, এইজন্য এই ফল কাবুল দেশ

থেকে কত হাত ঘুরে ঘুরে আজ আপনার পেটে চলে গেল।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, যার যা ভোগ আছে, তা আপনা থেকেই মিলে যাবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, আপনা থেকেই মিলে যাবে।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, তাহলে আমরা কেন এত চেষ্টা করছি, চেষ্টা করার তো দরকার নেই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ চেষ্টার জন্য কিছু করবার দরকার নেই ঠিকই, কিন্তু আমরা চেষ্টা না করে চুপচাপ থাকতেও পারব না।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, তাহলে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়াই তো ভালো।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবে যে শরীর তুমি ধারণ করেছ এর ফলাফল তো আগেই হয়ে আছে, এখন যার যা ভোগ, যে যার ভোক্তা সব কিছুই আপনা থেকেই হয়ে যাবে। কিন্তু এই জন্মে যে শুভাশুভ কর্ম করবে, ওই কর্মের ফলাফল থেকে তোমার আসছে জন্মের ভোগ ভোক্তা স্থির হবে।

সেইজন্য ভালো ভালো কাজ করতে হবে। তাহলে পরের জন্মে ভালোই ফল মিলবে। যদি কোন সাধক ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ করতে পারে তার চেষ্টার মতো আর কিছু থাকে না। কিন্তু ওই ভাব বড়ো উচ্চ কোটির সাধকের হয়ে থাকে। এই ভাবের এক দৃষ্টান্তের গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি, তাহলে এই ভাব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে, বড়ো বড়ো কঠিন কথা দৃষ্টান্তমূলক গল্পের মাধ্যমে সহজবোধ্য হয়ে যায়।

যোগক্ষেমম্ বহাম্যহম্

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি বাস করেন। ব্রাহ্মণ অতি নিষ্ঠাবান, ঈশ্বরপরায়ণ। গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চনা নিয়ে তাঁর দিন কাটে। ব্রাহ্মণ বড়ো গরীব। দু-চারটি সন্তানও রয়েছে তাঁর। ভিক্ষে করে সামান্য যা জোটে তাতে সকলের পেট ভরে না। এই নিয়ে দিন রাত তাঁকে ব্রাহ্মণীর কাছে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তবু সংসারের এই অভাব অনটন ব্রাহ্মণকে একটুও বিচলিত করতে পারে না। গৃহিনীর ভর্ৎসনা শুনে তিনি শুধু হাসেন আর বলেন, "আমার ঠাকুর ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন। যোগ অর্থাৎ যা জোটেনি তা তিনি জোটাবেন আর ক্ষেম হল, যা জুটেছে তা তিনি রক্ষা করবেন।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনে ব্রাহ্মণী খুব রেগে গেলেন। ঘরে সামান্য যে চালটুকু ছিল তাই দিয়ে ভাত রেঁধে তিনি ছেলেমেয়েদের সমস্ত খাইয়ে দিলেন। এদিকে ঠাকুরের

পূজা শেষ করে ব্রাহ্মণ দেখলেন, ভোগের অন্ন তখনও দেওয়া হয়নি। তিনি ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁগো, ঠাকুরের ভোগের অন্ন আজ দিলে না কেন?" ব্রাহ্মণী তখন রেগে ব্যাঙ্গ করে বলে উঠলেন, "ভোগ চাইতে তোমার লজ্জা করল না? তোমার ঠাকুর 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। তোমার ঠাকুর তোমার জন্য অনেক কিছু বহন করে আনবেন তখন আমি রান্না করে দেব।"

ব্রাহ্মণ হাসতে লাগলেন, তাঁর মনে কোনো বিকার নেই। তিনি বললেন, "দেখো ব্রাহ্মণী, ঠাকুর যে বলেছেন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' সে কথা ভুলেও অবিশ্বাস কোরো না। দেখো, সামনের ওই তেঁতুল গাছের কেমন সুন্দর কচি কচি পাতা ঠাকুর ওখানে সাজিয়ে রেখেছেন। ওই তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে তাতে একটু নুন ছিটিয়ে দাও, তাই ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে আমরা প্রসাদ পাব।" স্বামীর কথায় ব্রাহ্মণী তেঁতুল পাতার ভোগ প্রস্তুত করলেন, ব্রাহ্মণও পরম আনন্দে সেই ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করে নিজেরা প্রসাদ পেলেন।

এইভাবে তিন-চারদিন শুধু তেঁতুল পাতা খেয়েই ব্রাহ্মণ পরিবারের সময় কাটল। বাড়ির কারুর কপালে ভাত জুটল না। সদানন্দ ব্রাহ্মণের সেদিকে খেয়াল নেই। তিনি তেঁতুল গাছটির দিকে তাকান আর খুশিতে বলতে থাকেন, "আহা, আমার ঠাকুরের কী দয়া, কেমন টাটকা কচি পাতা আমাদের জন্যে নিজে বহন করে এনেছেন।" একথা শুনে ব্রাহ্মণীর আর ধৈর্য্য রইল না। "এখনই তুমি ভিক্ষা করতে বেরিয়ে যাও, ভিক্ষার অন্ন আমি রান্না করব। বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের ক্ষুধার্ত মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুমি এমন নিষ্ঠুর পিতা।তোমার দুঃখ হচ্ছে না।" এই সব কথা বলে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের হাতে ভিক্ষের ঝুলিটা ধরিয়ে দিয়ে তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিলেন।

ব্রাহ্মণ পথ দিয়ে চলেছেন। বেলা দ্বিপ্রহর। তৃষ্ণায় ব্রাহ্মণের গলা শুকিয়ে গেল। তাঁর খুব পিপাসা পেল। তিনি এক নদীর ধারে এলেন। অঞ্জলি ভরে নদীর জল পান করে তাঁর প্রাণ ঠাণ্ডা হল। তিনি সেখানে এক গাছের ছায়ায় বসে ভগবানের অসীম দয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন,"ঠাকুর, সত্যিই তুমি যোগক্ষেম বহন করো। আমাকে পিপাসায় কাতর দেখে তুমিই তো এই নদীর সুশীতল জল আমার কাছে বহন করে এনেছ।" ঠাকুরের এই করুণার কথা ভাবতে ভাবতে এই নির্জন নদীর তীরে ব্রাহ্মণ ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন, জগৎ সংসার সব কোথায় মিলিয়ে গেল। ঘরের কথা, অনাহারে ক্লিষ্ট স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কথা, এমনকি নিজের

দেহজ্ঞান পর্যন্ত ব্রাহ্মণের রইল না।

পরম ভক্তের এই ভাব দেখে ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না। প্রকাণ্ড এক মোট মাথায় করে তিনি ব্রাহ্মণের বাড়ির আঙিনায় এসে 'মা, মা' বলে ডাকতে লাগলেন। সেই ডাক শুনে ব্রাহ্মণী বাইরে এসে দেখেন একটি ছোট ছেলে মস্ত এক বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মণী তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি বাছা?" ছেলেটি বলল, "আমি মুটে, আমার নাম কৃষ্ণকান্ত। ব্রাহ্মণ এই মোট আপনার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছেন। তিনি একটু পরে আসবেন। আপনি জিনিসগুলো নামিয়ে দেখে নিন সব ঠিক আছে কিনা।"

ব্রাহ্মণী মোট খুলে জিনিসপত্র দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেল। খাওয়া-পরার জন্যে যা কিছু দরকার সব কিছুই রয়েছে। তাঁর সন্দেহ হল, ছেলেটিকে তিনি বললেন, "বাছা, তুমি ভুল করে জিনিসগুলি এখানে এনেছ। আমার স্বামী ভিক্ষে করতে গিয়েছেন। ভিক্ষেতে কি এত জিনিস মেলে? তুমি ছেলেমানুষ, নিশ্চয় ভুল করে অন্যের জিনিস এখানে নিয়ে এসেছ। এগুলি তুমি উঠিয়ে নিয়ে যাও।"

ব্রহ্মণীর কথা শুনে ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল, "মা, আমি ছেলেমানুষ হতে পারি, তবে ভুল আমি কোনোদিন করিনা। মোট বহন করাই তো আমার কাজ, আমার ভুল হবে কেমন করে? আমার উপর যে যা ভার দেয় আমি মাথায় করে সেই ভার বহন করি। পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁর সব ভার যে আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন, তাই তো তাঁর বোঝা আমি বহন করে এনেছি। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, তাড়াতাড়ি রান্না চাড়িয়ে দিন। ব্রাহ্মণ এই এলেন বলে।" এই বলে চোখের পলকে ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণী তখন মনের আনন্দে নানারকম রান্না করে স্বামীর জন্যে বসে রইলেন। কখন ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরবেন, কখন ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তারা সকলে মিলে প্রসাদ পাবেন, এই চিন্তা করতে করতে সারাটা দিন কেটে গেল। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণের দেখা নেই। এদিকে সেই নদীর ধারে গাছের তলায় ব্রাহ্মণের যখন ধ্যান ভাঙল তখন বেলা পড়ে গেছে। সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই দেখে তিনি দ্রুত পায়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। পথে আসতে আসতে তাঁর চিন্তা হল– ব্রাহ্মণী নিশ্চয় তাঁকে খুব গালাগালি করবে। ভগবানকে স্মরণ করে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি দেখলেন ব্রাহ্মণী হাসি মুখে তাঁকে বলছেন, "হ্যাঁগো, আজ তোমার ফিরতে এত দেরি হল কেন? মুটের সঙ্গে যে সব জিনিস পাঠিয়েছ সব আমি তুলে যত্ন করে

রেখেছি আর ঠাকুরের ভোগের জন্যে কত কী যে রান্না করেছি তা কি আর বলব। তুমি আর দেরি কোরো না। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দাও। ছেলেপুলেরা খিদেয় ছটফট করছে।"

ব্রাহ্মণীর আশ্চর্য সব কথা শুনে তাঁর বাক্য স্ফুরণ হল না। গৃহিনী যেমন আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠেছেন তাতে তাঁর কথায় অবিশ্বাসও করা চলে না। প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার পর তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন, "এ কী অদ্ভুত কথা বলছ ব্রাহ্মণী, আমি তো তোমার কাছে কোন মুটের হাত দিয়ে জিনিসপত্তর পাঠাইনি। কে দিয়ে গেল এসব জিনিসপত্র? কেমন দেখতে সে?" ব্রাহ্মণী বললেন, "আহা, কী তার রূপ। ছেলেটির উজ্জ্বল শ্যামলকান্তি, আয়ত লোচন, বিশাল বক্ষস্থল, মুখে মৃদু মধুর হাসি, কিন্তু ছেলেটি বড়ো চঞ্চল ও অস্থির। জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে আমাকে রান্না চড়াতে বলে চোখের নিমেষে কোথায় যে মিলিয়ে গেল আর তাকে দেখতে পেলাম না।"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনে ব্রাহ্মণ বললেন, "তুমি ভাগ্যবতী, তুমি ধন্য। মুটের বেশে ঠাকুর আজ নিজে এসে তোমাকে দর্শন দিয়ে গেলেন, আর আমার খুব দুর্ভাগ্য, আজ পর্যন্ত আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম না।" 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' হে আমার ঠাকুর এই বলতে বলতে অতি আনন্দে ব্রাহ্মণ মুর্চ্ছিত হয়ে গেলেন।

দেখো ভাই কালীবাবু, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্পে ব্রাহ্মণের মতো যদি ঈশ্বরকে সর্বস্ব সমর্পণ করে দিতে পারো তাহলে তো আপনা থেকেই সমস্ত চেষ্টার নিরসন হবে, নচেৎ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে ফাঁকির মতলব হয়ে যাবে।

এই সব উপদেশগুলি যখন শ্রীশ্রীমহারাজ বলছিলেন সেই সময় ওই স্থানে একটি অল্প বয়স্ক সাধু এসে মহারাজকে প্রণাম করে উপবেশন করলেন। মহারাজ সেই সাধুটিকে নানাবিধ প্রশ্ন করে তার পিতা মাতা আছে কিনা, জন্মস্থান কোথায়, গুরুস্থান কোথায়, কি উপাধি লাভ করেছেন (অর্থাৎ গিরি, পুরি, ভারতী ইত্যাদি) তীর্থ আদি পর্যটন করেছেন কিনা – জানতে লাগলেন। ওই সাধু তীর্থ আদি পর্যটন করেন নাই শুনে শ্রীশ্রীমহারাজ একটি দোঁহা আবৃত্তি করলেন।

দোঁহা–

"পানিতো বহতা ভালা, বাঁধা গাঁধিলা হোই।
সাধুতো রমতা ভালা, দাগ না লাগে কোই।।"

অর্থঃ যে জল স্রোতে বয়ে যায়, সেই জলে দুর্গন্ধ হয় না, বদ্ধ জলে দুর্গন্ধ হয়।

সাধুর পক্ষে তীর্থাদি ভ্রমণ করা ভালো, এক জায়গায় থাকলে মায়া অর্থাৎ মোহ এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দেখো ভাই সাধু হয়েছ, ভ্রমণ করছ না, এটা ভালো কথা নয়। তুমি বলতে পারো, আপনি তো একস্থানে বসে আছেন। না না ভাই, আমি এক স্থানে থাকতাম না। আমি পায়ে হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করেছি। এখন বৃদ্ধ অবস্থা এসে গেছে, বৃদ্ধাবস্থা এসে গেলে সাধুর পক্ষে কোন স্থানে বসবাস করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথম প্রথম আমার এমন নিয়ম ছিল, এক স্থানে তিন রাত্রির বেশি বাস করব না। এখন বৃদ্ধাবস্থা এসে গেছে। এখন আমাকে কেউ কোথাও যেতে বললে, আমি তাকে বলে থাকি, "শিবলিঙ্গং ন চালয়েৎ"। বৃদ্ধাবস্থা এসে গেলে শিবলিঙ্গের মতো এক স্থানে বসে যাওয়াই ঠিক।

সাধুজী ঃ স্বামীজী, আমি বহু দূর থেকে আপনার নাম শুনে আপনার কাছে আসছি। শুনলাম, আপনি সাধুলোককে পাথেয় খরচা দিয়ে থাকেন, আপনি একজন দাতা। আমার খরচ করবার মতো টাকাকড়ি নেই, তাই আপনাকে আমায় কিছু টাকাকড়ি দিতে হবে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না ভাই, আমি দাতা একথা তোমাকে কে বলেছে, দাতা হলেন পরম দয়াল পরমাত্মাদেব।

দোঁহা–

"দেনেওয়ালা আউর হ্যায় দেতা হ্যায় দিন রহিন।
দাতা মুকো কহতে হেঁ, তাসে নিচু রাখে নয়েন।"

অর্থ ঃ যিনি দেবার তিনি আমাদের রাতদিন দিতেছেন, কিন্তু লোকে না বুঝে মানুষকে দাতা বলে, তাই আমি লজ্জায় মাটির দিকে চোখ নিচু করে চেয়ে থাকি, দাতা আমি নই, দাতা আর একজন আছেন।

আমাকে দাতা বোলো না, পরমাত্মাদেবের মতো দাতা কেউ হতে পারে না। পরমাত্মাদেবের কৃপায় তোমার যা কিছু প্রয়োজন এখানে পেয়ে যাবে। মানুষ দাতা, একথা ভেবো না। সাধুর পক্ষে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করাই উচিত। এখন তো রেল হয়ে গেছে। বুড়ি মায়ীলোকও তীর্থ ভ্রমণ করতে পারছে। তুমি রেলের ভাড়া চাইছ, কিন্তু রেলে ভ্রমণ করলে সাধুর সাধুবৃত্তি স্ফুরিত হবে না।

কালিবাবু ঃ রেলে ভ্রমণ করলে সাধুর সাধুবৃত্তি তৈরী হবে না। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আরে বাছা, সাধুর ভ্রমণে তিতিক্ষা হয়ে যায়। তিতিক্ষা ষট্ সম্পত্তির

এক সাধন, সাধুর পায়ে হাঁটা। ভ্রমণ থেকে আপনা থেকেই তিতিক্ষা হয়ে যায়। পায়ে হেঁটে গেলে বহুদূর যাওয়া যায় না। প্রতি গ্রামে বিশ্রামের জন্যে দাঁড়াতে হবে, প্রতি গ্রামে ভিক্ষে করতে হবে, কেউ ভিক্ষে দেবে, কেউ ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দেবে। সাধু ওই ভর্ৎসনা সহ্য করে নেয়। সাধুর মান অপমান বোধ থাকবে না। কখনো রোদে পুড়তে হয়, কখনো বৃষ্টিতে ভিজতে হয়, কখনো খাবার মেলে, কখনো খাবার মেলে না। এতে সাধুর সহ্য শক্তি আপনা থেকেই লাভ হয়ে যায়।

আমার ভ্রমণের অবস্থায় একদিন আমার এমন ক্রোধ চড়ে গিয়েছিল কিন্তু ওই ক্রোধ আমি সহ্য করে নিয়ে ছিলাম। "বৈশ্যের কথা"– যৌবন অবস্থায় আমি যখন ভ্রমণ করছিলাম, তখন একসময় আমি হৃষিকেশে পৌঁছলাম। রামঘাটে স্নান করলাম, ঘাটের উপর এক বৈশ্যের দোকান ছিল। ওই দোকানদারের কাছে গিয়ে "হর নর্মদে, হর নর্মদে" বলে দাঁড়ালাম। আমাদের ভিক্ষার রীতি ছিল কারুর কাছ থেকে চাইতে হবে না, 'হর নর্মদে' বলে দাঁড়াতে হয়, এবার যার যেমন ইচ্ছে সে তেমনি ভিক্ষে দিয়ে থাকে। আমার প্রয়োজন মতো জিনিস পেলে তা আমি গ্রহণ করি। বৈশ্য ভিতর থেকে বাইরে এসে কিছু দিল না। কিছু দিল না বললে মিথ্যা কথা বলা হয়ে যাবে। বৈশ্য আমাকে প্রচুর গালাগালি দিল। দু-তিন দিন ভাত খাইনি, খুব খিদে পেয়েছে। এই অবস্থায় বৈশ্যের গালাগালি খুব কড়া অনুভব হল, কিন্তু বিচার করে সেই সব গালিগালাজ সহ্য করে নিলাম। যে জিনিসের আমার প্রয়োজন নেই সেই জিনিস আমি নেব না। তাই ওই বৈশ্যের গালাগালি আমি নিলাম না।

শীতকালের রাত, খুব ঠাণ্ডা অনুভব হতে লাগল। এখন কী করা যাবে। বৈশ্যের দোকানের সামনে রাস্তার ধারে আসন পেতে বসে পড়লাম, কিন্তু ঠাণ্ডার জন্যে হৃদকম্প হতে লাগল। বসে থাকতে পারলাম না। কী করা যাবে? অগত্যা কাছাকাছি যে খড়, কাঠি কুটো পড়েছিল সেগুলি একত্র করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। এবার কিছুটা গরম অনুভব করলাম। বৈশ্য তার দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে নিদ্রা যাচ্ছিল। আমি যে আগুন জ্বেলেছি তা সে টের পেয়ে গেল।

বৈশ্য দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এমন অশ্রাব্য বাক্যে গালাগালি দিতে লাগল যে আমাকে কানে আঙ্গুল দিতে হল। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি, কেন সে এত গালিগালাজ করছে। পরে বুঝলাম, বৈশ্যের খড়ের দোকান। আমি যে আগুন জ্বেলেছি, তাতে তার দোকান পুড়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এইজন্য বৈশ্য আগুন দেখেই আমাকে গালাগাল দিচ্ছে। আমি চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছি, কিছু বলছি না।

কিন্তু ওই বৈশ্য একটি ডান্ডা নিয়ে এসে আমার সামনে খুব তর্জন গর্জন করতে লাগল আমাকে মারবে বলে। সে সময় আমার মনে খুব ক্রোধ হল, ভাবলাম, বৈশ্য যদি আমাকে এক ডান্ডা মারে আমি তাহলে তাকে দশ ডান্ডা মেরে ছাড়ব।

ওই সময় ঝট্ করে আমার বোধ হল – আরে, এ কী তুমি করছ ক্রোধকে বশীভূত কর, তুমি তো একজন সাধু। ক্রোধ করা একজন সাধুর পক্ষে উচিত নয়। এটা বুঝতে পারায় সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার আসন তুলে নিয়ে ওই স্থান ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলাম। কিছুদুর হাঁটার পর রাতের অবসানের পর প্রভাত হল। দু'তিন দিন আমার আহার হয়নি। ভুখা অবস্থায় আর হাঁটতে পারছি না।

এমন সময় এক বৈষ্ণব সাধু এইস্থানে উপস্থিত হলেন। তিনি ভালবেসে যত্ন করে কাছেই তাঁর আশ্রমে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, মহারাজ, এখানে আপনি ক'দিন বিশ্রাম করুন। আমি খাবার প্রস্তুত করে দিচ্ছি। খেয়েদেয়ে আরাম করুন। তখন আমি তাকে বললাম, আমাদের নিয়ম হল তিনরাত্রির বেশি কোথাও থাকা যাবে না, কারুর তৈরি রান্না খাওয়া চলবে না। তখন বৈষ্ণব সাধু বললেন, মহারাজ কারুর তৈরি খাবার আপনি খাবেন না, কিন্তু দুধ খাবেন তো? তাই হল। আমি স্নান সেরে পূজাপাঠ করে নিলাম। বৈষ্ণব সাধু গাভী দোহন করে আমাকে দুধ খেতে দিলেন। ওই দুধ আমি খেয়ে নিলাম।

দুপুর হয়ে গেছে। খুব চড়া রোদ। রোদ একটু কমলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। পূর্বোক্ত সেই দোকানদার বৈশ্য আমার সামনে এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, ব্রহ্মচারীজী আমাকে ক্ষমা করুন, আপনাকে আমি খুব খারাপ কথা বলেছি। আপনার কোপে আমার সর্বনাশ হয় গেছে।

আমার শিশুপুত্র মায়ের পাশে নিদ্রিত ছিল সকালে এই শিশুকে মৃত অবস্থায় দেখা গেল। আপনি কৃপা করুন। আপনাকে আমার দোকানে একবার যেতে হবে। সেখানে আমি চাল, ডাল, আটা, চিনি, ঘি ইত্যাদি দেব। আপনাকে রান্না করে ভোজন করতে হবে। আপনাকে আমি ছাড়ব না। আপনার কোপে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আরো হবে। আপনি একবার আমার দোকানে চলুন।

আমি চোখ বুজে পরমাত্মাদেবকে স্মরণ করতে লাগলাম। বললাম, হে পরমাত্মাদেব! তোমার এ কী বিচিত্রতা, যে বৈশ্য আমাকে মারবার জন্য ডান্ডা উঠিয়ে ছিল, সেই বৈশ্য আপনার কাছে মার খেয়ে আমার পা আঁকড়ে পড়ে আছে! আমি ওর অন্যায় ব্যবহার সহ্য করে নিলাম, কিন্তু তুমি সহ্য করলে না। পুত্র শোকরূপ চড়

তুমি বৈশ্যকে মেরে দিলে। তখন আমি বৈশ্যকে আমার পা থেকে তুলে নিয়ে বললাম, আমার আর ক্রোধ নেই। তুমি সুস্থ হয়ে যাও – পরমাত্মাদেবের কাছে এটাই প্রার্থনা করি। আমি তো একবার তোমার ওখান থেকে ঘুরে এসেছি। আর ওখানে যাব না।

বৈশ্য আমার কথা মানল না। কাঁদতে লাগল, বলল – ব্রহ্মচারীজী, আপনি আমার ওখানে যাবেন না বলছেন। তাহলে আপনি এখানে থাকুন। আমি আমার দোকান থেকে রান্নার জিনিসপত্রের ব্যাগগুলি নিয়ে আসছি। আপনাকে এখানেই রান্না করে, ভোজন করতে হবে। কী করি, আমি বৈশ্যের কথায় স্বীকৃতি জানালাম। তাই হল, বৈশ্যের আনা জিনিসপত্তর দিয়ে রান্না করলাম। আমি ভোজন করলাম, বৈষ্ণব সাধু ভোজন করলেন আর ভোজন করল বৈশ্য। একদিন এখানে থেকে পরদিন রওনা হলাম।

দেখো ভাই কালীবাবু, এইভাবে সাধু যখন পরিব্রাজন করে তখন তো আপনা থেকেই তার তিতিক্ষা হয়ে য়ায়। এখন তো সাধুলোক পায়ে হেঁটে কেউ বিশেষ যায় না। রেলে ভ্রমণ করলে এরকম তিতিক্ষা হয় না। গেরুয়া রঙের কাপড় পরলেই সাধু হওয়া যায় না, মনকে রাঙাতে হবে। মনকে জয় করতে হবে। অর্থাৎ সাধুভাবাপন্ন হয়ে গেলে তবেই প্রকৃত সাধু হবে। দেখো ভাই, এই মনোজয়ের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ গল্প শোনাচ্ছি। এই গল্প থেকে অন্তর্নিহিত ভাব সহজে বোধগম্য হবে।

সর্বজিতের গল্প

এক ব্যক্তি খুব বলশালী ছিল। ভালো যোদ্ধাও ছিল। তার বীরত্ব দেখে সব লোক তাকে সর্বজিত বলে ডাকতো। কিন্তু তার মা তাকে সর্বজিত বলে ডাকতো না। একদিন সে মাকে বলল, হে মাতা, তুমি কেন আমাকে সর্বজিত বলে ডাকো না, তাই আমার খুব দুঃখ হয়। মা বলল, বাছা, তুমি দুঃখ কোরো না। তুমি কি প্রকৃত পক্ষে সব কিছু জয় করতে পেরেছ? যে ব্যক্তি নিজের মনকে জয় করতে পারে ওই ব্যক্তির প্রকৃত নাম সর্বজিত হয়ে থাকে।

একদিন সর্বজিত শিকার করতে গেল। একটা প্রকাণ্ড বাঘ সে শিকার করে নিয়ে এলো। বহু লোক তা দেখবার জন্য ভীড় করে দাঁড়াল। সেখানে এক মহাপুরুষ এসে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখল। এই সময় উপস্থিত সকলে মহাপুরুষকে বলল, মহারাজ, এই শিকারীর নাম সর্বজিত। দেখুন, সে কত বড়ো বাঘ শিকার করে এসেছে। শুনে মহাপুরুষ হাসলেন, তারপর বললেন – এ তো কিছু নয়, আমি তো দেখছি – এক

শিয়ালকে মেরে নিয়ে এসেছে। যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধরূপী বাঘকে বধ করতে পারে তাকেই আমি সর্বজয়ী যোদ্ধা বলে বাহাদুরি দিতে পারি। জঙ্গলের বাঘ মারতে পারা কিছু বাহাদুরি নয়, নিজের অন্তরস্থিত জঙ্গলের বাঘকে মারতে পারলে তবেই তো বাহাদুরি। জঙ্গলের বাঘকে তো অনেক মানুষই মারতে পার, কিন্তু অন্তরস্থিত জঙ্গলের বাঘকে অনেক লোকই মারতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের মনকে জয় করে সেই ব্যক্তিই হল প্রকৃত বীর, প্রকৃত যোদ্ধা, তারই প্রকৃত নাম সর্বজিত হয়ে থাকে।

সাধুজী ঃ স্বামীজী মহারাজ, আপনার মধুর উপদেশ শুনে খুব আনন্দ লাভ করলাম, এখন আমি চলি। আমার যা পাবার, তা পেয়ে গেলেই হল।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তোমার কতটা প্রয়োজন তা তো জানি না। আমাকে বললে আমি দিয়ে দেব। দেখো এক দোঁহা আছে, আমি তোমাকে তা শুনিয়ে দিচ্ছি।

দোঁহা –

'মাঙ্গন গয়ে সো মর গয়ে, মরে সো মাঙ্গন যায়।
উসকো পহলে সো মরে, সো হোতে না কর যায়।
সবসে তৃণ কা তুচ্ছ হ্যায়, উসসে মাঙ্গনা তুচ্ছ।
উসসে বহনর তুচ্ছ হ্যায়, যো মাঙ্গনেসে নেহী দেয় কুচ্ছ।'

দোঁহার অর্থ ঃ ভিক্ষা করা মৃত্যুতুল্য, মৃতবৎ ব্যক্তিই ভিক্ষা করে। ভিক্ষুকের পূর্বে সে মরে, যে ব্যক্তি দিবার সামর্থ থাকতে বলে আমি দিতে পারব না। ঘাস সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ, কিন্তু ঘাস অপেক্ষা ভিক্ষুক তুচ্ছ হয়, তা হতেও আরও তুচ্ছ হয় যে ব্যক্তি সাধ্য থাকতেও বলে আমার দিবার সামর্থ নেই। উক্ত ব্যক্তি হতে তুচ্ছ আর কিছুই নেই বুঝতে হবে।

দেখো বাচ্ছা, যে ভিক্ষা চায় তাকে মৃত্যুতুল্য বলা হয়। আর আগেই সে মারা যায়, যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কিছু দেয় না। আমার কাছে তুমি কিছু জিনিস চেয়েছ, তোমার যা কিছু প্রয়োজন নিয়ে নাও ভাই।

কৌপিন, বহির্বাস, গামছা, ঘটি, ট্রেনের খরচের টাকা ইত্যাদি সাধুজীর যা কিছু প্রয়োজন ছিল, সব কিছু দ্রব্য গুরুমহারাজ তাকে দিলেন। সাধুজী আনন্দচিত্তে গুরুমহারাজকে প্রণাম করে চলে গেলেন।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, আমার মনে এক প্রশ্ন জেগেছে, আপনাকে বলব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ বাচ্ছা, অবশ্যই বলবে, বললে উত্তর মিলে যাবে।

কালীবাবু ঃ মহারাজ, এই সাধুজীকে দেখে আমার চিত্তে খুব বিরক্তি ভাব আসে।

তাঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই। অপরিচিত এই সাধুর উপর বিরক্ত হওয়ার তো কিছু কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কেন এই সাধুজীকে দেখে আমার চিত্ত এমনই বিরূপ হয়ে গেছে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো বাচ্ছা, এক জন্মের তো কথা নয়। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার এসে দাঁড়ায়। কোন জন্মে এই ব্যক্তির সঙ্গে তোমার শত্রুভাব ছিল। এই জন্মে তাকে দেখা মাত্র তোমার চিত্ত বিরূপ হয়ে গেল। এ সম্পর্কে এক গল্প তোমাকে শোনাচ্ছি। তাতে ভাব তাড়াতাড়ি সহজবোধ্য হবে।

রাজা ও চন্দন কাঠের গল্প

এক রাজা আছেন, বহু সমৃদ্ধশালী রাজা। বহু পাত্র, মিত্র, অমাত্য, মন্ত্রী নিয়ে রাজা রাজসভায় বসে আলোচনা করছেন। এক বৈশ্য প্রতিদিন রাজসভার মধ্যে এসে বসে। সভা ভঙ্গ হলে সে চলে যায়।

নিত্য রাজসভার যাতায়াত করার দরুণ পাত্র মিত্র মন্ত্রী সবাই-এর সঙ্গে বৈশ্যের বন্ধুভাব এসে গেল। কিন্তু রাজা তার উপর বন্ধুভাব আনতে পারল না। উপরন্তু রাজা তার উপর খুব বিরক্ত হয়ে গেল। কিন্তু রাজা তাকে মুখে কিছু বলল না, চুপচাপ রয়ে গেল। একদিন এমন হল, যেইমাত্র বৈশ্য সভায় প্রবেশ করল অমনি রাজা উঠে চলে গেল, ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না।

রাজার ভাব দেখে অন্য একদিন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাজা, আপনি বৈশ্যের উপর এত বিরক্ত হন কেন। রাজা বললেন, হে মন্ত্রী, আমি জানি না কেন বৈশ্যকে দেখলেই আমার ক্রোধ হয়। এর কারণ তোমাকে বলতে হবে। মন্ত্রী বলল, হুজুর, সাতদিন আমাকে সময় দিন, এর কারণ অনুসন্ধান করে আপনাকে বলে দেব।

তাই হল, রাজা কারণ অনুসন্ধানের জন্য সাত দিন সময় দিলেন। রাজমন্ত্রীর বুদ্ধি ছিল খুব সূক্ষ্ম। সে প্রতিদিন বৈশ্যের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগল। মন্ত্রী দেখল যে, শহরের যত চন্দন কাঠ সব বৈশ্য কিনে রাখছে। কারুর কাছে এক টুকরো চন্দন কাঠও সে রাখছে না, সব চন্দন কাঠ সে একচেটিয়া করে নিজের কাছে রাখছে। মন্ত্রী এর কারণ অনুসন্ধান করতে লাগল। বহু অনুসন্ধানের পর কারণ জানা গেল। বৈশ্যের এটাই উদ্দেশ্য যে আমি সব চন্দন কাঠ একচেটিয়া করে নিজের কাছে রেখে দেব। রাজার যখন মৃত্যু হবে, তখন রাজার মৃতদেহ সৎকারের জন্য চন্দনকাঠ কিনতে আসবে, কিন্তু কারুর কাছে চন্দন কাঠ পাওয়া যাবে না। আমার কাছে পাওয়া যাবে, আমি তখন চতুর্গুণ মূল্যে সেই চন্দন কাঠ ছাড়ব। রাজার জন্য চন্দন কাঠ কিনতে

হবে, রাজা মারা গেলে চন্দন কাঠ বিক্রি করে আমি প্রচুর টাকা লাভ করব। রাজা মারা গেলে আমি বহু টাকার মালিক হয়ে যাব। এই ভাব বা উদ্দেশ্য নিয়ে বৈশ্য রাজসভায় যাতায়াত করে থাকে। এই মনোভাবের জন্যই বৈশ্যের উপর রাজার চিত্ত একদম বিরূপ হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে রাজার বন্ধুভাব আসছে না।

এই বার্তা যখন মন্ত্রী বুঝে গেল তখন সে রাজাকে বলল, "হে রাজন, শহরে মহামারী হবে এক জ্যোতিষ বলেছে। এর প্রতিকার করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি ঘরে চন্দন কাঠ পোড়াতে হবে, ওরই সুগন্ধে মহামারী নিবৃত্ত হয়ে যাবে, আর মহামারী হবে না।" রাজা হুকুম দিলেন, "শহরের প্রতি ঘরে ঘরে চন্দন কাঠ পোড়াতে হবে।" রাজ-আজ্ঞা কেউ অমান্য করতে পারল না। ধনী দরিদ্র শহরের সবাই চন্দন কাঠ কিনতে লাগল। বৈশ্যের কাছে যত চন্দন কাঠ ছিল তা সব চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল। বৈশ্য খুব খুশি হল। তার মনে এই ভাবের উদয় হল যে রাজার দীর্ঘ জীবন হলে ভালো হয়। তার আদেশেই তো আমার চন্দন কাঠ খুব চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল। এই রাজা মারা গেলে অন্য একজন রাজা হবে, সেই রাজা এরকম হুকুম দেবে না, তাহলে আমার চন্দন কাঠ বিক্রি হবে না। হে ভগবান, আমার রাজার দীর্ঘজীবন দান করুন।

বৈশ্যের মনোভাব যখন এরকম হল, রাজার মনও পরিবর্তন হয়ে গেল, তার আর বৈশ্যের উপর ক্রোধ রইল না। মন্ত্রী রাজাকে বলল, "হে রাজন, এখন বৈশ্যকে দেখে আপনার ক্রোধ হচ্ছে কী?" উত্তরে রাজা বলল, "না না মন্ত্রী, বৈশ্যকে দেখে আমার আর ক্রোধ হচ্ছে না, বল মন্ত্রী এর কারণ কী?" মন্ত্রী তখন সব ব্যাপারটা খুলে বলল। এর পর থেকে রাজা আর বৈশ্যের বন্ধুভাব হয়ে গেল, শত্রুভাব চলে গেল।

দেখো বাছা কালিদাস, কোন জন্মে তোমার সাথে এই সাধুজীর কিছু শত্রুভাব ছিল। সেইজন্যে তাকে দেখে তোমার মন বিরূপ হয়ে গেছে। আমাদের ভিতর জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার রয়ে গেছে, এক জন্মের তো নয়।

নবম পর্ব

রায়বাহাদুর প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও
শ্রীশ্রীগুরুদেবের সৎসঙ্গ
১৩৪৩ সাল, আষাঢ় মাস ঃ সময় - সকাল

[পরের উপকারের জন্যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে ঃ ধার্মিক ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্মও সেরকম ধার্মিককে রক্ষা করে ঃ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, তাহলে জগৎ কি একেবারে মিথ্যা? ঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ঃ ভক্তির পথ সুগম ঃ জগতে এত দুঃখ-কষ্ট, তবে ভগবানকে মঙ্গলময় বলব কেন? ঃ ভক্ত তার তন্ মন্ ধন্ দিয়ে ভগবানের পুজো ও সেবা করে ঃ মনকে ঈশ্বরমুখী করার উপায় ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের শরীরে জরা আসে, জরার প্রতিরোধের কোনো ওষুধ নেই ঃ এই জগৎ প্রপঞ্চ হল মায়ার খেলা, এই মায়ার হাত থেকে মুক্ত হতে গেলে ঈশ্বরের শরণাগত হতে হবে, এ সম্পর্কে শরণাগত সাধকের গল্প ঃ সাধন পথে এগোতে গেলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে, এ সম্পর্কে রাজার ছেলের গালে চড় মারার গল্প ঃ সগুণ ঈশ্বর ও নির্গুণ ঈশ্বর, নির্গুণ ঈশ্বরের ধ্যান করা কঠিন ঃ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়েই আছেন, কিন্তু সংসাররূপী প্রাচীর থাকার দরুন তাঁকে দেখা যায় না, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করতে পারলে তবেই হৃদয়কমলে তাঁর দর্শন মিলবে ঃ ভগবান অন্তরযামী, সকলের অন্তরের সংবাদ তিনি রাখেন, তিনি হলেন কর্মফলদাতা।]

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভাই প্রাণগোপাল, দেবকার্যে দধিচি মুনি অস্থি দান করেছিলেন। তাঁর অস্থি দিয়ে বজ্র নির্মাণ হল। দধিচি মুনি অস্থি দানও করলেন, ফের জীবিত রইলেন। আমার মনে হল — এ রকম কী হতে পারে?

প্রাণ গোপাল ঃ না, মহারাজ, তা কেমন করে হবে, বেঁচেও থাকব আবার অস্থি দানও করব তা তো সম্ভবপর হয় না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কোন এক ব্যক্তি আমাকে বলল, হে গুরু মহারাজ, আমি আপনার চরণ কমলে আমার সর্বস্ব অর্পণ করে দিলাম। একথা শুনে হেসে তাকে বললাম, তাহলে তো তুমি কাঙ্গাল হয়ে যাবে। ওই ব্যক্তি যদি বলে, আমি সর্বস্ব দানও করব, ফের কাঙ্গালও হব না — এ কখনও হতে পারে?

দধিচি মুনি দেবকার্যে অস্থি দান করেছিলেন। দেখো, পরোপকারার্থে প্রাণ-দান কীরূপ মহান এক দৃষ্টান্ত। পরের উপকারের জন্যে আমার প্রাণ যায় —সেও ভালো। যে ব্যক্তি ধার্মিক হবে, সে ব্যক্তি তো ধর্মের জন্যে প্রাণকে ত্যাগ করে দেয়। তবু

ধর্মকে ছেড়ে দেয় না, মন্ত্রের সাধন করব, শরীর পাত করব। শরীর ছেড়ে চলে যায় সেও ভালো কিন্তু আমার মন্ত্রের সাধন হওয়া চাই। এইভাব যখন সাধকের যখন পাকা হয়ে যায়, তখন সব ঠিক থাকে। সাত্ত্বিকী সাধকের সদা সর্বদাই মনে দৃঢ়তা থাকে যে, মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন। এরকম মনোবৃত্তি যখন হয়ে যাবে তখন আর চিত্তক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আসবে না। পরের উপকার করার জন্যে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। পরের উপকারও করব আর নিজেরও স্বার্থ ছাড়ব না — তা হতে পারে না।

দধিচি মুনির উপাখ্যান স্মরণ করে পরের উপকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। ধর্মের জন্যে সর্বস্ব দান করে দিয়ে পরে যদি তাই নিয়ে মনে দুঃখ জাগে যে আমি একেবারে নিঃস্ব বা কাঙ্গাল হয়ে গেলাম তাহলে সে দান তামসিক দান হয়ে যাবে। তাই আগে ভালো করে ভেবে চিন্তে তারপর দান করা উচিত। দান করার পর অনুশোচনা করা ঠিক নয়।

"ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" — ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে, সহস্র বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে ধর্মকে রক্ষা করে। ধর্মও ধার্মিককে সেই রকম রক্ষা করে থাকে। ধার্মিক ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে —এতে কোনো সংশয় নেই। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের গতি অতি সূক্ষ্ম। দশজন মানুষকে রক্ষা করার জন্যে যদি একজন মানুষকে বধ করতে হয়, তবে ঐ একজনকে বধ করাই পুণ্য কাজ। কী প্রাণগোপাল, আমার এই কথার উপর যদি তোমার কোনো মন্তব্য বা বক্তব্য থাকে তাহলে বলো।

প্রাণ গোপাল ঃ হ্যাঁ মহারাজ, আপনি যা বললেন তা ধ্রুব সত্য। যেমন আমরা একটি টাকা রক্ষা করবার জন্য একটি সিকি নষ্ট করে থাকি, সেইরকম একটি মানুষকে বধ করে যদি দশজনের প্রাণ রক্ষা হয় তা অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, এইজন্যে আমিও বোলে থাকি ধর্মাধর্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম। দশজন মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য যদি একজন মানুষের প্রাণ-নাশ করার দরকার হয়, তবে তা করাই কর্তব্য। এতে কোনো পাপ হবে না।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা — এই যে বেদান্তের বাক্যটি রয়েছে তাহলে কি আমরা এই ফলে ফুলে সুসজ্জিত চন্দ্র সূর্যে আলোকিত জগৎকে মিথ্যা বলে বুঝব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না, জগৎ একদম অস্তিত্ব, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র বা সোনার পাথরবাটির মতো অলীক বা মিথ্যা বা অস্তিত্ব বিহীন নয়। এর কিছু সত্যতা আছে। যেমন ধরো একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেখানে তার পাশেই তুমি যদি হাজার পাওয়ারের একটি বিজলী বাতি জ্বালিয়ে দাও, তাহলে ঐ সময়ে সেই প্রদীপের রোশনাই যেমন মিথ্যা হয়ে যায়, তেমনি অমিত প্রভাবশালী ব্রহ্মের অনুভব যখন মানুষের হয়, তখন সেই 'জ্যোতিষাম্ অপি জ্যোতিঃ' অর্থাৎ জ্যোতিরও জ্যোতি যিনি তাঁর পাশে এই জগৎ সংসার, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা সব হীনপ্রভ, ক্ষীণ হয়ে পড়ে থাকে। তবে একদম মিথ্যা তারা নয়। জগৎকে মিথ্যা বললে ঈশ্বরও মিথ্যা হয়ে যাবেন, কারণ তাঁকে বলা হয় সর্বব্যাপী বিভু। ঈশ্বর যদি জগৎকে ছেড়ে থাকেন, তাহলে তো তাঁর সর্বব্যাপিত্বই ব্যাহত হবে, মিথ্যা হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে ঈশ্বরের সত্তা নিয়েই এই জগৎ সংসার ভাসমান।

আমি ওই সময় প্রশ্ন করলাম, মহারাজ ব্রহ্মজ্ঞানের সৎসঙ্গ চলছে, আমরা অজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় কিছুই বুঝি না, আমাদের বুদ্ধিতে আসে, এরূপ উপদেশ কিছু বলুন, আপনার শ্রীমুখ থেকে অমৃত বর্ষণ হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দেব। তার আগে আমার প্রাণগোপালের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাক্। দেখো ভাই প্রাণগোপাল, জগৎকে মিথ্যা বললে, ঈশ্বরও মিথ্যা হয়ে যাবে। যেমন সমুদ্র আর তার তরঙ্গ অভেদ, তরঙ্গ ক্ষণবিধ্বংসী, এই উঠছে, এই ডুবছে, ক্ষণে ক্ষণে বদল হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যা বলা চলে না। সত্যস্বরূপ সমুদ্রেই সেই তরঙ্গের স্থিতি, এইজন্য তুমি একদম মিথ্যা বলতে পারো না। তাই সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষণ বিধ্বংসী তরঙ্গও যেমন সত্য, তেমনি ব্রহ্মসত্তার উপর অবস্থিত এ জগৎ সংসারও তেমনিই সত্য। সমুদ্র আর তার তরঙ্গ অভেদ, কিন্তু সমুদ্রেরই তরঙ্গ সবাই বলে, তরঙ্গের সমুদ্র কেউ বলে না কখনো। ব্রহ্ম তাই সমুদ্রের মতো, আর এই জগৎ-সংসার হল সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের তরঙ্গ মাত্র। সমুদ্র আর তার তরঙ্গ — এই দৃষ্টান্ত থেকে ব্রহ্ম ও জগৎ সংসারের স্বরূপ ও তার ভাবটি বুঝে নাও।

বেশ বাছা সরলা, এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। ভক্তির পথ বড়ো সুগম। জ্ঞানের পথ দুর্গম হয়ে থাকে। জ্ঞান পথ, ভক্তি পথ, কর্ম পথ — এই তিন পথ ছাড়া চতুর্থ পথ আর নেই, পরমেশ্বরকে লাভ করতে হলে এই তিন রাস্তা আছে। যে রাস্তা

তোমার সুগম মনে হবে, ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও। তাহলেই তুমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবে।

জ্ঞান রয়েছে এক ধারে, কর্ম রয়েছে আর একধারে আর মাঝখানে রয়েছে ভক্তি। এর তাৎপর্য হল — জ্ঞানীকেও ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়, কর্মীকেও ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। কর্মী সারাদিন ধরে কর্ম করল, কিন্তু সে সব কাজে যদি ভগবৎ বুদ্ধি না থাকে, ভগবানেরই কাজ করছি এই ভাব না থাকে তাহলে তার সমস্ত কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়। হে ঈশ্বর, হে ভগবান, আমি যা কিছু করছি সব তোমারই কাজ, আমার কাজে তুমি প্রসন্ন হও — এই ভাব নিয়ে কর্মীকে কর্ম করতে হবে। জ্ঞানীকেও তেমনি ভক্তি ভাব নিয়ে থাকতে হয়। হে ভগবান, আমি জানি তুমি আর আমি অভিন্ন, কিন্তু কীভাবে অভিন্ন? তুমি হলে সমুদ্র আর আমি হলাম নুনের পুতুল। নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের সঙ্গে অভেদ হয়ে যায়, আমিও তেমনি তোমার মধ্যে মিশে তোমার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছি। তুমি ছাড়া আমার আর আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই, যেন লবনের পুতুল সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে গেল।

এইভাবে জ্ঞানী যদি বিচার করতে পারে, তবেই তার জ্ঞানী হওয়া সার্থক, নইলে ভক্তিহীন জ্ঞানে সাধক নীরস হয়ে যায়, তার মধ্যে নাস্তিকতার ভাব এসে যায়। আমিই যখন ব্রহ্ম, আমিই যখন ঈশ্বর তখন কার জন্যে আমি সাধনা করব, এরকম ভাব ভালো নয়। জীব আর ব্রহ্ম অভেদ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু কীভাবে অভেদ? হে ঈশ্বর তুমি অগ্নি, আমি তোমারই স্ফুলিঙ্গ। হে ঈশ্বর, তুমি সমুদ্র, আমি তার তরঙ্গ — এই ভাবই সঠিক ভাব। আমিই সমুদ্র, আমিই তরঙ্গ এই ভাব ভালো নয়। এই জন্যেই বলা হয়েছে, জ্ঞানীকেও যেমন ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়, কর্মীকেও তেমনি ভক্তির আশ্রয় নিতে হয়। ভক্তি ছাড়া সমস্ত সাধনা বৃথা, সব শুকিয়ে যায়। ভক্তি হল রসরূপিণী, ভক্তির আশ্রয় নিলে তবেই সাধনা সরস সুগম হয়ে যায়।

বাছা সরলা, ভক্তির পথ খুবই মিষ্টি। ওই পথ ধরে এগোলে তোমার সাধন সুগম হয়ে যাবে। (১) জ্ঞানপথ বিষ্ণুর আরাধনা (২) কর্মপথ যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা (৩) ভক্তিপথ ভগবানের আরাধনা। এই ত্রিবিধ পথ সাধকের জন্যে রয়েছে, তবে সবচেয়ে মিষ্টি—ভক্ত ভগবান। হে ভগবান, আমার কেউ নেই, তুমি আমার আমি তোমার। যে সাধক ভগবানের হয়ে যেতে পারে, তার সমস্ত ভার ভগবান নিজেই বহন করে থাকেন। ভগবান মঙ্গলময়। তোমার দুঃখ হোক, তাপ হোক, শোক হোক

— কোন কিছুতেই তুমি নিরাশ হবে না। ভগবান আমার অমঙ্গল করেছে — এরকম ভুল বুঝবে না। ওই দুঃখ থেকেই মঙ্গল বের হয়ে আসবে। অর্থাৎ দুঃখের মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। আমার মন্ত্রশিষ্য উকিল নগেন্দ্রনাথের একমাত্র ছেলে উপার্জন করে, সেই উপার্জনে সে বৃদ্ধ পিতা-মাতা আর স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে প্রতিপালন করে। হঠাৎ সেই ছেলে মারা গেল। নগেন তখন আমার কাছে এসে বলল, হে গুরু মহারাজ, আমার একমাত্র পুত্র যামিনীরঞ্জন, একমাত্র অর্থ উপার্জনকারী, হঠাৎ সে মারা গেল। আমরা সবাই অসহায় হয়ে পড়লাম। এই অবস্থায় কী করে ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলব? এতে মঙ্গল কোথায়?

আমি বললাম,. দেখো নগেন, তুমি যা বলছ তা ঠিক, কিন্তু তবু এরই মধ্যে থেকে মঙ্গল খুঁজে বের করতে হয়। তার জন্যে চাই বিচার। ভেবে দেখো, ওই ছেলে যদি পক্ষাঘাৎ হয়ে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়ে থাকত, তাহলে তোমাদের কী রকম দুর্দশা হোতো? তার রোজগার বন্ধ হয়ে যেত। রোগ যন্ত্রণা যদি তার অসহ্য হয়ে উঠত, তাহলে তার চিকিৎসার খরচ কোথা থেকে যোগাড় করতে? খরচ যদি বা কোনোরকমে যোগাড় হল, তার অসহ্য রোগযন্ত্রণা দূর করতে কেমন করে? ছেলের দুঃখ কষ্ট দেখে তোমাদের দুঃখের আর অন্ত থাকত না। তাই মেনে নিতে হয় মঙ্গলময় ভগবান মৃত্যুরূপে এসে সমস্ত রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে ছেলেকে তাঁর কোলে তুলে নিয়েছেন। এতে ছেলেটির যেমন শান্তি হয়েছে, তোমাদেরও তেমনি শান্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে। দেখো ঈশ্বর মঙ্গলময়, দেহে যখন জরা আসে, ব্যাধি আসে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তখন তাকে নিজের কোলে তুলে নেন। তাহলে কেন তুমি ঈশ্বরকে মঙ্গলময় বলবে না?

ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তা তুমি বিচার করে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। দুঃখের মধ্যে যে মঙ্গল নিহিত আছে তা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে। যখন সাধকের চিত্তক্ষেত্র ঈশ্বর ভাবে ভাবিত হয়ে থাকবে তখন রোগ শোক দুঃখ তাপ সমস্ত মঙ্গলময়, আমার মঙ্গলের জন্যে তিনি দিয়েছেন, এই বোধ হবে। দেখো, রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ সাধককে ঈশ্বর অভিমুখী করে দেয়। যদি দুঃখ না হয়, তাহলে ঈশ্বরকে কেউ স্মরণ করে না। বাহ্য বা পার্থিব সুখে একেবারে নিমগ্ন হয়ে যায়। সেইজন্যে ঈশ্বর আমাদের দুঃখ দেন। দুঃখ পেলে বাহ্য বিষয়ে ধাবিত মনোবৃত্তি অন্তরমুখী হয়ে যাবে। এই ভাব মনে নিয়ে আসতে হবে।

আমি ঃ গুরুদেব, রাণী চারুমাতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান করলেন, তাঁর প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হল, কিন্তু আমি তো আপনার ভিখারী কন্যা, আমি কি দিয়ে ভগবানের পুজো করব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না, তুমি নিজেকে ভিখারী মনে কোরো না। তুমি ধর্মের রাণী হয়ে যাও। ভগবানতো ভক্তের কাছে ভক্তি ছাড়া কিছু চান না। প্রেম ভক্তি ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু তাঁর প্রিয় জিনিস নেই। তাই প্রকৃত ভক্ত দেয় তার প্রিয় বস্তু। মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হল — তন্ মন্ ধন্। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু যে তন্ মন্ ধন্, তা দিয়ে ভক্ত ভগবানকে পুজো করে, তাঁর সেবা করে। যে ভক্ত যে পরিমাণে তন্ মন্ ধন্ ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দিতে পারে, সেই পরিমাণ ভগবানের বিভূতি স্বরূপ আনন্দ সন্তোষ সেই ভক্তের লাভ হয়ে থাকে। ভগবৎ চরণে যে ভক্ত যে পরিমাণ আত্মনিবেদন করে দিতে পারে, ভগবানও সেই পরিমাণ ভক্তের কাছে বিক্রিত হয়ে থাকেন।

বাছা সরলা, তুমি কোন কিছুতেই কমতি নও। তোমার ধন নেই, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। তুমি তোমার তন্ মন্ ভগবানকে সমর্পণ করে দাও, তুমি ধর্মের রাণী হয়ে যাও। দেখো বাছা, ধন্ তো এখানকার ধন এখানেই পড়ে থাকবে। কিন্তু জীবন-মরণের সাথী ধর্মধনকে তুমি আহরণ করে যাও। এটাই আমার তোমার জন্যে উপদেশ।

আমি ঃ মহারাজ, আমি অতি ক্ষুদ্র, আমার দেওয়া তন্ মন্ কি ঈশ্বর গ্রহণ করবেন? ভগবান তো ত্রৈলক্যের রাজা, আর আমি তো ক্ষুদ্র বালুকণা।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা, ভগবান অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। বিনা হেতু সেই ভগবান জীবকে কৃপা করে থাকেন। তাঁকে যে নৈবেদ্য তুমি ভক্তি পূর্বক অর্পণ করবে, ভগবান তা-ই গ্রহণ করবেন। তাঁর কাছে ছোটো বড়ো কিছু বিচার নেই। দেখো তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলে মনে দুঃখ করবে না। তুমি অন্তর্বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব, কিন্তু ভগবান অনন্ত। তুমি তাঁর স্পর্শ পেলেই তোমার ক্ষুদ্রত্ব জীবত্ব দূরীভূত হয়ে তুমিও অনন্ত হয়ে যাবে। তাই ভগবানের স্পর্শ পাওয়া চাই।

কী রায় বাহাদুর, আমার এই উপদেশের উপর তোমার কী কোন মন্তব্য আছে?

প্রাণ গোপাল ঃ মহারাজ, আপনার মহান উপদেশের উপর মন্তব্য প্রকাশ করবার আর কিছুই নেই। আপনি শুধু উপদেশ দেন তা নয়। আপনার উপদেশ শ্রবণকালীন

যেন বিষয়গুলি মনে অঙ্কিত হয়ে যায়। আপনি অনন্ত ভগবান এবং অন্তর্বিশিষ্ট ভক্তকে নিয়ে যে উপদেশ দিলেন তা শুনে যেন ভগবানের অনন্ত রূপ মাধুরী চোখের সামনে ভেসে উঠল। উপদেশগুলি এতই হৃদয়গ্রাহী, যেন বায়োস্কোপের ছবির ন্যায় পর পর চোখের সামনে অঙ্কিত হয়ে যায়। মহারাজ, আপনার উপদেশগুলি শুধু কান স্পর্শ করে না, উপদেশগুলি প্রাণ স্পর্শ করে। শুনতে শুনতে যেন ভাষাগুলি সজীব হয়ে ওঠে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই স্তম্ভিত চিত্তে শ্রবণ করে থাকে, তাই এর উপর মন্তব্য করার কিছু নেই। আপনার উপদেশ শাস্ত্র সম্মত, অতি সরল গল্পের দৃষ্টান্তযুক্ত। তাই বিদ্বান, মূর্খ—কারুর বোঝবার অসুবিধা নেই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, তোমরা তো গৃহস্থ ব্যক্তি। তোমাদের তো বহু কর্তব্য সাধন করতে হয়। তবে যা কিছু কর্ম করনা কেন ইষ্টদেবকে স্মরণ করে তা সম্পাদন করবে। ইষ্টদেবের উপর নিজের মনের লক্ষ্য স্থির করে যত কর্তব্য-কর্ম তা করে যাও। সমুদয় কর্ম তোমার ঈশ্বরের চরণ কমলের উপর আরোপিত হয়ে যাবে। মনকে কীভাবে রাখতে হবে? যেমন কম্পাসের কাঁটা সর্বদা উত্তরদিকে থাকে সেইভাবে মনকেও সর্বদা ঈশ্বরমুখী রাখতে হবে। কম্পাসের কাঁটা কখনো পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয় না। কম্পাসের কাঁটার মতো তুমিও ঈশ্বরের দিকে তোমার মনের গতিকে রেখে দাও, সংসারের দিকে যেন না যায়।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, আপনার শ্রীদেহ এখন অসুস্থ, আপনি এখন বেশিক্ষণ কথা বললে আপনার ক্লান্তি আসে, অতএব আমাদের অনুরোধ আপনি আর বেশি কথা বলবেন না। আর একটি আমাদের অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করতে হবে, বিলাসী টাউনে এক ধনী ব্যক্তির অসুখের জন্যে কলকাতা থেকে বিখ্যাত ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার এসেছেন। আশ্রমের মোটর পাঠিয়ে তাঁকে একবার এখানে আনিয়ে আপনার শ্রীদেহ দেখাতে চাই, আপনি আপত্তি করবেন না। জানি আপনার যোগের শরীর তবু আমাদের তৃপ্তির জন্যে ডাক্তার সরকারকে দিয়ে আপনার শ্রীদেহটি পরীক্ষা করাতে চাই। আপনি আপত্তি করবেন না। হয়তো ডাক্তারের চিকিৎসা কিছু উপকার করতে পারবে না, তবুও আমাদের মনের তৃপ্তির জন্য এটা স্বীকার করুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই, এখন তো আমার শরীরে জরা এসে গেছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই এই জরা এসেছে, এর জন্যে কোনো ওষুধ নেই। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি কত অবতার এসেছেন। এইসব মহাত্মা ব্যক্তি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করেন নি, তাঁরাও

সব ইহলোক ত্যাগ করেছেন। দেখো ভাই, আমার চলে যাবার সময় এসে গেছে, জরার জন্যে কোনো ওষুধ নেই, তোমরা কেন ঘাবড়ে যাচ্ছো? দেখো, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। আমার সমসাময়িক ব্যক্তি কেউ জীবিত নেই। আমার সমসাময়িক ব্যক্তি ভোলানন্দ চলে গেছেন, শিবানন্দ চলে গেছেন, আমি কি চিরদিন বেঁচে থাকবো?

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, সবই আমি জানি, তবু আমরা আপনার অবুঝ পুত্র। আমাদের মনের তৃপ্তির জন্যে আপনাকে ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নেব। আপনি অস্বীকার করবেন না।

(আশ্রমের মোটর গিয়ে পরদিন স্যার নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসল। ডাঃ নীলরতন সরকার কখনও জুতো খুলে রোগী দেখেন নি। নিজ হাতে পায়ের জুতো খুলে হাত ধুয়ে গুরুমহারাজের চিকিৎসার্থে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে উপবেশন করলেন।)

ডাক্তারবাবুকে দেখে গুরুমহারাজ বালকের ন্যায় সরলভাবে উচ্চ হাস্য করে বলে উঠলেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ডাক্তারবাবু, আপনি ভবরোগ নিবারণের কিছু ওষুধপথ্য জানলে আমাকে দিন। সংসারে সারা জীবন ধরে মানুষ ভবরোগে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে ওই রোগের নিবারণ হবে।

ডাক্তারবাবু বিদ্বান ব্যক্তি, যদিও তিনি ইতিপূর্বে সাধুসঙ্গ করেন নি, তথাপি তিনি অতি বিনয়পূর্বক হেসে বললেন —

নীলরতন ঃ স্বামীজী, আমার কাছে শরীরের ব্যাধির ওষুধ আছে, ভব ব্যাধির ওষুধ আপনাদের ন্যায় সাধু ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যায়। আপনি অনুমতি করুন, আপনার শরীর পরীক্ষা করে দেখি, আমরা শরীরের ওষুধ দিতে পারি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ দেখো ভাই ডাক্তারবাবু, শরীরের ওষুধও তুমি দিতে পারবে না। আমার শরীরে জরা এসে গেছে, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই শরীরে জরা এসেছে। এই জরার জন্যে কী তুমি ওষুধ দেবে যাতে জরা রোধ হয়ে যাবে? তাতো হবে না, তাহলে কীসের জন্যে ওষুধ খাব?

নীলরতন ঃ না স্বামীজী, আমার কাছে জরা আক্রমণ করতে পারবে না, এমন কোনো ওষুধ নেই।

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, আমাদের বাংলা একটা গীতের লাইন মনে পড়ল — 'যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ, না হয় বারণ।'

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ব্যাস, তাহলে তো মিটেই গেল। তাহলে কীসের জন্যে আমাকে ওষুধ খাওয়াতে চাইছ? কী ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন —জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নাশ করতে পারে এমন ওষুধ আপনি জানেন কী?

নীলরতন ঃ না স্বামীজী, এমন ওষুধ আমার নেই, তবে আমি কি করতে পারি, যেমন মোটরগাড়ীখানি চলতে চলতে একটি ইস্‌কুরুপ খুলে গিয়ে চলৎশক্তি বন্ধ হয়ে গেল, আমি সেই ইস্‌কুরুপটি এঁটে দিলাম — এবার গাড়ীখানি চলতে লাগল। এরূপ দেহযন্ত্রের কিছু অংশ খারাপ হলে ওষুধ দিয়ে একটু সারিয়ে দিতে পারি মাত্র, তাই বলে জরা মরণ নিবারণ করবার কোনো ওষুধ আমার নেই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ সেইজন্যেই তো আমি বলেছি, ডাক্তারবাবু, ভবরোগ বড়ো দুঃখদায়ী রোগ। ভব সংসার এই রোগ থেকে দুঃখ পাচ্ছে। এরজন্যে কিছু ওষুধ বের করতে হবে। ভবরোগ যতটা দুঃখ দিয়ে থাকে শরীরের রোগ সেই তুলনায় কিছুই নয়। বারবার জনম্ মরণ, বারবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ ও বহির্গমনের দুঃখ কষ্ট এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করলে তা বুঝতে পারা যাবে। এই ভবরোগের কিছু প্রতিকার হওয়া চাই। আপনি তো এতবড়ো ডাক্তার, আপনার খ্যাতি চতুর্দিকে প্রচার হয়েছে। ভবরোগের ওষুধের জন্যে আপনার শরণ নিচ্ছি, এই ওষুধ আমাকে বলুন।

নীলরতন ঃ স্বামীজী, আপনি ভবরোগের ওষুধ আমাদের বলুন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ভবরোগের ওষুধ ভগবান স্বয়ং দিয়ে থাকেন। মায়া প্রপঞ্চে মানুষ ঘুরছে ফিরছে। ভগবানের আশ্রয় নেয় না। ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে গেলে তখন মানুষের মায়া প্রপঞ্চ দূর হয়ে যায়। মায়া প্রপঞ্চ দূর হয়ে গেলে, মানুষের এই বারবার জন্ম-মরণরূপ যে ভবরোগ আছে, সেই রোগ আরোগ্য হয়ে যায়। ভগবানের শরণাগত হয়ে যাও, তাহলেই ভবরোগ দূর হয়ে যাবে। কী প্রাণগোপাল! এই শরণাগতি ছাড়া ভব ব্যাধি নিবারণের আর কোনো সহজ সুগম উপায় আছে? আরো অনেক উপায় আছে, তবে এই পন্থা সর্বজনের জন্যে সুগম। দুর্গম পথ সব মানুষ অবলম্বন করতে পারবে না। মায়া তো ভগবানের দাসী। আমি যদি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহলে দাসী আর আমাকে দুঃখ দিতে সাহস করবে না। দেখো ভাই, একটি ছোট্ট দৃষ্টান্তমূলক গল্প আমার মনে পড়েছে। বলছি, শোন —

শরণাগত সাধকের গল্প

এক রাজধানীতে ভিনদেশ থেকে দুই বন্ধু এসেছে এখানকার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবার জন্য। পথে পথে ঘুরে তারা শহর দেখে বেড়াতে লাগল। একজন তার সমস্ত মালপত্র মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এত বড়ো বোঝা মাথায় চাপিয়ে কতক্ষণ আর ঘুরে বেড়ানো যায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে গেল, শহর দেখার আনন্দ তার চলে গেল। সে দেখল তার সঙ্গীটির সঙ্গে কোনো মালপত্র নেই, দিব্যি আনন্দে সে পথ চলছে। সে তখন তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মালপত্র কোথায় গেল? তুমি তো দেখছি বেশ হালকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আর আমি এই বোঝার ভার মাথায় নিয়ে কাবু হয়ে পড়লাম। শহর দেখার আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল।" বন্ধুটি বলল, "কেমন বোকা তুমি, মাথায় বোঝা চাপিয়ে শহর দেখতে বেরিয়েছ। বাসা পাকড়াতে পারোনি? আমি তো শহরে এসে প্রথমেই বাসা ঠিক করেছি। সব মালপত্র সেখানে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে শহর দেখতে বেরিয়েছি, তুমি আগে বাসা ঠিক করোনি কেন? যাও আগে একটা বাসা ঠিক করে ফেলো।

দেখো ভাই প্রাণগোপাল, এই বাসা ঠিক করে ফেলো। 'বাসা পাকড়ায় লেও' — এই কথাটি কত মূল্যবান। এর তাৎপর্য হল — আমরা অহমিকার বিপুল বোঝা মাথায় চাপিয়ে এই সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই আমরা একটুতে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ি। বুদ্ধিমানেরা তাই ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই চরণে নিজেদের অহমিকার বোঝা নামিয়ে দেন এবং হাল্‌কা হয়ে মনের আনন্দে সংসাররূপী নগর পরিভ্রমণ করেন। আর যে ব্যক্তি মূর্খ, সে আপন অহমিকা নিজের মাথায় চাপিয়ে নেয়, ফলে দুঃখের হাত থেকে সে অব্যাহতি পায় না। তার আরাম হয় না। সেইজন্যে চতুর বা বুদ্ধিমান সাধক নিজের অহমিকার বোঝা ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দেয়, হাল্‌কা হয়ে সংসাররূপী শহর আরামে ঘুরে কাটিয়ে দেয়। তাই আমার উপদেশ হল, ঈশ্বরের অথবা তাঁরই পূত বিগ্রহ সদ্‌গুরুর চরণকমলরূপী আশ্রয় বা বাসা প্রথমেই ঠিক করে নাও। তাহলেই জীবনে বহু আনন্দ লাভ করবে। ডাক্তারবাবু, আপনি তো সর্ব বিদ্যা বিশারদ, আপনার শিক্ষার কোনো অভাব নেই। কিন্তু আপনি তো বাসা পাকড়ানো বিদ্যা শিক্ষা করেননি। দেখো, আমার আর একটা দৃষ্টান্তের গল্প মনে পড়ছে, গল্পটি শোন। এই গল্প থেকে অন্তর্নিহিত ভাব তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবে।

রাজার ছেলের গালে চড় মারার গল্প

এক সমৃদ্ধশালী রাজা ছিলেন। সেই রাজার একটি মাত্র পুত্র। রাজা ওই পুত্রের সৎ শিক্ষা দানের জন্য অনেক টাকা দিয়ে এক সর্ববিদ্যাবিশারদ শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। শিক্ষক মহাশয়কে তিনি বলে দিলেন, আমার পুত্রকে সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষক মহাশয় বললেন, হুজুর, আপনার আদেশ অনুযায়ী রাজকুমারকে সর্বগুণ শিক্ষা আমি করিয়ে দেব। শিক্ষক মহাশয় রাজকুমারকে বহু শিক্ষা দিলেন, কিন্তু পরদুঃখকাতরতা শিক্ষা দিতে পারলেন না। কেন পারলেন না — এই প্রশ্ন উঠল, কিন্তু এর উত্তর তো এই হল — যে ব্যক্তি কখনো দুঃখ কী জিনিস জানে না তার পরের দুঃখে চিত্ত দুঃখিত হতে পারে না। তোমাদের বাংলার তো এ সম্পর্কে একটি কবিতা আছে।

"চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশি বিষে দংশেনি যারে।"

শ্রীশ্রীগুরু ঃ হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক। যার কখনও দুঃখ হয়নি তার পরদুঃখকাতরতা হয় না। শিক্ষক মহাশয় একদিন রাজকুমারকে বললেন, কুমার সাহেব চল, ঘোড়ায় চেপে বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক্‌। কুমার বলল, এখন তো খুব রোদ্দুর হয়ে গেছে, এখন আর যাব না। শিক্ষক মহাশয় জোর করে রোদ্দুরের মধ্যেই কুমারকে ঘোড়ায় চাপিয়ে বেশ দূরে ময়দানে নিয়ে চলে গেল।

রাজকুমার খুবই সুকুমার। রোদ্দুরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে গেল, খুব কাতর হয়ে বলল, শিক্ষক মহাশয়, আমার খুব জলপিপাসা পেয়েছে। আর আমি যাব না। শিক্ষক বললেন, বেশ তুমি এখন ঘোড়া থেকে নেমে এসো। কুমার ঘোড়া থেকে নেমে এল। শিক্ষক ঘোড়ার উপর চেপে বসলেন। তিনি রাজকুমারকে বললেন, তুমি ঘোড়ার লাগাম ধর, ঘোড়ার সাথে সাথে ছুটে এসো। তাই হল। শিক্ষক খুব জোরে ঘোড়া ছোটালেন, সুকুমার রাজপুত্র ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, শিক্ষক মহাশয় আর আমি ছুটতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা করুণ। শিক্ষক মহাশয় রাজকুমারের গালে জোরে এক চড় মারলেন আর সেখান থেকে চলে গেলেন। রাজকুমার মূর্ছিত হয়ে সেখানে পড়ে রইল।

ঘোড়ার যে সহিস ছিল, ওই ব্যক্তি রাজকুমারকে যত্ন করে সুস্থ করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। সহিস বলল, হুজুর, শিক্ষক মহাশয় কুমার সাহেবের এরকম হাল করেছে। শুনে রাজার খুব রাগ হল, বললেন, এখনই শিক্ষকের মস্তক ছেদন করে আমার কাছে নিয়ে এসো। শিক্ষক তো জানতেন, এরকম ব্যবস্থাই তার হবে। সেইজন্যে তিনি তো প্রথমেই পালিয়ে গিয়ে নিজের বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে ছদ্মবেশ ধারণ করে নিলেন। এই ছদ্মবেশেই শিক্ষক মহাশয় রাজসভায় যেতে লাগলেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারল না।

রাজা আর কুমার পাশাপাশি দুজন সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করছেন। রাজা কুমার সাহেবকে কী রীতিতে রাজ্যশাসন করতে হবে সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। এমন সময় এক দুষ্ট ব্যক্তিকে রাজসভায় ধরে আনা হল। রাজা সাহেব হুকুম দিলেন — এই দুষ্ট লোকের দুগালে দুই চড় মেরে এখান থেকে বের করে দাও। তখন একথা শুনে কুমার সাহেব হাত জোড় করে বলল, হে পিতা, একে অন্য কোন ভাবে শাসন করুন। ওর গালে চড় মারলে ওর খুব দুঃখ হবে।

পুত্রের এরূপ পরদুঃখকাতরতা দেখে, এরকম দয়া দেখে রাজার বুকের ছাতি ফুলে গেল, তাঁর খুব গর্ব অনুভব হল। পুত্রের মাথা চুম্বন করে তিনি বললেন, হে পুত্র, তোমার চিত্তের দয়া দেখে, পরদুঃখ কাতরতা দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আজ থেকে তুমিই রাজা হলে, এই রাজ্য তোমারই, তুমি এখন রাজা হওয়ার উপযুক্ত হয়েছ।

এই সময় ঠিক সময় বুঝে শিক্ষক মহাশয় ছদ্মবেশ ছেড়ে দিয়ে শিক্ষক বেশ পরিধান করে রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, রাজাসাহেব — আগে আমার পুরস্কার দিন, তারপর কুমারকে রাজ্যে অভিষেক করবেন। আমি আমার প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রাজকুমারের গালে চড় মেরেছি, রোদ্দুরের মধ্যে ওকে ছুটিয়েছি, এভাবে দুঃখ কী বস্তু তাকে শিক্ষা দিয়েছি। আপনি ক্রোধবশত আমার গর্দান অবশ্যই নিয়ে নেবেন। এই জন্যে আমি আগেই আপনার কাছ থেকে পুরস্কার চেয়ে নিচ্ছি। আপনার আদেশ অনুযায়ী আমি কুমার সাহেবকে সর্বগুণে গুণান্বিত হওয়ার শিক্ষা দিয়েছি। একটি শিক্ষা বাকি ছিল তা হল পরদুঃখকাতরতা। এখন নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আপনার পুত্রকে গালে চড় মেরে দুঃখ কি জিনিস তার শিক্ষা দিয়েছি। সেইদিনই রাজকুমার বুঝে গেছে গালে চড় মারলে ব্যক্তির খুব দুঃখ হবে।

রাজাসাহেব শিক্ষকের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি শিক্ষককে বহু পুরস্কার ও ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, তুমিই উপযুক্ত শিক্ষক। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে আমার পুত্রকে শিক্ষা দিয়েছ, সর্বগুণে গুণান্বিত করে দিয়েছ।

দেখো ডাক্তারবাবু, আপনি সর্বগুণে গুণান্বিত, সব শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন কিন্তু আপনি ঈশ্বরকে ডাকার শিক্ষা করেননি।

নীলরতন ঃ হ্যাঁ স্বামীজী, আমি আপনার কাছে এসেছি যখন, তখন আপনি আমায় ঈশ্বরকে ডাকবার উপায় শিখিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ আপনি ঈশ্বরকে জানেন?

নীলরতন ঃ হ্যাঁ স্বামীজী, আমি ঈশ্বরকে মেনে থাকি, তবে স্বগুণ ঈশ্বরকে মানি না। নির্গুণ ঈশ্বরকে মেনে থাকি।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ স্বগুণ হোক আর নির্গুণ হোক এতে কিছু যায় আসে না। কোন রীতি অনুসারে ভগবানকে স্মরণ করাই ঠিক। সাধারণ মানুষ নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না। এইজন্যে স্বগুণ ঈশ্বরের আরাধনা করাই সহজ ও সুগম। কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনি তো অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন। আপনার পক্ষে নিরাকার ঈশ্বরের স্মরণ করা কিছু কঠিন নয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, ওই নাস্তিক ব্যক্তির সঙ্গ করা ঠিক নয়। সাহেব লোক যীশুকে মেনে থাকে, মুসলমান লোক আল্লাকে মেনে থাকে। হিন্দুলোক শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে মেনে থাকে। এই হল স্বগুণ ভগবান।

নির্গুণ ঈশ্বরের কোনো মূর্তি নেই, নির্গুণ ঈশ্বরের ধ্যান করা বড়োই কঠিন। কোন কোন নির্গুণ উপাসক জ্যোতির ধ্যান করে থাকে। ওই জ্যোতি সাধারণ জ্যোতি নয়। 'কোটি সুরয সম পরকাশ' অর্থাৎ কোটি সূর্য চন্দ্র ওই জ্যোতির সমতুল্য হতে পারে না। ডাক্তারবাবু, আপনি উত্তম অধিকারী, আপনি তো জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের ধ্যান করবার উপযুক্ত ব্যক্তি। জনসাধারণের পক্ষে জ্যোতির্ময় ঈশ্বরের ধ্যান করা বড়োই কঠিন। এই সব লোকেদের জন্যে রাম, কৃষ্ণ, কালীমূর্তির ধ্যান করাই ঠিক।

ঈশ্বর তো আমাদের হৃদয়েই আছেন, কিন্তু আমাদের সামনে সংসাররূপী প্রাচীর খাড়া করে দিয়েছেন। এইজন্যে আমরা হৃদয় কমলে স্থিত ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। সংসাররূপী মায়াকে যে সাধক হটাতে পারে তার পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সুগম হয়ে যায়। কোন কোন প্রশ্নকারী ব্যক্তি আমার কাছে আসে, আমাকে প্রশ্ন করে, স্বামীজী ঈশ্বর কোথায় আছেন, আমাকে বলুন। আমি তাকে বলে থাকি, ঈশ্বর আপনার হৃদয়েই

আছেন, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী করে দিলেই আপন হৃদয় কমলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

এইভাবে নানাবিধ ঈশ্বর বিষয় সৎসঙ্গ হবার পর স্যার নীলরতন সরকার শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শ্রীশরীর পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর তিনি প্রাণগোপাল মহাশয়কে রোগী সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, স্বামীজীকে একটি ওষুধ দেওয়া আমার কর্তব্য, কিন্তু তাঁর এই যোগীদেহে আমার ওষুধে বিশেষ কিছু ফল হবে না। স্বামীজীর দেহ পরীক্ষা করে আশ্চর্য হলাম। যে সকল শরীরের যন্ত্র ঠিক মতন কাজ না করলে মানুষ জীবিত থাকতে পারে না, স্বামীজীর শরীরে সেগুলি ঠিক মতো কাজ করছে না। হার্টের অবস্থা দেখে আমি তো অবাক। এত খারাপ হার্টের অবস্থা নিয়ে স্বামীজী চলাফেরা, উচ্চ হাস্য, উচ্চ কণ্ঠে উপদেশ প্রভৃতি কী করে করছেন? আমার ডাক্তারি বিদ্যার বাইরে এই শরীর। কাজেই মনে হচ্ছে আমার ওষুধে এই শরীরে বিশেষ কিছু কাজ হবে না। এসব কথা স্বামীজী যাতে বুঝতে না পারেন সেইজন্যে ডাক্তারবাবু এই সকল কথা ইংরাজীতে বলছিলেন। গুরু মহারাজজী ইংরাজী ভাষার এক বর্ণও বুঝতে না পেরে বালকের ন্যায় সরল উচ্চ হাস্যে ঘরখানি কাঁপিয়ে তুললেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কী ভাই, তোমরা ইংরাজী ভাষায় আমাকে গালাগালি করছ না তো?

প্রাণগোপাল ঃ মহারাজ, ডাক্তারদের নিয়ম, রোগীকে তার রোগের বিষয় কিছু জানাবে না। তাই ডাক্তারবাবু আপনার অসুখের বিষয় ইংরাজী ভাষায় বলেছেন। আপনার কিন্তু এখন থেকে আর বেশি নড়াচড়া অথবা বেশি উচ্চকণ্ঠে উপদেশ দেওয়া চলবে না।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ নাও ভাই, এখন তোমরা আমাকে রোগী বানিয়ে দিলে। ভোগী ব্যক্তি রোগী হয়ে যায়, যোগী ব্যক্তি কীভাবে রোগী হবে? তবে প্রাকৃতিক নিয়মে যোগী লোকের উপরও রোগ গ্রাস করে। আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এই শরীরে জরা এসে গেছে। একে কে রোধ করতে পারবে? আমাকে এমন ওষুধ দাও যাতে জরা মরণ রোধ হয়। তবেই তো তোমাদের কথা মানবো। তা না হলে আমি তোমাদের কোনো কথা মানবো না। আমার সহজ গতি মতির উপর আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে রোগী বানিয়ো না। মহারাজ নড়বেন না, মহারাজ

কথা বলবেন না, আপনার হার্টফেল হয়ে যাবে, আরে, যিনি হার্ট রচনা করেছেন, তাঁর ইচ্ছেতেই যখন হার্টফেল হবে, তখন কোন্ ডাক্তার আছে যে ওষুধ দিয়ে তা রোধ করবে? দেখো ভাই, ডাক্তার লোকের সামনেই তার প্রিয়পুত্র চলে যাচ্ছে। কেন তিনি তার পুত্রকে ধরে রাখতে পারছেন না, একটি দোঁহা শোনাচ্ছি —

"হামরা মনমে এক হ্যায়, কর্ত্তাকো মনসে কুছ্ আউর
উধোকো মাধো বানায় সংশয় কর্ না দূর।"

দেখো ভাই, আমরা এক রকম ভাবছি, কিন্তু কর্তা যে ভাব ভেবেছেন তা-ই ফলীভূত হয়ে যাবে। তিনি তো অধমকে মাধব করে দিতে পারেন। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে, ভগবান কী খেয়ালি ব্যক্তি, না না খেয়ালি তিনি নন। এ সম্পর্কেও তুলসীদাসের একটি দোঁহা আছে —

"রাম রাজা হ্যায় অন্তর্যামী, সব কি খপর প্রভু লিজে,
চোলার য্যায়সা করম করে ওয়সা ফল প্রভু দিজে।"

অর্থাৎ ভগবান অন্তরযামী। তিনি সকলকার অন্তরের সংবাদ রেখে থাকেন। যে মানুষ যেমন কাজ করে তাকে তদনুযায়ী প্রভু ফল দেন। অধমকে কর্ম অনুসারে মাধব বানিয়ে দিয়ে থাকেন। মনের সকল সংশয় দুর করে সেই পরমেশ্বর পরম কর্তার আশ্রয় নাও। নিজের কর্তৃত্ব অভিমান ছেড়ে দাও।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ শেষ জীবনে বালকের ন্যায় হয়ে গিয়েছিলেন, বালকের ন্যায় ভোলালে ভুলে যেতেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় এবার তাঁর আরাধ্য দেবতাকে ভুলিয়ে বললেন, গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখেই তো শুনেছি দ্রব্য শক্তির প্রভৃত গুণ আছে, যেমন কুইনাইন সেবন করলে ম্যালেরিয়া জ্বর অবশ্যই ছেড়ে যায়, সেই মতো এই ডাক্তারবাবুর ওষুধ সেবনে আপনার শারীরিক কষ্ট কিছু উপশম নিশ্চয় হবে। এই সব কথা বলে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজকে স্যার নীলরতন সরকার ডাক্তার মহাশয় তাঁর দু-এক শিশি ওষুধ, বড়ী খাওয়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্যার নীলরতন সরকার ব্রাহ্ম ছিলেন, তবু তিনি হিন্দুধর্মের চূড়ামনি শ্রীশ্রীবালানন্দ মহারাজের নিকট এসে তাঁর শ্রীমুখে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করেছিলেন।

দশম পর্ব

গুরুভক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ (আমার ভ্রাতা)
ও
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সৎসঙ্গ

[ভগবান ভক্তাধীন, তিনি ভক্তির কাঙাল, ভক্ত তাঁকে ভক্তিভাবে কিছু দিলে তিনি ভক্তকে ধনদৌলত ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেন, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান ঃ 'ধন যদি চাহ তো ধর্মকো বাড়াও রে' ঃ বড়ো বড়ো ঋষি ও তপস্বী ঈশ্বর দর্শন করেও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি, এই প্রসঙ্গে গর্গ মুনির উপাখ্যান ঃ ভগবানের উপলব্ধির জন্যে প্রথমেই দরকার চিত্তশুদ্ধি ঃ ভক্তি দু'রকমের — গলাভক্তি ও প্রেমাভক্তি ঃ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ কর্তৃক কথিত তপোবন পাহাড়ের গুহায় ইষ্টদর্শন কাহিনী ঃ ভগবানের উপলব্ধির জন্যে দরকার অনন্ত বিশ্বাস আর অনন্য ভক্তি]

করণীবাদ, শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজী মহারাজের আশ্রম থেকে প্রায় একক্রোশ দূরে কান্টাস্ টাউনে "তটিনী" কুঠির নামে এক বাড়িতে পূর্ণচন্দ্র বাস করেন। ইনি কিছুদিন যাবৎ আশ্রমে আসেন নাই। গুরুদর্শনের শত ইচ্ছা সত্ত্বেও আলস্যবশত গুরুদর্শন করা তার হয়ে উঠেনি। একদিন এক সকালে তিনি শ্রীগুরু দর্শনে এসেছেন, স্বামীজী যেন পূর্ণকে দেখেও দেখছেন না। কারুর কোন ত্রুটি হলে এরূপ উপেক্ষা দেখিয়ে স্বামীজী তাঁর শিষ্য-ভক্তদের শাসন করতেন। গুরুপদসেবক পূর্ণচন্দ্র তাঁর ভাব বিশেষ করেই জানেন। তাই গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তাঁর চরণ কমলে মাথা ন্যস্ত করে বহুক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। তখন গুরুদেব আর স্থির থাকতে পারলেন না। দু'হাতে পূর্ণের কান দুটি মুলে দিয়ে শাসন করলেন, পূর্ণ অন্তরে পুলকিত হল, বুঝতে পারল এই শাসনের ভেতর তার জন্যে অনেকখানি আদর লুকান আছে।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ পূর্ণ, তুমি কি দেওঘরেই ছিলে? আমি তো জানতাম তুমি কলকাতায় চলে গেছ। যে লোক এখানে আসে, তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি — পূর্ণ কী দেওঘরে নেই? আমি তো তোমার ধর্মপিতা, আমাকে তুমি দেখছ না, কিছু দিচ্ছ না, এ কীরকম কথা? বৃদ্ধ পিতাকে খেতে পরতে দিতে হয় তো?

পূর্ণ ঃ গুরুদেব, ভিখারি সন্তানের প্রতি একি আদেশ, আপনি রাজরাজেশ্বর, আপনাকে দেবার যে আমার কিছুই নেই।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ কিছু নেই — একথা কী করে হয়? তোমাদের পুরাণের একটি গল্প

মনে পড়ে যাচ্ছে, তোমাকে শোনাচ্ছি, গল্পের ভাবটি শীঘ্রই স্ফুটিত হয়ে যাবে।

সুদামা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। ছোটবেলায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সান্দীপনি মুনির আশ্রমে লেখাপড়া করতেন তখন থেকেই এই ব্রাহ্মণের সাথে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সখ্যভাব গড়ে ওঠে। এই ব্রাহ্মণ সন্তানের নাম সুদামা।

বড়ো হয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা, কিন্তু ব্রাহ্মণ সুদামা বড়োই গরীব। দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তার দিন কাটে। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সুদামার স্ত্রী একদিন তাঁকে বললেন, "তুমি একবার দ্বারকায় গিয়ে সখাকে আমাদের দারিদ্র্যের কথা জানিয়ে এসো। তিনি নিশ্চয় আমাদের জন্যে কিছু ব্যবস্থা নেবেন।" নিজের অভাব অনটনের কথা সখাকে জানাতে সুদামার মন চাইল না! তবে তিনি ভাবলেন, ব্রাহ্মণী যখন যেতে বলছেন, যাই একবার ঘুরেই আসি। সখাকে নাই বা জানালাম আমার দারিদ্র্যের কথা, তাঁর শ্রী মুখখানি তো একবার দেখতে পাব। এই ভেবে সুদামা দ্বারকা যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। সুদামা রওনা হচ্ছেন দেখে তার স্ত্রী বললেন, "সখার কাছে যাচ্ছ, তাঁর পায়ে আমার প্রণাম জানিয়ো। তাঁর জন্যে কিছু চিড়ে দিচ্ছি, সখাকে বোলো তাঁর সখী এই চিঁড়ে তাঁর খাওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে।" এই বলে স্বামীর ছিন্ন ও মলিন কাপড়ের খুঁটে খানিকটা চিড়ে বেঁধে দিলেন।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদে ব্রাহ্মণদের অবারিত দ্বার। বিনা বাধায় সুদামা এলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। রুক্মিনী আর সত্যভামা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করছিলেন। বহুদিন বাদে সখাকে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর নিজহাতে এই গরীব ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিয়ে, ফুল চন্দন দিয়ে তাঁর চরণ বন্দনা করে তাঁকে নিজের পাশে এনে বসালেন। দুই রাণী রুক্মিনী ও সত্যভামাও ভক্তিভরে সুদামার চরণে প্রণাম জানালেন।

সুদামার মলিন বসন ও সর্বাঙ্গে দারিদ্রের চিহ্ন লক্ষ্য করে সত্যভামার মনে বড়ো দুঃখ হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, দুনিয়ার মালিক। আপনার সখার এই দারিদ্র্য কেন আপনি দূর করছেন না?" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি কী করব বলো, যে যার কর্মফলে দুঃখ ভোগ করে। ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো কর্মফল ক্ষয় হবার নয়। দুনিয়ার মালিক হয়েও তাই আমি সখার দুঃখ দূর

করতে অক্ষম।" বিস্মিত হয়ে সত্যভামা জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন পবিত্র ব্রাহ্মণ উনি, স্বয়ং ভগবানের সখা, এমন কী খারাপ কাজ উনি করেছেন যার ফলে তাঁকে আজ এরকম দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে?" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "ছেলেবেলায় মা যশোদা একদিন আমাকে দেবার জন্যে সুদামার হাতে ক্ষীরের নাড়ু দিয়েছিলেন। লোভ সামলাতে না পেরে সখা সেই নাড়ু আমাকে না দিয়ে পথের মধ্যে নিজেই খেয়ে ফেলেছিলেন। সেই পাপে আজ তার এই দুর্দশা, খাওয়া-পরার এত কষ্ট।" কিন্তু সত্যভামা কিছুতেই ছাড়বেন না, বার বার তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে জেদ করতে লাগলেন, "আপনার কোনো কথা আমি শুনব না, সখার জন্যে একটা কিছু আপনাকে করতেই হবে। তাঁর এই দুর্দশা আমি সহ্য করতে পারছি না।" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "কী করি বলো, আমাকে কিছু না দিলে আমিও কাউকে কিছু দিতে পারিনে। শোনো, তবে বলি। একদিন আমার আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়তে থাকে। তাই দেখে সখী দ্রৌপদী নিজের কাপড় ছিঁড়ে আমার হাতে পট্টি বেঁধে দিয়েছিল। সেই সামান্য এক টুকরো কাপড় দিয়েছিল বলে দুর্যোধনের সভায় দুঃশাসন যখন সখীকে অপমান করছিল তখন আমি রাশিকৃত কাপড় দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করেছিলাম। সখা সুদামা কখনো কিছু দেয় না আমাকে, তাকেই বা আমি কিছু দিই কী করে?"

এইসব কথা বলে শ্রীকৃষ্ণ সুদামার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "সখা, তোমার কাপড়ের খুঁটে কী যেন বেঁধে এনেছ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে তোমার স্ত্রী যেন আমার জন্যে কিছু পাঠিয়েছেন।" লজ্জায় সুদামার মুখ লাল হয়ে উঠল। রাজ-রাজেশ্বর যিনি, তার জন্যে তুচ্ছ খানিকটা চিঁড়ে তিনি সঙ্গে এনেছেন। এই সামান্য জিনিস কী করেই বা তাঁকে দেবেন ভেবে সুদামা এতক্ষণ চিঁড়ে বের করেননি। কিন্তু ভগবান নিজের হাতে সুদামার কাপড়ের খুঁট খুলে এক মুঠো চিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরলেন। আবার যেই এক মুঠো নিতে যাবেন অমনি সুদামা বলে উঠলেন, "রক্ষে করো সখা, আর তোমাকে চিঁড়ে খেতে হবে না। ওই যে এক গ্রাস খেয়েছ, তাতেই আমার ত্রিলোকের সাম্রাজ্য আর জন্ম-জন্মান্তরের অন্ন জুটে যাবে।"

ভক্তের আনা চিঁড়ে খেয়ে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের সীমা রইল না, কিন্তু তিনি দেখলেন চিঁড়ে এনেছেন বলে সুদামা এখনও লজ্জায় আরক্ত বদনে বসে রয়েছেন। সখার সেই লজ্জা দূর করতে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "সখা, আমি চিঁড়ে খেতে ভালবাসি বলে আমার প্রিয় সখী তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, কী তার সুগন্ধ, কী তার স্বাদ! মনে হল যেন অমৃত খেলাম। তুমি নিজেই একটু খেয়ে দেখোনা।" এই কথা বলে

তিনি সুদামা, রাধিকা ও সত্যভামা এই তিনজনকে চিঁড়ে খেতে দিলেন। ভগবান নিজে খেয়ে প্রসাদ করে দিয়েছেন। তাই তারা সামান্য চিঁড়েতে অমৃতের স্বাদ পেলেন।

মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ এবার নিজের গলা থেকে বৈজয়ন্তী মালা খুলে সুদামার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "সখা, এই যে বৈজয়ন্তী মালা তোমাকে দিলাম, এর কাছে তুমি যা চাইবে, তোমার প্রার্থনা পূরণ হবে। যদি স্বর্গরাজ্য চাও তাহলে তাই পাবে, বিপুল ঐশ্বর্য চাও তাই পাবে, তোমাকে অদেয় এর কিছুই থাকবে না।" তখন সুদামা বললেন, "সখা, তুমি অন্তর্যামী, আমার অন্তরের কথা তুমি সব জানো। স্বর্গ, ঐশ্বর্য আমি কিছুই চাই না তোমার চরণ কমল ছাড়া আর যে কিছুই আমার চাইবার নেই। এই মালা তুমি ফিরিয়ে নাও। একান্তই যদি তুমি আমাকে কিছু দিতে চাও তাহলে আমার হৃদয়পদ্মে তোমার চরণকমল চিরকালের মতো স্থাপন কর, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। সখা, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, সামান্য ধনদৌলত দিয়ে তুমি আমাকে ভোলাতে চেয়ো না।" এই বলে সুদামা শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে সুদামাকে মাটি থেকে তুলে দু'হাত দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "সখা, এই বৈজয়ন্তী মালা তোমার প্রতি আমার প্রেমের দান। আমার প্রেমকে তুমি অবজ্ঞা কোরো না। তোমার মনের ভাব কি আমি জানি না সখা? জানি, তুমি আমাকে ছাড়া আর কিছুই চাওনা, কিন্তু আমার সখী যে ভোগ-সুখের কাঙাল, পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্যে সে লালায়িত। আমার সখীর জন্যেই এই মালা তোমাকে নিতে হবে, এর জন্যে তুমি কুণ্ঠিত হোয়ো না।" শ্রীকৃষ্ণের কথায় সুদামা আর কিছু বললেন না, তিনি বৈজয়ন্তী মালা গলায় পরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

পথ চলতে চলতে সুদামা দেখলেন, একটি ছেলে সাপের দংশনে মারা গিয়েছে আর তার বুড়ো বাবা-মা আকুল হয়ে কাঁদছে। এই দৃশ্য দেখে সুদামার প্রাণ কেঁদে উঠল। নিজের দারিদ্রদশা ভুলে তিনি বৈজয়ন্তী মালার উদ্দেশ্যে বললেন, "তুমি তোমার প্রভুর আদেশ মতো আমার কথা শোনো, এখনই এই ছেলেটিকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।" এই কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে মরা ছেলেটি বেঁচে উঠল। সুদামাও আনন্দিত মনে পথে পা বাড়ালেন।

যেতে যেতে পথের ধারে এক প্রকাণ্ড সরোবর দেখা গেল। সুদামার ইচ্ছে হল ওই সরোবরে তিনি স্নান করে নেবেন। গ্রামের কিছু মানুষ সেই সরোবরে স্নান

করছিল। হঠাৎ একটা কুমির একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গভীর জলে ডুব দিল। ছেলেটির সঙ্গে ছিল তার বুড়ী ঠাকুমা। চোখের নিমেষে নাতিকে কুমিরে টেনে নিয়ে যেতে দেখে বুড়ী চিৎকার করে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে, এমন সময় সুদামা তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "মা তুমি উতলা হোয়ো না, আমি তোমার নাতিকে এখুনি ফিরিয়ে আনছি।" সুদামা বৈজয়ন্তী মালাকে নির্দেশ দিলেন ছেলেটিকে উদ্ধার করে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে নাতি জল থেকে উঠে ঠাকুমার কাছে এসে দাঁড়াল।

এরপর সুদামা আবার এগিয়ে চলেছেন। এবার দেখলেন, রাস্তার ধারে অনেক মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিসের জটলা জানবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, সামনে এক চিতার উপর একটি মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে আর সতীদাহ প্রথা অনুসারে মৃতের স্ত্রী চিতার দিকে এগিয়ে আসছে। এই দেখে সুদামা স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "মা, তুমি একটু অপেক্ষা করো, তোমার স্বামী জীবন লাভ করে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবেন।" সুদামার নির্দেশে মালার প্রভাবে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হল। এমন সময় বৈজয়ন্তী মালা সুদামাকে বলল, "আমার প্রভুর নির্দেশ ছিল আপনার তিনটি হুকুম পালন করব। তিনটি হুকুম শেষ হয়েছে। এবার আমাকে প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে।" বলবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মালা সুদামের গলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুদামা চিন্তা করতে লাগলেন, ব্রাহ্মণী অর্থের জন্যে লালায়িত। ঘরে ফিরলেই তো সে জানতে চাইবে, তোমার সখা তোমাকে কী দিল, তখন তাঁকে বলবই বা কী? কিছু দেননি বললে সে তো মিথ্যে বলা হবে। বৈজয়ন্তী মালার কথা বলব তাঁকে? ব্রাহ্মণ-সুদামা কিছু স্থির করতে পারলেন না। শুধু ভাবলেন, যা হোক, ভগবানের কথায় তিনটি প্রাণ তো রক্ষা পেল।

সুদামার পরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি। ভগবান তাঁকে আরও পরীক্ষা করতে চান। সুদামা পথ ধরে চলেছেন, দেখলেন পথের মাঝখানে সোনার মোহর ভরতি একটা থলে পড়ে রয়েছে। গরীব ব্রাহ্মণ একবার থলের পানে চেয়ে দেখলেন, একবার ভাবলেন থলেটা নিয়ে যাই, ব্রাহ্মণীকে বলব সখা তাঁর জন্যে থলে ভরতি সোনার মোহর দিয়েছেন। আর থলেটা নিলেই বা দোষ কী? আমি তো আর চুরি করছি না, পথে পড়ে রয়েছে, আমি শুধু কুড়িয়ে নিয়েছি মাত্র। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল। ছি ছি পরের জিনিস না বলে নেওয়া, সে তো চুরি করার সামিল। ক্ষণিকের এই দুর্বলতার জন্যে তাঁর নিজের উপর ধিক্কার জন্মাল। তিনি

ভাবতে লাগলেন, কেন আমার এমন মতিভ্রম হল। যুগ-যুগান্ত ধরে দারিদ্র্য ভোগ করব সেও ভালো, তবু যেন কখনো পরের জিনিসের প্রতি লোভ না হয়। এতে যদি প্রাণ যায় যাক্, তবু চুরি বা মিথ্যাভাষণে যেন কখনো প্রবৃত্তি না হয়।

ভগবান প্রিয় সখাকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু এই গরীব ব্রাহ্মণ কোনো প্রলোভনেই ভুললেন না। তাই দেখে ভগবান লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিনী দেবীকে বললেন, "তুমি এখনই সুদামার ঘরে যাও, তুমি গেলে তাঁর দারিদ্র্যদশা দূর হবে। লোভের বশে আমাকে না দিয়ে সখা একদিন ক্ষীরের নাড়ু খেয়েছিল, তারই ফলে তাঁর এই অভাব অনটন। আজ লোভকে সে জয় করেছে। সে আজ সম্পূর্ণ নির্লোভ, তাই অভাবের জ্বালা তাকে আর সইতে হবে না।" ভগবানের আদেশে লক্ষ্মীদেবী আবির্ভূত হলেন দরিদ্রের কুটীরে। মুহূর্তের মধ্যে সেই পর্ণকুটীর অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল বিশাল অট্টালিকা। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিতা ব্রাহ্মণীকে লক্ষ্মীদেবী নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন বহুমূল্য পট্টবাস, তাঁর অলংকারবর্জিত দেহ সজ্জিত হল নানাবিধ রত্নালংকারে। দাসদাসীর আনাগোনায় সুদামার গৃহ গমগম করতে লাগল।

এদিকে সুদামা ফিরে এসে নিজের সেই পর্ণকুটীর আর খুঁজে পান না। কোথায় গেল তাঁর কুঁড়ে ঘরখানি, ব্রাহ্মণীই বা কোথায় গেল? এখানে এই রাজবাড়িই বা কে বানাল? হায় কৃষ্ণ, হায় সখা, তোমার দর্শন পাওয়া সত্ত্বেও আজ আমার এ কী দুর্দশা হল! আমার ঘর গেল, ব্রাহ্মণী গেল, এখন আমি কী নিয়ে থাকব, কোথায় থাকব? সুদামা এইসব আকাশ পাতাল ভাবছেন এমন সময় লক্ষ্মী এসে তাঁর হাত ধরে অট্টালিকার ভিতর নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "সখা, তোমার দারিদ্র এখন দূর হয়েছে, এই অট্টালিকা তোমার, ধন-দৌলত ঐশ্বর্য যা কিছু দেখছ তা সব কিছু এখন তুমি ভোগ করো।"

লক্ষ্মীর কথায় সুদামা খুশি হতে পারলেন না। তিনি বললেন, "সখী, আমি তো এই ঐশ্বর্য চাইনি, আমি চাই আমার সখা কৃষ্ণচন্দ্রকে। এই ধন-দৌলত, এই স্বচ্ছলতা দিয়ে ভগবানের চিন্তা থেকে তুমি আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছ, কিন্তু আমি তা চাই না। বিলাসিতার অজস্র উপকরণে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। দীন দরিদ্র হয়েই থাকতে চাই, এই ভাবেই সর্বদা আমি সখার চরণ কমল ধ্যান করে কৃতার্থ হতে চাই।"

লক্ষ্মীদেবী সুদামাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "সখা, তোমার চিন্তা কিসের, ভগবান যে তোমার ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়ে আছেন। আমার কৃপার দান গ্রহণ করতে তুমি দ্বিধাবোধ কোরো না। এই ঐশ্বর্য তোমার ভক্তিকে মলিন করতে পারবে না, নির্ভয়ে তুমি তা ভোগ করো। সখা, তুমি স্থির জেনো, অন্তিমে বৈকুণ্ঠলোকে তোমার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে, সেখানে অবিচ্ছেদ্য মিলনে বাঁধা রইবে তুমি আর তোমার সখা।" সুদামাকে আশীর্বাদ করে লক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিত হলেন। পরম আনন্দে সুদামার দিন কাটতে লাগল।

দেখো বাছা পূর্ণ, এই দৃষ্টান্তমূলক গল্প তোমাকে বললাম। এর তাৎপর্য হল, এই গল্পে ভক্তিভাব দেখানো হয়েছে, কর্মফল ভোগ দেখানো হয়েছে। এই গল্পে আরও দেখানো হয়েছে যে এক মুঠি চিঁড়ে খেয়ে ভগবান সুদামাকে সাম্রাজ্য দিয়ে দিলেন, দ্রৌপদীর কাছ থেকে এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় পেয়ে ভগবান তাকে রাশি রাশি বস্ত্র দিলেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানকে কিছু দেয় না, ভগবানও তাকে কিছু দেন না। সেইজন্যে আমার নির্দেশ হল — ধর্মের জন্যে কিছু দান করো। "ধন যদি চাহ তো ধর্মকো বাড়াও রে"। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — এই হল চতুর্বর্গ ফল। প্রথমে ধর্ম, তারপরে অর্থ। আগে অর্থ পাওয়া যায় না। ধর্ম করলে তবেই অর্থ পাওয়া যায়। এই অর্থ আমার জন্যে চাইছি না, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই চাইছি।

পূর্ণচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হলেও পরদিন তিনি এসে গুরু মহারাজের চরণে এক হাজার টাকা নিবেদন করে প্রণাম করলেন।

গুরুমহারাজ পূর্ণের প্রতি একটু করুণ দৃষ্টিপাত করে বলতে লাগলেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বাছা পূর্ণ, তোমার ভক্তি বিশ্বাস দেখে আমি খুব সন্তোষ লাভ করেছি। সাবাস বাছা, এখন তোমার আর্থিক অবস্থা খারাপ সত্ত্বেও তুমি এক হাজার টাকা গুরুসেবার জন্যে নিয়ে এসেছ। ওই টাকা আমার আশীর্বাদ স্বরূপ তুমি তোমার ঘরে ফেরৎ নিয়ে যাও। পরীক্ষায় তুমি পাশ করে গেছ। এখন আর অর্থের প্রয়োজন নেই।

পূর্ণ ঃ গুরু মহারাজ, আপনি দয়া করে আমাকে এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না। ওই টাকা আপনার চরণকমলরূপী ব্যাঙ্কে জমা রইল। (দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায়, সুদামার চিঁড়ের ন্যায়) এই টাকা আমাকে ফেরৎ নিয়ে যেতে আদেশ করবেন না।

আমি ঃ বাবা, এমন কী সাধনা আছে যা দিয়ে ইষ্টদেবের দর্শন পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ ইষ্টদর্শন তো হচ্ছেই, কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছ না। দেখো, তোমাদের কথা ছেড়ে দাও, বড়ো ঋষি তপস্বী লোকও ইষ্ট দর্শন করেও তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেনি। তোমাদের পুরাণে এর দৃষ্টান্ত আছে, আমি তোমাকে বলছি, ওই দৃষ্টান্ত শুনে তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে আর খুব আনন্দও পাবে।

গর্গমুনির উপাখ্যান

একদিন গর্গ ঋষি বৃন্দাবনে নন্দ-রাজার ঘরে গিয়ে তাঁর অতিথি হলেন। রাণী যশোমতী গর্গ ঋষির পরিচর্যা করতে লাগলেন, নিজ হাতে মুনির পা ধুয়ে দিলেন, পাদ্য অর্ঘ দিয়ে মুনির সেবা পুজো করলেন, মুনির পুজোর ঘর, রন্ধন করার ঘর সুসজ্জিত করে দিলেন। কিছু চাইবার দরকার নেই, সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু মুনির জন্যে হাজির করে দিলেন। মুনি পুজোর দ্রব্য সম্ভার দেখে খুব আনন্দিত হলেন। ফল, ফুল, ঘি, দুধ, ধুপ, দীপ, নৈবেদ্য কিছুর অভাব নাই। মুনি পুজোয় বসলেন। চোখ বন্ধ করে ইষ্টদেবকে নৈবেদ্য নিবেদন করলেন।

কিছুক্ষণ পর মুনি চোখ খুলে দেখলেন যশোমতীর কোলে বসা গোপাল উঠে এসে নিবেদন করা নৈবেদ্য খেয়ে নিচ্ছে। গর্গ মুনি খুব বিরক্ত হয়ে রাণী যশোমতীকে বললেন, দেখো মা, তোমার পুত্র গোপাল খুব চঞ্চল, আমার ইষ্টদেবকে নিবেদিত নৈবেদ্যের সবটাই খেয়ে নিয়েছে, আমার আজ প্রসাদ মিলবে না, তোমার পুত্র উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে। রাণী যশোমতী বললেন, আপনার খাওয়ার জন্যে অন্য ফল মিষ্টি এনে দিচ্ছি। মুনি বললেন, না মা, যখন উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমি আর কিছু খাব না। আমি রান্না করে ইষ্টদেবকে সমর্পণ করে তখন প্রসাদ খাব। প্রসাদ ছাড়া আমি খাইনা।

এই কথা বলে রান্না ঘরে গিয়ে ভালো ভালো খাবার তৈরি করে থালায় রেখে চোখ বুজে ইষ্টদেবতাকে ভোগ নিবেদন করে দিলেন, তারপর চোখ খুলে দেখলেন, ওই ভোগ গোপাল এসে খেয়ে নিচ্ছে। গর্গ মুনি খুব বিরক্ত হয়ে যশোমতীকে বললেন, আমার প্রসাদ খাওয়া ভাগ্যে নেই। তোমার পুত্র এসে আমার ইষ্টদেবকে নিবেদিত অন্ন উচ্ছিষ্ট করে দিয়েছে। আমি আর তা খাই কী করে? আমি এখন চলে যাচ্ছি, তোমার দুষ্টু ছেলে আমাকে খেতে দেবে না।

যশোমতী বললেন, হে মুনিবর, আপনি বিমুখ হয়ে অভুক্ত হয়ে চলে গেলে আমার রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। আমার একটি পুত্র, তার অমঙ্গল হবে, আপনি

প্রসন্ন হয়ে তবেই যাবেন। আমি আপনার রান্নার জন্যে আয়োজন করে দিচ্ছি, আপনি রান্না করে খাবার তৈরি করে তা ইষ্টদেবকে সমর্পণ করে প্রসাদ গ্রহণ করুন।

যশোমতীর মিনতি শুনে মুনি প্রসন্ন হয়ে আবার রান্না করে খাবার প্রস্তুত করলেন এবং যশোমতী মাতাকে বললেন, হে মাতা এখন তুমি তোমার পুত্রকে সাবধান করো। তখন যশোমতী পুত্রকে একটি ঘরে তালা বন্ধ করে রাখল। মুনি চোখ বন্ধ করে ইষ্টদেবকে ভোগ নিবেদন করে দিলেন। যেই মাত্র তিনি ভোগ নিবেদন করলেন, ঠিক তখনই গোপাল এসে ভোগ খেতে লাগল। এই দেখে মুনির বড়ো ধোকা লাগল। এ কী রকম হল? যশোমতী মা বলল, গোপালকে ঘরে তালাবন্ধ করে দিয়েছি, আর দুষ্টমতী বালক আসতে পারবে না। আপনি ইষ্টদেবকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করুন, তালা খুলে এই বালক কী করে বেরিয়ে এল? তাহলে এই বালক কে?

অনেক ভাবনা চিন্তা করে মুনি আচমন করে ধ্যান করতে লাগলেন যে, এই বালক বেশী গোপাল কে? গর্গ মুনি ধ্যান করে দেখলেন, আরে, গোপালবেশী বালকই তো আমার ইষ্টদেবতা গোলকবিহারী হরি! তখন মুনি গোপালের চরণ আঁকড়ে ধরে বললেন, 'হে আমার প্রাণের ঠাকুর, তোমাকে আমি কত অপমান করেছি। রক্ষ মাং প্রভু রক্ষ মাং, হে প্রভু! আমার অপরাধ ক্ষমা করো। আর এইসঙ্গে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী হয়ে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি ধারণ করে আমাকে তোমার শ্রীমূর্তি দেখিয়ে দাও। আমি তোমার চতুর্ভুজ শ্রীমূর্তি দেখবার জন্যে খুবই লালায়িত হয়ে আছি।' গোপাল মৃদু হেসে বলল, তোমার কাছে আমার স্বরূপ প্রকাশ করব। চতুর্ভুজ নারায়ণ হরি হোয়ে তোমার বাঞ্ছা পূরণ করব। কিন্তু তুমি একথা বাৎসল্য প্রেমময়ী মাতা যশোদাকে বলবে না। একথা মাতা যদি শ্রবণ করে, তাহলে তাঁর বাৎসল্য প্রেম চলে যাবে, মাধুর্য ভাব নষ্ট হয়ে যাবে, ফলে ঐশ্বর্যভাব তাঁর মধ্যে এসে যাবে। আমাকে বাৎসল্য রস কেউ দেয় না। আমি বাৎসল্য প্রেমের ভিখারী হয়ে, মাতা যশোমতীর পুত্র হয়ে এসেছি। গর্গমুনি হাসতে লাগলেন, বললেন, হে গোপাললাল, আমি যশোমতীকে বলব না তুমি আমাকে তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখিয়ে দাও। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীভগবান চতুর্ভুজ নারায়ণ বেশে গর্গমুনির পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। গর্গমুনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের একটি স্তব পাঠ করতে লাগলেন। ....এই স্তব এখন আর আমার মনে নেই, স্তবটি অতীব মনোহর।

মুনি ইষ্টদেবের দর্শন পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। এরপর প্রসাদ ভোজন করলেন। যশোমতী এসে মুনিকে প্রণাম করে বললেন, হে মুনিজী, আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন তো? আমার গোপালের অপরাধ মার্জনা করবেন। অবোধ বালক আপনাকে অনেক দুঃখ দিয়েছে। আমার একটাই পুত্র, আপনি আমার পুত্রকে আশীর্বাদ করে যান। গর্গমুনি নিজের উৎফুল্ল ভাব গোপন করে যাবার সময় বললেন, মাতা, পুত্রের জন্যে কোনো চিন্তা কোরো না। একথা বলে মুনি আপন স্থানে চলে গেলেন।

দেখো বাছা সরলা, তোমার কথা কি, গর্গমুনি কত তপস্যা করলেন, তাঁকে তপস্যার ফল দেবার জন্যে ভগবান তাঁর কাছে এলেন, তাঁর নিবেদিত অন্ন খেলেন, কিন্তু তাঁকে মুনি চিনতে পারলেন না, তিনি বুঝেছিলেন, এ বালক হল নন্দ ঘোষের পুত্র গোপাল, এ আমার অন্ন নষ্ট করে দিয়েছে। তোমারও যখন ইষ্টদর্শন হবে, তখন তুমিও তাঁকে চিনতে বা বুঝতে পারবে না।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ কিছু সময় চোখ বুঁজে স্থির হয়ে রইলেন, একেবারে স্পন্দনহীন হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বালকের ন্যায় হেসে উঠলেন এবং প্রশ্ন করলেন —

শ্রীশ্রীগুরু ঃ তোমার কী প্রশ্ন ছিল ভাই, আমার তো মনে নেই।

আমি ঃ বাবা, আমার প্রশ্ন ছিল, কলিকালে কী তপস্যার দ্বারা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে থাকে? তার উত্তরে আপনি বলেছেন যে ইষ্টের দর্শন ঘটে। ইষ্টদেবতা এসে সামনে দাঁড়ায়, জীব কিন্তু এমনই অজ্ঞ যে তাঁকে অনুভব করতে পারে না। বাবা, তাই আমার জিজ্ঞাসা কী করলে তাঁকে চিনতে পারব, তাকে ভগবান বলে অনুভব করতে পারব?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ "মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে" — চিত্তশুদ্ধ ছাড়া ভগবানের স্বরূপ-অনুভূতি জীবের হয় না। ভগবান তো ওতঃপ্রোতভাবে জগৎ সংসারের মধ্যে পূর্ণ হয়ে আছেন। কিন্তু তাঁকে বুঝতে বা অনুভব করতে সমর্থ হওয়া চাই। ওই সামর্থ কবে হবে, যখন সাধকের চিত্তমল একেবারে ক্ষালন হয়ে যাবে, রজোস্তমহীন হয়ে যাবে, একদম সত্ত্বময় ভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে। সূর্যের জ্যোতির প্রভাবে তুমি জগৎ সংসারকে দেখতে পারছো। তুমি তো জান, আমরা আমাদের চোখ দিয়ে জগৎ সংসারকে দেখছি। সূর্যদেব অস্ত গেলে জগৎ সংসার অন্ধকারে ডুবে যাঁয়। তোমার চোখ থাকা সত্ত্বেও তুমি তখন কিছু দেখতে পাও না। এমনই সূর্যদেবের প্রভাব।

তেমনি আত্মা আছে, আত্মা না থাকলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে। তোমার চোখ

তো আছে, কিন্তু আত্মা না থাকলে তুমি দেখতে পারবে না। আত্মা আছে, সেইজন্যে তুমিও আছ। তোমার শরীরে আত্মা না থাকলে তুমিও বেঁচে থাকবে না। তোমাকে মৃতদেহ বলে তোমার আত্মীয় স্বজন তোমাকে ফেলে রাখবে। তারা বলাবলি করবে — এর মধ্যে প্রাণ নেই, আত্মা নেই, তাই এই মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার মানে আত্মার অস্তিত্বেই তোমার অস্তিত্ব। তুমি তাঁর থেকে পৃথক নও।

আমি যখন বলব, ঈশ্বরকে তুমি কোথায় খুঁজছো? ঈশ্বর তো তোমার ভিতরেই আছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্যেই তুমি খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। এই উপদেশ শুনে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা হবে না। আচার্যের কাছে উপদেশ শুনে সাধনা করতে হবে। সাধনা করলে চিত্তশুদ্ধি হবে। তখন ঈশ্বরকে জানবার অধিকারী হবে। ঈশ্বর তো আছেন কিন্তু আমরা তাঁকে জানতে বা বুঝতে পারিনা।

আমি ঃ বাবা, আমি ঈশ্বরকে বোধ করবার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায়, শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় কলিকালে জীবের চক্ষুগোচর হন কিনা।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তো কলিকালেই এসেছিলেন। কিন্তু সব মানুষ কী তাঁকে বুঝতে পেরেছিলেন? কেন পারেন নি, তাদের চিত্তশুদ্ধির অভাব ছিল। ভগবান জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তের কাছে ধরা দেন। ভক্তি দু'রকমের হয়। প্রথম - গলাভক্তি, এটি কিরকম? এর দৃষ্টান্ত হল ঘি। কী রকম? সূর্যের বা আগুনের তাপে ঘি গলে যায়, আবার ঠাণ্ডার স্পর্শে বা শীতকালে ঘি জমে শক্ত হয়ে যায়। সাধকদের মধ্যেও দেখা যায় তারা যতক্ষণ গুরুর কাছে রইল, তাঁর কাছে ভগবান সম্বন্ধে উপদেশ শুনতে লাগল, ততক্ষণ তাদের হৃদয় বেশ কোমল থাকে, ঐশ্বরিক শক্তি বেশ উপলব্ধি করে। কিন্তু গুরুর কাছ থেকে যেই তারা সংসারে ফিরে যায়, অমনি বিষয়ের সংস্পর্শে এসে তাদের হৃদয়ও শক্ত বা কঠিন হয়ে ওঠে, ঘিয়ের মতো জমে যায়। এই ধরনের সাধকের যে ভক্তি, একে বলা হয় গলাভক্তি। এতে ঈশ্বর লাভ হয় না।

দ্বিতীয় ভক্তি হল প্রেমভক্তি। সাধক গুরুর কাছে থাকুক আর সংসারেই থাকুক সব সময় ভগবানের প্রতি তাঁর প্রেম যেন ঢল ঢল করতে থাকে। এইভাবকে বলা হয় প্রেমভক্তি। এই রকম ভক্তিতেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয়।

দেখো সরলা, একদিনের কথা আমার মনে পড়ছে। তপোবনে তোমার পিতা আমার সিংগী (শরৎচন্দ্র সিংহ) আমাকে জিজ্ঞাসা করল মহারাজ, এই তপোবন পাহাড়ে আপনি বহুদিন তপস্যা করেছেন। কী রীতিতে আপনার ইষ্টদর্শন হয়েছে

তা শোনবার জন্যে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে। আমি বললাম, ভাই সিংগী, একথা তো কাউকে বলা যায় না, কিন্তু তুমি আমার প্রিয় পুত্র, এইজন্যে আমি তোমাকে এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছি।

একদিন আমি গভীর রাতে তপোবনের গুহায় আসন পেতে বসেছি। মনে মনে সংকল্প করলাম আজ আমি ইষ্টদর্শন করবই, তা যদি না হয় তাহলে এই আসনেই দেহ ত্যাগ করব। আসনে বসে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলাম, ক্রমে বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হল। এই অবস্থায় সারারাত কেটে যাবার পর ভোরবেলায় সুশীতল হাওয়ার স্পর্শে যখন আমার চেতনা ফিরে এল, তখন হঠাৎ মনে হল গুহাতে আগুন লেগেছে, আর সেই আগুনের তাপে আমার দেহ যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ঝট্ করে চোখ খুলে দেখলাম আমার ব্রহ্মতালু লক্ষ্য করে এক অজগর সাপ আমার সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শুধু তার লেজটুকু মাটি স্পর্শ করে আছে। একদম খাড়া হয়ে ফণা বিস্তার করে সাপটা গর্জন করতে লাগল। মনে হল সাপটা এখনই আমাকে ছোবল মারবে। সাপটার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সমস্ত গুহাটা আগুনের মতো গরম বায়ুতে পূর্ণ হয়ে গেছে। আমি ওই সাপের চোখের দিকে আমার চোখ রেখে প্রাণায়াম করতে লাগলাম।

প্রাণায়ামের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতর থেকে বাঁশির মতো যে শব্দ বের হতে লাগল সেই শব্দে সাপটি তার সমস্ত দেহটা এদিকে ওদিকে দোলাতে লাগল। আমিও সাপের নাচ দেখছি আর সাপটিও আমার প্রাণায়াম থেকে উত্থিত বাঁশির আওয়াজ নিবিষ্ট চিত্তে শুনতে লাগল। কিছুটা সময় এইভাবেই কেটে গেল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, আসলে বসবার আগে আমি সংকল্প করেছিলাম যে, ইষ্টদেবের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত এই আসন আমি ত্যাগ করব না, যদি দর্শন না পাই তাহলে এই আসনেই প্রাণত্যাগ করব।

আমার মনে হল, ইষ্টদেবই হয়তো ছল করে এই সাপের রূপ ধরে আমাকে দর্শন দিতে এসেছেন। ঝট্ করে আমি হাতজোড় করে 'শিবোহম, শিবোহম্' বলে সাপকে প্রণাম করে শিবমহিম্ন স্তোত্র জোরে জোরে আবৃত্তি করতে লাগলাম। ভগবানের অপার মহিমার কথা কী আর বলব। যে সাপ আমাকে দংশন করবে বলে ফণা বিস্তার করে গর্জন করছিল, হঠাৎ সে ফণা গুটিয়ে চোখের নিমেষে কোথায় যে মিলিয়ে গেল কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। আমি আসন থেকে উঠে এধার-ওধার

তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মিলল না। এত বড়ো এক অজগর সাপ নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। অথচ গুহার মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নেই যে সেখান দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারে। তখন আমার মনে হল যে, এ কোনো সাধারণ সাপ নয়, আমার ইষ্টদেবই সাপরূপে দেখা দিয়ে গেলেন। এই কথা মনে হতেই আমার চোখে জল এসে গেল। হে ইষ্টদেব, দেখাই যদি আমাকে দিলে তাহলে কেন তুমি সাপের মূর্তিতে আমাকে দেখা দিলে, কেন তোমার সত্য-শিব-সুন্দররূপে আমার কাছে এলে না? এইভাবে এসে দেখা দিলে আমি তোমার পা দুখানি জড়িয়ে ধরতে পারতাম। মন আমার এমন উদাস হয়ে গেল যে মনে হল এখন যদি আমি মারা যাই তাহলে ভালো হয়।

কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে বিচার শুরু হয়ে গেল। কেন তুমি কাঁদছ, কেন তুমি উদাস হয়ে গেছ? ইষ্টদেবের দর্শন তো তুমি পেয়ে গেছ। আর ইষ্টদেবের চরণ দুখানি জড়িয়ে ধরে তোমার কী লাভ হোত! তুমি তো নিষ্কাম সাধক। ইষ্টদেবের কাছে কোনো কিছু চাইবার অধিকার তো তোমার নেই। তুমি সংকল্প করেছিলে ইষ্টদেবকে দর্শন করবে। সেই সংকল্প তোমার সিদ্ধ হয়েছে, এখন তুমি আনন্দ করো। কেন তুমি মিছে কান্নাকাটি করছ?

এইভাবে বিচার করতে করতে আমার চিত্ত সুস্থ হয়ে গেল। ইষ্টদেবকে দেখব বলে সংকল্প করেছিলাম, তা আমার সিদ্ধ হয়েছে, এখন কেবল আনন্দ আর আনন্দ।

দেখো বাছা সরলা, কলিকালে ভগবান এমনি করে আসেন ছদ্মবেশে, কিন্তু প্রকৃত সাধক ঠিক তাকে চিনে নেয়। সাধকের কাছে ভগবান নিজেকে লুকোতে পারেন না।

আমি ঃ হ্যাঁ বাবা, রবিঠাকুরের গানের একটি চরণ মনে পড়ছে, তা হল —

"আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তথাপি তোমারে চিনিব আমি
মরণ-রূপে আসিলে তুমি চরণ ধরিয়া মরিব হে।"

মহারাজ, আপনি যে গুহার মধ্যে সাপটি দেখলেন যাঁকে আপনি আপনার ইষ্টদেবতা বলে বুঝলেন, সেই সাপটির কি কোন বিশেষত্ব ছিল? না, সাধারণ সাপের মতোই দেখেছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরু ঃ না না বাছা, ওই সাপের কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম। ওই সাপের মুখে আমি এক জোড়া গোঁফ লক্ষ্য করেছি। আর তার চোখের দৃষ্টির

মধ্যেও এমন একটা বিশেষত্ব ছিল যা ভুল হবার নয়। এইসব চিহ্ন দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই সাপই হলেন আমার ইষ্টদেব সর্পভূষণ দেবাদিদেব শ্রীশ্রীশংকরজী। প্রথমটা আমি তত খেয়াল করিনি। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি তার মধ্যে এমন অনেক চিহ্ন ছিল যাতে তাকে সাধারণ সাপ বলে ভুল করা চলে না। ভগবান শংকরজীর অন্তর্ধানের পর আমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়েছিল।

এই স্থানে শ্রীশ্রীবালানন্দ স্বামীজী মহারাজের সাধু শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীপূর্ণানন্দ স্বামীজী হাসতে হাসতে এলেন এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের প্রতি অভিমান সূচক গদ গদ স্বরে বললেন —

পূর্ণানন্দ ঃ মহারাজ, আপনি যে এই বালিকাদের কাছে আপনার ইষ্টদর্শনের কথা বলছেন, এরা ওই মহাভাবের কথা কী বুঝবে?

শ্রীশ্রীগুরু ঃ বোঝার কোন দরকার নেই। কোন শিশুকে মুখে মধু দিলে ওই শিশু চুক্ চুক্ করে তা চুষে নেয়। ওই শিশু মধুর সন্ধান সম্পর্কে কিছুই জানে না, কী উপায়ে মৌমাছি চাক বানায়, কী উপায়ে মানুষ মধুর চাক ভেঙ্গে মধু আহরণ করে থাকে — এইসবের জ্ঞান শিশুটির নেই। কিন্তু মিষ্টির জ্ঞান শিশুটির আছে। শিশুটির মুখে মধু দিলেই সে চুষে নেয়। শিশুর অন্য কিছু জ্ঞান না থাকলেও মিষ্টত্ব জ্ঞান অবশ্যই আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে যুক্তি তর্ক জ্ঞান বিচার দ্বারা এদের তত্ত্ব কথা বোঝাতে পারবে না, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস আর অনন্য ভক্তি দ্বারা এরা বুঝে নিতে পারবে।

মাতা যশোমতী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে ঈশ্বর বলে বুঝতে পারেননি, আমার পুত্র গোপাল বলেই বুঝেছিলেন। সেই গোপালকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুত্ররূপে সেবা যত্ন ভজনা করে গিয়েছিলেন তাতেই মাতা যশোমতীর পরমাগতি লাভ হয়েছিল এবং স্বধাম প্রাপ্তি হয়েছিল। এই নারী (সরলাবালা দেবীকে উদ্দেশ্য করে) মাতৃভাব নিয়ে যদি ঈশ্বরকে পুত্ররূপে জ্ঞান করে সেবা যত্ন, ভালবাসতে পারে তাহলে সে-ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলে যেতে পারবে অর্থাৎ ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করবে। ভক্তি বিশ্বাস এমনই মধুর জিনিস দেখো, এইসব লোক (শ্রোতারা) অজ্ঞানের অন্ধকারে অবস্থান করেও আমার কথা শ্রবণ করছে। কেন শ্রবণ করছে? আমার কথা শুনে এরা মিষ্টত্ব অনুভব করছে। যদি মিষ্টতা না লাগে তবে এরা বসে না থেকে উঠে চলে যাবে। বালক হোক, বৃদ্ধ হোক মিষ্টতা জ্ঞান সব মানুষেরই আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথাবার্তা শ্রুতি মধুর হয়ে থাকে। দেখো, এখানে তো যাত্রা থিয়েটার হচ্ছে না। তাহলে এত

মানুষ এখানে কেন আসছে? আমি তো সমাগত মানুষদের কিছু দিচ্ছি না, আমি এখানে শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা বলছি। দেখো বাছা পূর্ণানন্দ, এইসব মায়েদের ক্ষুদ্র জ্ঞান কোরো না। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নদী যেমন সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়। তেমনি এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন মায়েরা যদি অনন্য ভক্তি ও অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে নেয় তাহলে এইসব মায়েরাও ঈশ্বর লাভ করে নেবে। ঈশ্বর পণ্ডিতদের গোচর হবে। মুর্খের বা ক্ষুদ্রের গোচর হবে না, এমন নয়। অন্ধ বিশ্বাস আর অনন্য ভক্তি যার মধ্যে আছে, তার কাছে ঈশ্বর অবশ্যই প্রকাশ হবেন। ঈশ্বরের কাছে ক্ষুদ্র বা মহৎ এসবের কিছু বিচার নেই। ঈশ্বর অন্ধ বিশ্বাস আর অনন্য ভক্তির পরিচয় নিয়ে থাকেন, এই দুটিই তাঁর কাছে বিচার্য বিষয়।

আমার চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু পড়তে লাগল। আমার এই চোখের জল দিয়েই আমি শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অমৃতময় বাণী কথা-প্রসঙ্গ সমাপন করলাম। আরও কত কত উপদেশ শ্রীগুরুমুখে শুনেছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে পারলাম না। আমি খুবই সাধারণ অল্প শিক্ষিতা নারী, শুধুমাত্র গুরুকৃপায় তাঁর প্রদত্ত ধ্রুবা-স্মৃতির সহায়তায় 'কথা প্রসঙ্গ' লিখে ভক্তগণের হাতে প্রদান করলাম।